

না রা য় ৭ সা ন্যা ল

বল্মীক





বেঙ্গল পাবলিশাস প্রাইভেট লিমিটেড

১৪ বকিম চার্টার্ড স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

প্রকাশক—শ্রীমন্তনন্দন মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাট্‌জে স্ট্রিট
কলকাতা-১২

মুদ্রক—মন্মথনাথ পান
কে. এম. প্রেস
১১১ দীনবন্ধু লেন
কলকাতা-৬

প্রবন্ধ-টিএ
ভাস্কর সেন

প্রবন্ধ-মুদ্রণ
ভারত কোটোচাইন প্রুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইন্ডার্স

চারি টাকা

উৎসর্গ

যাঁর স্নেহের ছায়ায় কুল-জীবনে একদিন লেখক হওয়ার
স্বপ্ন দেখতাম আমার সেই মেজদিকে—

রচনাকাল—সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

এই লেখকের—

বকুলভদ্রা পি. এল. ক্যাম্প	(উপন্যাস)
মুশ্‌কিল আসান	(নাটক)
গ্রাম্য-বাস্তব	(সঙ্ঘসাক্ষর-সাহিত্য)
পরিবর্তিত পরিবার	(ঐ)

পদ্মা-যমুনা-মেঘনা-আড়িয়েল-খাঁ বিধৌত নদীমাতৃক দেশের মানুষ ওরা !

কোন অতীত ইতিহাসে ওদের উদ্ভবের পূর্বপুরুষ এসেছিল মধ্য এশিয়া থেকে দলে দলে । সঙ্গে এনেছিল অশ্ব, গৃহপালিত পশু ; —এনেছিল দৃষ্ট সাহস আর উন্নত রক্তের অভিমান । ওরা ছড়িয়ে পড়েছিল অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের কিনারে কিনারে । অল্পমত অনার্যদের সঙ্গে, মঙ্গোলীয় রক্তের সঙ্গে, আরও হাজার জাতি-উপজাতির শোণিতে ওদের সে অভিমান হয়েছিল দ্রব । তাদেরই একটা শাখা মেনে নিয়েছিল ঐ নদী মেথলা শ্রামল ভূখণ্ডকে মাতৃভূমি ব'লে । পৃথিবী সে অধিকার স্বীকার ক'রে নেয় । কেটে যায় সহস্রাব্দী ।

তারপর কোথা দিয়ে কি যেন হ'য়ে গেল । আজও ভাবলে অবাক লাগে হরিপদ মাস্টার মশারের—হঠাৎ একদিন নাকি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হ'য়ে গেল আম-কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা তাঁর সাতপুরুষের ভিটাখানার তিনি পরবাসী । জিনিসটা ভালো করে বুঝবারও সময় পাওয়া গেল না । মাস্টারি ক'রে তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে তাঁর । ভূগোল-ইতিহাস গিলিয়ে গিলিয়ে গাধা পিটিয়ে মানুষ করতে হ'য়েছে থাকে—সেই হরিপদ মাস্টারকেই স্বীকার ক'রে নিতে হ'ল ইতিহাস-ভূগোল-বহির্ভূত এই সিদ্ধান্তটাকে ।

হরিপদ চক্রবর্তীকে হঠাৎ একদিন বলা হ'ল যে মতিগঞ্জ তিনি প্রবাসী । মতিগঞ্জ তাঁর দেশ নয় । এখানে তাঁর স্থান নেই !

হরিপদ সামনের কলমের কজলি গাছটার দিকে চাইলেন ; ওটা লাগিয়ে ছিলেন তাঁর কর্তাষা । গোয়ালঘরখানির দিকে তাকালেন । দেখলেন গৃহসংলগ্ন দেবায়তনের দিকে,—সেটা তাঁর কর্তাদাদার প্রতিষ্ঠিত । অসহায় উদাস দৃষ্টিতে অনেক কিছুই ধরা পড়ল । পাশাপাশি টিনের চালার ভীড়, ছায়া-

ধমুধম্ নারকেল গাছের পাতায় পাতায় কোলাকুলি, মরাইয়ের গায়ে তেল-সিঁদুরের রাজা রেখা, নদীর হাঁশুলি-বাকের জল-চিক্-চিক্ পাড়ে কলমি আর কচুর মিতালি, ধান সিঁড়ির ধাপে ধাপে বীজ-ধানের ঘন সবুজাভা। ফুলে ফুলে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়েছে কুশুচুড়া গাছটা, গোবর গাড়ির চাকা ঘেরামত হ'চ্ছে কলিমুদ্দি মিজির ছাপরায়—ভেসে আসছে তার ঠকাঠক্! ও পাশের দাওয়ায় পুত্রবধু কামিনীর আঁচল ধরে খুলে পড়েছে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বাবলু। রোজ্জু ঝলমল মতিগঞ্জ গ্রামের আপাদমস্তক একনজরে দেখে নিয়ে হরিপদ মাস্টার চশমাটা খুলে নিয়ে মুছলেন। তারপর আবার চোখে দিলেন সেটা। জীবনে এই প্রথম ভুল জেনেও অকটাকে সংশোধন করা হ'য়ে উঠল না। কোন্ নির্বোধ ছাত্র যে এতবড় ভুল অকটা কবলো তা জানতেও পারলেন না তিনি। অস্তুত তাকে নাগালের মধ্যে পেলেন না। পেলেন কি করতেন জানি না,—কিন্তু ভুল অকের অশুদ্ধ ফলাফলটাকেই স্বীকার ক'রে নিতে হ'ল। বার হ'য়ে পড়তে হ'ল জীপুজের হাত ধরে।

ওদের মতো অনেকেই চলে এল এ পারে দলে দলে। সারি সারি মানুষ। কোলে শিশু, বগলে প্যাটরা, মাথায় মোট আর বুকে রাজ্যের ছশিস্তা। শেষ-বারের মত স্টিমারটা ডেকে উঠল মতিগঞ্জের স্টিমারঘাটে। সিটি তো নয়—সে এক আর্তনাদ! রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়েছিলেন ওঁরা। হরিপদ মাস্টার আর তাঁরই মতো সহস্র হতভাগ্য। নদীর জলে পড়েছে লক্ষ লক্ষ সূর্যকণা,—টেউয়ের মাথায় মাথায় রয়েছে সঙ্কেত—ফিরে যাওয়ার আহ্বান। কোটি কোটি হাত-ছানি দিয়ে মতিগঞ্জের স্টিমার ঘাটে নদী ওদের ফিরে ডাকছে। স্টিমারের সিটি শুনে দূরে স'রে যাচ্ছে ইলিস ধরার নোকাগুলো। ওদের গলুইয়ে রাণী-কৃত রূপালী ইলিস। মাছরাঙ্গাটা স্থির হ'য়ে বসে আছে আধ-ডোবা কঞ্চটার ডালে। ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক শ' নরনারী—তাদের মুখে আতঙ্ক, চোখে জল। আসবে, ওরাও আসবে, দুদিন আগে আর দুদিন পরে—এই যা!

এইবার খুলে দেবে স্টিমারের সিঁড়িটা। মতিগঞ্জের সঙ্গে যে সামান্যতম যোগসূত্রটি অবশিষ্ট রয়েছে—মুহূর্তে যুচে যাবে তা। সম্ভান ভেসে পড়বে

নিজের ভাগ্যাবেশে—মায়ের জঠরের নিশ্চিত নিদ্রার অবকাশ আর ফিরে আসবে না জীবনে। হঠাৎ পায়ের কাছে উবুড় হ'য়ে পড়ে জোবেদালি।

: আমাগো ছাইড্যা চন্নান জাবতা? আমরায় কি দোষ করলাম?

না! দোষ জোবেদালি করে নি। কোনও দোষ নাই তার। ওর বাপ, ওর ঠাকুর্দা ছিল চক্রবর্তী বাড়ীর কৃষাণ। চক্রবর্তী পরিবারের অশ্রোত্তর ভুখণ্ডটুকুতে ওরাই ফলাতো সোণা। ঘরে বয়ে দিয়ে যেত মালিকের প্রাপ্য ধান। আহ্বানমাত্র বেগার দিয়ে গেছে। বেজার হয়নি কখনও। ৬মত্যা-নারায়ণের প্রসাদ নিয়ে অন্নানবদনে কপালে ছুঁইয়ে খেয়েছে। ঈদের দিনে নিয়ে গেছে বকশিশ—বিজয়ার দিনে মিষ্টান্ন। দাওয়ার উঠে বসবার অধিকার ছিল না ব'লে খুল্ল হয়নি কখনও—এ কারণে যে ক্ষুধা হওয়া উচিত—এটা যে মানবিকতারই অপমান সে বোধই ছিল না ওদের। না, জোবেদালির প্রতি কোন অভিযোগ নেই চক্রবর্তীর। তিনি ওর হাত দুটি ধরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে বহিলেন—একটি কথাও বলতে পারলেন না। ধরা গলায় জোবেদালি বলে

: আমাগো কি অইব? দুঃখের দিনে কার কাছে গিয়া দাঁড়াইবাম? হরিপদ চক্রবর্তীর মনে হ'ল এই জোবেদালির সঙ্গে তাঁর আত্মার আত্মীয়তা আছে। সুখ দুঃখের নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হ'য়ে গেছে শতাব্দী অথবা সহস্রাব্দীর নির্দেশে! ব্যাডক্লিফ রোয়েদাদে সে সম্পর্ক ছিন্ন হ'তে পারে না। দুঃখের রাত্রে জোবেদালির কোনও নিরাপত্তা নেই চক্রবর্তী বাড়ীর নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছাড়া। চক্রবর্তী বাড়ীর কোন উৎসবও সম্পন্ন হ'তে পারে না পরিবার-ভুক্ত জোবেদালির উপস্থিতি ভিন্ন। হরিপদ চক্রবর্তী বলেন

: মন খারাপ করিস না আলি। তুই আমার পরিবারের লোক—আমার আত্মীয়। তোকেও আমি নিয়ে যাব কলকাতায়।

ক্যাল্ ক্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে জোবেদালি। যেন বুঝতে পারে না মাস্টার মশায়ের কথা।

: কি ভাবছিস্ রে বোকা? ভয় নেই—তোর বউকেও নিয়ে যাবো—ফতিমাকেও; ওখানে আবার আমি জমি কিনবো। তোকেই বন্দোবস্ত

দেবো। তুই ভাবিস না। আমাকে ছেড়ে তোরাও চলবে না—তোকে ছেড়ে আমারও চলবে না রে।

দ্বিতীয়বার সিটি দেয় স্টিমারে। ওরা সিঁড়িটাকে সরাবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সচকিত হ'য়ে ওঠে জোবেদালি। ছুটে চলে যায় সিঁড়ির দিকে। ওর স্বদেশের সঙ্গে যোগসূত্রও বুঝি এখনই ছিন্ন হ'য়ে যাবে। যাবার সময় তার ভীত আঁত কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয় ক'টি শব্দ : না কর্তা, কইলকাতায় যাইলে উয়ারা আমারে মাইর্যা ফ্যালাইবে !

চকিতে স্মরণ হয় হরিপদ মাস্টারের। মতিগঞ্জ যেমন হরিপদের বিমাতৃভূমি—খাস কলকাতাও তেমনি জোবেদালির কাছে বিদেশ। ভুল অকটার কথা মনে পড়ে যায় তৎক্ষণাৎ !

ওদিকে স্টিমারটা বার কতক পাক খেয়ে তখন ঘুলিয়ে দিয়েছে উত্তর-দক্ষিণ ! লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে পড়লেন যেন চক্রবর্তী। স্টিমারের সারেও কোনপথে চলেছে—জ্ঞান নেই তাঁর। তবু নির্বিবাদে ছেড়ে দিয়েছেন তার উপর এ যাত্রার দায়িত্ব। যেমন ছেড়ে দিয়েছেন জীবনতরীর হালখানি ভাগ্যদেবীকে।

দর্শনা থেকে বানপুর। দলে দলে চলেছে মানুষ। মানুষ, মানুষ আর মানুষ। অতীত ইতিহাসের যুগে যেমন ক'রে এসেছিল সর্কীর্ণ গিরিপথ দিয়ে এদের অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহের উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ,—খাইবার 'পাশ' দিয়ে—আধাবর্তে ! নরনারী-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মৃতবৎসা-নারী সন্তানক্রোড়ে সন্ত জন্মী ! সঙ্গে ক'রে নিয়ে চলেছে খাঁচায়-পোষা পাখী, গলায়-চেন কুকুর। ক্যানেস্টারা, পোর্টলা, বাক্স, বিছানা। কাঠিওঠা মাদুর আর কালিওঠা লণ্ঠন। কাকালে শিশু, চোখে আঁতক আর হৃদয়ে সন্ত্রাস। ওদের পূর্বপুরুষ আধাবর্তে এসেছিল নতুন রাজ্য জয় করতে ; অনাধাদের উদ্ধাস্ত করতে। ওরা এল নিজের দেশ ছেড়ে—উদ্ধাস্ত হ'য়ে।

এইটুকু হাঁটাপথে আসতে হ'বে। তুই রাজ্যের মধ্যে সরাসরি রেলপথ আছে—নেই রেলপথে গমনাগমন। এটুকু পথ আসতে রেললাইনের পাথরে ঠোকর খেয়ে চোখ থেকে পড়ে চশমাটা ভেঙ্গে গেল হরিপদ মাস্টারের।

ক্ষীণদৃষ্টি মানুষ তিনি বরাবরই। চোখে অন্ধকার দেখলেন। জী বিন্দুবাসিনী হাত ধরে ঠুকে নিয়ে গিয়ে বসালেন রেললাইনের ধারের এক বিরলছায়া বাবুলা গাছতলায়। বড়মেয়ে নমিতা ছুঁবাঘাস ছিঁড়ে এনে একটুকরা জ্বাকড়া দিয়ে বেঁধে দেয় পারের বুড়ো আঙ্গুলটা। খর মধ্যাহ্নের দৃশ্য তেজে খণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করতে হ'য়েছিল তাঁকে। সেই ছ'খণ্টা ধরে তাঁর ক্ষীণদৃষ্টি চোখের সামনে দিয়ে—বৈশাখী মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা ক'রে বয়ে গিয়েছিল এক জনপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। মানুষ চলেছে গায়ে গায়ে লেগে, প্রশস্ত রেলপথের উপর চাপ ভীড়। ঠেলা-ঠেলি, হুড়াহুড়ি—দীর্ঘ ক'মাইল বিস্তৃত যেন জীবন্ত মানুষের একটা চলন্ত অজগর! বিনা চশমায় একটা মানুষের থেকে আর একটা মানুষকে তফাৎ ক'রে দেখতে পারছিলেন তিনি। যেন প্রতিটি মানুষের কোন পৃথক সত্তা নেই। ওরা যেন সম্মানিত পালায়নপর একটি অভীক্ষার উপাদান। অজগরটা চলেছে, তার আদিও নেই অন্তও নেই। ওর লেজটা দেখা যায় না—কিন্তু কে বুঝি সজ্জিন দিয়ে খোঁচা দিয়েছে সেই লেজে। ভয়ঙ্কর সরীসৃপটা ছুটে চলেছে দর্শনা থেকে বানপুর!

আজও কলোনীর বিরলস্থান কুটিরে মাতুর বিছিয়ে যখন শুয়ে থাকেন—চোখের উপর দিয়ে ভেসে যায় সেই বিচিত্র মিছিল। গায়ে গায়ে লাগা মানুষের প্রবাহ।

এ পারে এসে কে কোথায় ছিটকে পড়ল কে জানে। স্টিমারে, ট্রেনে, কতো লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। নতুন ক'রে জীবিকা অন্বেষণের যৌথ প্রচেষ্টা করবেন ব'লে কয়েকজনের নাম পরিচয়ও লিখে রেখেছিলেন নোট বইতে। কে জানে কোথায় গেল লোকগুলো। আছে হয়তো কোনও পি. এল. ক্যাম্প পড়ে অথবা পেয়েছে পুনর্বসতি তাঁরই মতো। না হয় হাঙ্গামা চুকেই গেছে একেবারে।

সাত আট বছর কেটে গেছে এরপর। কত বাড়ি ঝঞ্ঝা ব'য়ে গেছে এদের উপর দিয়ে তার ইয়ত্তা নেই। ট্রান্সিট ক্যাম্প, পি. এল. ক্যাম্প, পুনর্বসতি,

যাও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বেরার—ফিরে এসো হাওড়া অথবা শেরালদ' স্টেশনে। পুলিশ ভ্যান, কোর্ট, হাজত—ঠিক হায়! স্টাংটার নেই বাটপাড়ের জয়; কি করবি কর। আবার পুনর্বসতি? বেশ আবার চেষ্টা ক'রে দেখব। তোমাদের যদি ধৈর্য থাকে তবে আমাদেরও থাকবে।

: কেন থাকবে না?—বলেন গোকুল দাস। জমিদারের গোমস্তা ছিলেন তিনি। বলেন : ও ব্যাটাগো সূজা করা কি সহজ মশয়? মাইর খাইয়্যা 'খাইয়্যা বেটাগো পিঠে কড়া পইড়্যা গেছে। আরও মারবা? মারো। তোমারই জুতো ছিঁড়বো।

হরিপদ মাস্টার বলেন : ওরা ওরা ব'লছেন কেন? আমি আপনিও তো ঐ দলেই। আমরাও তো উদ্বাস্ত!

: আমরা আর অরা'?—বিস্মিত হন গোকুল দাস। জমিদারের দুর্ধর্ষ গোমস্তা। বলেন : আমরা হইলাম গিয়া ভদ্রলুক, মানে মিডলক্লাস। আর অরা? অগো কোনও দিন চা'ল আছিল না চুলা আছিল? ঘর ভাইয়্যা দিছি বারবার। উই পুকার মতো গড়ছে আবার!

কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-আড়িয়েলখা বিধৌত নদীমাতৃক ভূখণ্ডের মানুষগুলো সে গৌরব দাবী করতে পারে। এক হাতে রুখেছে প্রকৃতিকে—অন্য হাতে প্রতিহত ক'বেছে প্রবলতর শোষণবিলাসী মানুষকে। দু'হাতে সংগ্রাম ক'বে চলেছে আজীবন। তবু দুর্ভাগ্যকে জয় করতে পারেনি। শ্রাবণ-ভাদ্রের ভরা নদীতে শোনা গিয়েছে স্থপ্তোখিত অজগরের গর্জন—নিভৃত রাত্রে। পরদিন সকালে গিয়ে দেখেছে হয়তো একশ' দেড়শ' হাত এগিয়ে এসেছে নদী! কাল সন্ধ্যায় যে বিরাট অশ্বখ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখে গিয়েছিলে গৈরিকবসনা মেয়েটির উদ্দাম উচ্ছ্বাস—আজ সে মহীকহের চিরুমাত্র নেই। রাতারাতি নদীতীর ছেড়ে মানুষ চলে গিয়েছে অভ্যস্তুর ভাগে। সেখানে নতুন বন্দোবস্ত দেয় না জমিদার। নদী যদি জমি খেয়ে নেয় তবে কে কি করতে পারে? অসহায় স্ত্রীপুত্র গোকুল-চাগল নিয়ে মানুষগুলো ঘুরে ঘুরে, বানের মুখে কুটোর মতো। তারপর সংবাদ

আসে নদীর' ওপারে জেগেছে চর। উর্বর পলিমাটির চাদর মুড়ি দিয়ে
দলদলে কাদামাটি হাতছানি দেয় ওদের। চরের জল কেটে বসতি গড়ে
তোলে ওরা। মানুষ-থেকে কুমীরে তাড়া ক'রে ধরে নিয়ে যায় বিরলবসতি
চরের শিককে—বিষাক্ত সাপের করাল দংশনে নীল হ'য়ে যায় প্রিয়জন। তবু
ওরা হার মানেন না। চালায় লাঙ্গল, বোনে শস্ত, বসায় কলমের গাছ। ধীরে
ধীরে মাথা তুলে জেগে ওঠে গ্রাম। প্রকৃতিকে জয় ক'রে ওরা হাসে!

অমনি দেখা দেন আর একজন। এতদিন যিনি খোঁজই রাখেন নি মানুষ-
গুলো কি করছে চরে। তিনি জমিদারের লোক। ছকুম জারি হয়—নতুন
বন্দোবস্ত নিতে হ'বে। কে অনুমতি দিলে ওদের এখানে ঘর করতে?

অনুমতি? অনুমতি আবার কিসের? অনুমতি দিতে বাধ্য হ'য়েছে
প্রকৃতি—পৌরুষের দৃষ্ট নির্দেশে। কিন্তু সেকথা শোনে না জমিদারের
পেয়াদা। এ যুক্তি ওরা মানেন না।...

...দূরের গ্রাম থেকে সকলে মধ্যরাত্রে বেরিয়ে এসে দেখে নদীর বুকে
জলে উঠেছে বাড়বানল। বিস্তীর্ণ নদীর এ পাড়ে এসে পৌছায় না তার পোড়া
ছাই, অথবা হতভাগ্য গৃহনষ্ট মানুষের অন্তিম আর্তনাদ!

: চরইস্‌মাইলপুরে আগুন লাগছে মনে হ'তিছে?

: লাগবো না! হালার জমিদার।

এ যেন চিরন্তন একটি ব্যবস্থা! প্রতিবাদের প্রয়োজন নেই। গ্রীষ্মকালের
খররোদ্র, বর্ষার ধারাপাত, শীতের তীব্রতা যদি মুখ বুঁজে সহ্য করতে পার তবে
এটাই বা পারবে না কেন?

তবু উইপোকার মতোই মানুষগুলো আবার লেগে যায় ঘর বাঁধতে।

সেই পদ্মা-মেঘনা-যমুনার দেশের মানুষগুলি এসে ঘর বেঁধেছে কলোনীতে

কলোনী!

উদয়নগর উদ্বাস্ত কলোনী।

বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের মধ্যে জেগে উঠেছে নতুন বসতি। এলোমেলো

অগোছালো গ্রাম নয়। দস্তরমত গ্র্যান করা গ্রামনগরী। গ্র্যানের সুপ্রিন্ট দেখলে মনে হ'তে পারে ত্রিশ-চল্লিশ-কুট চওড়া সমান্তরাল সড়কগুলোর ছ'ধারে বাড়ীগুলি বুকিবা সাজানো। বাস্তবে কিন্তু বিসর্পিত রৈখার অগ্রশস্ত গলির কাদা ভেঙ্গে বাড়ীগুলির কাছে পৌছানোই কষ্টকর। ঈশ্বর জ্ঞানেন ক্রটি কার। যে সরকারি ওভারসিয়ার গ্র্যান দেখে রাস্তার লে-আউট দিয়েছিল তারই যোগ্যতার অভাব—অথবা সরকারি সড়ক গ্রাসে উৎসাহী কলোনীবাসীর যোগ্যতার পরিচয়! পাশাপাশি বাড়ী। তার ছাদ আলাদা। কোনটা পাকা, কোনটা কাদার। দরমা, মুলিবানও আছে। পলেন্তারা করা পাকা ইটের দেওয়ালের উপর কংক্রীটের ছাদ থেকে শুরু ক'রে পাটকাঠির দেওয়ালের উপর তাল পাতার ছাউনিও আছে। সরকারি খাতা অনুযায়ী এদের মূল্যমান হওয়া উচিত অভিন্ন। প্রত্যেকটি বাড়ী করার খরচ বাবদ সরকারি খাতায় ঋণের পরিমাণ সাড়ে বাইশ শ' টাকা। একচুল এদিক ওদিক নেই।

এদের মাঝে মাঝে আবার আছে অসমাপ্ত ঘর। কোনটা গ্রিন্থ পর্যন্ত গাঁথা, কোনটার লিটেল ঢালাই হ'য়ে থেমে আছে। মাঝে মাঝে উর্ধ্বমুখ পিলার-অহল্যা পাপঞ্চলনের প্রতীকায় দাঁড়িয়ে আছে। এদের যারা মালিক তারা নিরুদ্দেশ। জমি আছে—অসমাপ্ত বাড়ী আছে—নেই মালিক। কলোনীর পরিভাষায় ডেসার্টার! দুই লোকে বলে গৃহনির্মাণ ঋণের টাকা আত্মসাৎ করে এরা নাকি অপর জায়গায় গিয়ে ব্যবস্থা করেছে নতুন ঋণলাভের। উর্ধ্বমুখ পিলারগুলো বোধহয় সেকথা বিশ্বাস ক'রে না। শববীর প্রতীকায় ওরা দিন গোনে।

এ হেন একটি ডেসার্টারের বাড়ীর মাথায় খান কয়েক করগেট চাপিয়ে বর্তমানে বাস করছেন হরিপদ মাস্টারমশাই। সাতবছর আগে ট্রেনে-স্টিমারে যারা হরিপদ মাস্টারের নাম লিখে নিয়েছিলেন তাঁরা আজ তাঁকে দেখলে চিনতে পারবেন না। সাত বছরেই তাঁর বয়স বেড়ে গেছে যেন বিশ বছর। ডান চোখে একেবারেই দেখতে পান না তিনি। বাঁ চোখটায় তীব্র আলোর সামনে বুঝতে পারেন লোকজনের আনাগোনা। মানুষ চিহ্নিত করার মতোও

দৃষ্টিশক্তি নেই তাঁর। উমাশশী গার্লস স্কুলের হেডপণ্ডিত এপারে এসে বহু স্কুলেই দরখাস্ত করেছিলেন কিন্তু নতুন চাকরি জোটেনি তাঁর। লেখাপড়ার চর্চা ছিল তাঁদের পরিবারে। বড় ছেলে অনিমেষকে ওকালতি পড়াবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। হ'ল না। নমিতাও মেধাবী ছাত্রী। প্রাইভেটে পড়েই ম্যাট্রিক পাশ করেছিল সে। পড়ালে এতদিনে বি. এ, এম. এ পাশ করত হয়তো। কিন্তু কিছুই করা হ'ল না।

গৃহনির্মাণ ঋণের টাকা দিয়ে একটা বাড়ী করতে শুরু করেছিলেন। প্রায় শেষও হ'য়ে এসেছিল। তারপর অর্থাভাবে তিলে তিলে খুলে বিক্রি করেছেন জানালা-দরজা-টিন-ইট! নিজের উপার্জন নেই। অনিমেষ একটা রিক্সা চালায়। তাতেই চলে সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন। আজ দু'মাস সেও রোগ-শয্যায়। বর্তমানে এই ডেসার্টাস কোয়ার্টারে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি সপরিবারে। জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষাই ঘুচে গেছে। এখন বৃদ্ধের একমাত্র বাসনা ছোট ছেলেটিকে মানুষ করে তোলা। ওকে দিয়েই ফিরিয়ে আনতে হ'বে এ সংসারের লক্ষ্মীশ্রী।

ঘর একখানিই। তার মাঝামাঝি একটা শাড়ি টাঙ্গিয়ে এপাশে রাজি যাপন করেন হরিপদ মাস্টার আর স্ত্রী বিন্দুবাসিনী। নমিতা আর লতু সে দিকেরই ভাগীদার। শাড়ির অপরাংশে, গোরবে পাশের ঘরে, অনিমেষ আর কামিনী নিয়ন্ত্রণে দাম্পত্য আলাপ ক'রে। গোর। শোয় ওদের কাছেই। অন্ধের কনিষ্ঠ সন্তান এগারো বছরের বাবলু যে কোথায় শোয় তা বোধহয় সে নিজেই জানে না।

ক'দিন ধরে অনিমেষের জ্বরটা একেবারেই ছাড়ছে না। অবশ্য জ্বরতাপ মাপবার মাপকাঠি এক্ষেত্রে হরিপদ মাস্টারের হস্তস্পর্শই। কিন্তু উদ্বিগ্ন বাপের কম্পিত হস্তে কি ভুল নির্দেশ দিতে পারে না? অনিমেষ মাথা তুলে উঠে বসবার চেষ্টা করে। আজ তার শরীরটা অপেক্ষাকৃত ভালোই বোধ হ'চ্ছে।

: আবার উঠে বসলে কেন? প্রশ্ন করে কামিনী।

: জ্বরটা ছাড়লো মনে হ'চ্ছে।

কামিনীর ডান হাতটা এঁটো। গোরাকে খাওয়াতে খাওয়াতে উঠে এসেছে। বাঁ হাত দিয়ে স্বামীর ললাট স্পর্শ ক'রে। অর বেশ আছে বলেই মনে হয়—সেকথা জানাতে মন সরে না ওর। চুপ ক'রে থাকে।

: বউমা, র্যাশানের খলোটো দাও।

পর্দার ও পাশ থেকে হরিপদ সাড়া দেন। ত্রুপদে কামিনী বেরিয়ে আসে। খুত্তরের হাতে তুলে দেয় চটের থলিটা। আজ ডোল-ডে। খুত্তর গিয়ে চাল আনবেন তবে জ্বালা হ'বে উনান। অন্ধ মানুষ। ঠেলাঠেলি ছড়াছড়িতে সহজেই কাবু হ'য়ে পড়েন। চাল নিয়ে হয়তো ফিরবেন পড়ন্ত বেলায়। তখন রান্না চড়বে। র্যাশান-মেয়াদের শেষ কটি দিন কামিনীর প্রায় অভুত্ই কাটে। অনাহারক্লিষ্ট শরীরে সে তখন গিয়ে বসে কাঠের উনানের সামনে। ভিজা কাঠের উনানে ফুঁ দিতে চোখে জল আসে। তাতে হুঃখ নেই কামিনীর। কঁাদবার এ একটা ভালো অছিল।

বাপমায়ের আদরের মেয়ে ছিল কামিনী। একমাত্র সম্ভান—তাই অভিমানী ছিল সে বড়। অনেক খোঁজ করে বাবামা তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন হরিপদ পণ্ডিতের বড় ছেলের সঙ্গে। উচ্চশিক্ষিত মহোপাধ্যায় বংশ। অনিমেষ ছেলেও ভালো। তখন পড়ত কলেজে। আম-জামের বাগান ঘেরা ওদের বসত বাড়ীটা দেখে কল্যাণদায়গ্রন্থ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন—অভিমানী মেয়েটার অন্তত খাওয়া-পরার কষ্ট থাকবে না।

কিন্তু কোথা থেকে কি যে হ'য়ে গেল!

টিপি টিপি বৃষ্টি নামলো। মাথায় একটা গামছা চাপিয়ে হরিপদ মাস্টার র্যাশান আনতে বেরিয়ে গেলেন।

: বাবলু কোথায়? কঠোর কঠে প্রশ্ন করে অনিমেষ। ওর কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে কামিনী। বলে: কি জানি সে তো বেরিয়ে যায়, সেই কাক-ডাকা ভোরে।

: আর ফেরে বুঝি সেই প্যাচা-ডাকা মাঝরাত্রে?

কামিনী জবাব দেয় না। আপন মনেই বকতে থাকে অনিমেঘ : ছেলে-
মানুষ তো আর নয়। দশ এগারো বছর বয়স হ'ল। সংসারের অবস্থাটা
তারও বোঝা উচিত। অন্ধ বাপ বৃষ্টি মাথায় ক'রে র্যাশান আনতে যায়—
আর নবাবপুত্র কোথায় কোথায় আড্ডা মেয়ে বেড়াচ্ছেন।

এত দুঃখেও কামিনীর হাসি আসে। বলে : গাল দিচ্ছ কাকে ?

: নবাব খাজা খাঁর বেটা তোমার আদরের দেওরটিকে। আদর দিয়ে
দিয়ে যার মাথা খেয়েছ তাকে।

অনিমেঘের কণ্ঠস্বরে একবিন্দু কোমলতা নেই। বাবুলু যে তার বৌদির
আদরেই উৎসর্গে যেতে বসেছে এটুকু অনিমেঘ বর্ণে বর্ণে বোঝে। তাই
খোঁচা দিয়েই বক্তব্যটা শেষ ক'রে।

কামিনী রাগ করে না। দেওরের প্রতি তার স্নেহের আতিশয্যাটা যে
বাড়ীশুদ্ধ সকলে মাথা খাওয়ার পর্যায়ে ফেলে এটুকু তার জানা কথা। তাই
হাসিমুখেই সে জবাব দেয় : তা যেন বুঝলাম, কিন্তু জর গায়ে ভাইকে গাল
দিতে বসে আসলে কাকে গাল দিচ্ছ তা কি ভেবে দেখেছ ?

: কাকে ?—প্রশ্নটা বোধগম্য হয় না অনিমেঘের রোগদুর্বল মস্তিষ্কে।

: তোর বাপকে রে অহু, তোর বাপকে। ঐ যে তুই গরীব ইস্কুল
মাস্টারকে নবাব খাজা খাঁ বল্লি না, তাই বৌমার মুখে হাসি আর ধরছে না।
আসল নবাবের ঘরের মেয়ে কিনা তাই স্বস্তিরে খোঁসারে আনন্দের আর
পরিসীমে নেই !

কামিনী ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথার আঁচল তুলে দেয়। বিন্দুবাসিনী। কঠোর
সত্যটা অকস্মাৎ মুখব্যাদান ক'রে দাঁড়িয়েছে। একই ঘরে বাস ক'রে ওরা।
শুভর-শান্তি, পুত্র-পুত্রবধু ! মাঝের টাঙ্গানো বস্ত্রখণ্ডটি গেরা যে কখন টেনে
নামিয়েছে তা খেয়ালই হয়নি কারও। দৃষ্টান্তের অসময়ে মঞ্চাধিপের
অনবধানতার ডুপসীন উঠে গেলে—যেমন করে ছুটে পালায় সীন সিফ্টারেরা,
তেমনি দ্রুতপদেই নিজস্ব হ'তে চায় কামিনী ঘর থেকে। বাধা পায় সেদিক
থেকে নমিতা প্রবেশ করায়। নমিতার হাতে এক বাটি বালি। অনিমেঘের

তক্ষাপোশে সেটা নামিয়ে রেখে মায়ের দিকে ফিরে বলে : তুমি আবার ওদের
কথার মধ্যে কথা বলতে এসেছ মা ? একখানা ঘর—ওরা কি স্বামী-স্ত্রীতে
কোন কথাও বলতে পারবে না তোমার জালায় ?

: অন্তায় হয়ে গেছে মা, মাপ চাইছি । তবে চোখ-কানের সামনেই এসব
হ'তে দেখলে সব সময় স্থির থাকতে পারি না । কি করব ! কপাল আমার !

আপন মনে গজ গজ করতে করতে তিনি চলে যান । নমিতা
এবার কামিনীকে বলে : আর তোমাকেও বলি বৌদি । জানো তো একখানি
মাত্র ঘর । ওসব কথাগুলো কি চেষ্টা না বসেই নয় ?

কামিনী বলে : কপাল আমারও ঠাকুরঝি । শান্তডী ননদ যে সব সময়
আড়ি পেতে আছেন এটা মনে থাকে না আমারও ।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় নমিতা । যেন কিছু বলবে সে । তাবপর
রোগজীর্ণ অনিমেষের দিকে তাকিয়ে সামলে নেয় নিজেকে । চলে যায় ধীর
পদে । কামিনীও অনুসরণ করে ।

অনিমেষ চুপ ক'রে শুয়ে থাকে । আজ দু'মাস সে শয্যাগত । তাব
আগে সেও বেরিয়ে যেত সেই কাকডাকা ভোরে—আর ফিরত সাড়ে দশটার
শেষ লোকালের প্যাসেঞ্জার দেখে পেঁচাডাকা মাঝরাতেই ! অনিমেষ ভাবে
তাড়াতাড়ি সব বদল হ'য়ে যাচ্ছে । শুধু তাদের আর্থিক সচ্ছলতাই নয়, মানুষ-
গুলো পর্যন্ত । উমাশশী গার্লস স্কুলের হেডপণ্ডিত হরিপদ চক্রবর্তী তো আমূল
পরিবর্তিত হয়ে গেছেন । শুধু দেহে নয় মনেও । সত্যশ্রয়ী আদর্শবাদী হবিপদ
পণ্ডিতের যে প্রেতাশ্রয়ী আজ উদয়নগর কলোনীর ডোলভুক্ ভিক্ষাজীবী তাকে
চেনা যায় না । বদলে গেছেন বিদুবাসিনীও । উচ্ছল সংসারের অধিষ্ঠাত্রী
দেবী ছিলেন তিনি । গোয়ালঘরে গোমাতার সেবা থেকে আহারাশ্লে পণ্ডিতের
হাতে খড়কে কাটিটি এগিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজটুকু তিনি নিজে হাতে
করতে চাইতেন । নববধু কামিনীকে ধীরে ধীরে শিপিয়ে নিতে চেয়েছিলেন
এ বাড়ীর কুলাচার । নিবিবাদী মানুষ ছিলেন তিনি । কটুকথা কেউ কখনও
শুনতো না তাঁর মুখ থেকে । পুত্রবধুর সঙ্গে মুখোমুখি ঝগড়া করা তো

স্বপ্নকথা! বদলেছে নমিতাও। কামিনীর সঙ্গে ওর বয়সের তফাৎ নেই। দুই অন্তরঙ্গ সখীর মতোই ছিল ওরা ওপারে। আজ তাদের সামান্যতম জিনিস নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। দোষ অনিমেষ দেবে কাকে? একটু আগে বকছিল বাবলুকে। কিন্তু বাবলুই কি এ রকম ছিল চিরকাল? ছেলেবেলার বাবলুকে মনে পড়ে। এক মাথা কৌকড়া কৌকড়া চুল। নিটোল স্বাস্থ্য। সবচেয়ে আশ্চর্য ওর চোখ দুটো। ডাগর চোখ দুটির অন্তরালে যেন কোন অতলস্পর্শ গভীরতা আছে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দুঃখ কষ্টই পেয়েছে এতদিন। ওপারের জীবনটা তার কাছে গল্পকথা। নিজের বাল্যকালের সঙ্গে তাইয়ের শৈশব তুলনা করে এতদিন শুধু কষ্টই পেয়েছে। উমাশশী গার্লস স্কুলের হেড পণ্ডিতের বেতন যাই হ'ক সংসারে প্রাচুর্য ছিল যথেষ্টই। অপধাপ্ত মাছ, অটেল আম-জাম-কলা। খাওয়ার কষ্ট কাকে বলে—খিদে পেলে অনুভূতিটা কেমন হয় অনিমেষ জানতে পারেনি এপারে পা দেবার আগে। বাড়ীর সামনে ছিল একটা কলা আর একটা কালোজামের গাছ। নীল হ'য়ে থাকত গাছের তলাটা পাকা ফলের প্রাচুর্যে। পেড়ে কুড়িয়ে নিঃশেষিত করা যেত না তার অক্লপণ দান। মানুষের পদদলনে নীলাভ হ'য়ে থাকতো পাকা জামের রসে পথ চলতি সড়ক। আর আজ জাম বিক্রি হয় পয়সায় চারটে। বড় বড় ডাগর চোখে লোলুপতা ফুটে ওঠে বাবলুর। দাদা বলে : জাম খাবি বাবলু? যা এক পয়সার কিনে আন।

: ভারি তো জাম—ঠোট উন্টে জবার দিত বাবলু।

এত বুঝমান ছিল সে। খিদেয় শুকিয়ে গেছে মুখটা—তবু খেতে চায়নি। অতটুকু ছেলেমানুষ বুঝে নিয়েছিল এ সংসারের অসহায়তা। শুধু বড্ড বেশী খিদে পেলে বোদির কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে সলজ্জে জিজ্ঞেসা ক'রেছে : আজ ক্যান রাখনি বোদি?

জবাব দিতে পারে না হয়তো কামিনী। সে কি করে বোঝাবে অতটুকু ছেলেকে—যে ক্যানটা আলাদা করে রাখলে ভাতের পরিমাণ যায় কমে। সহজে হজম হয়ে অল্প সময়েই খিদে পায়। তাই ভাত থেকে ক্যানটাকে

বিমুক্ত করা আর সম্ভব হ'চ্ছে না এ সংসারে। বোদির মুখ দেখেই বুঝে নেয় বাবলু। তাড়াতাড়ি শুকনো ঠোটে বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে বলে : ঝাঁচিয়েছ বোদি ; ও ফ্যান সত্যিই গিলতে পারি না আমি। মাগো ! মাছুষে খায় নাকি শুধু ফ্যান ছুন দিয়ে !

ওর হাসি দেখে চোখে জল আসে হয়তো কামিনীর !

সেই বাবলু !

অনিমেষ উত্তপ্ত মস্তিকে বসে বসে তাই ভাবে। সেই বাবলুর এতবড় পরিবর্তন হয় কি ক'রে ? শত চেষ্টাতেও ওকে বই নিয়ে বসানো যায় না। ব'লে, ব'কে, মেরে হাল ছেড়ে দিয়েছেন হরিপদ মাস্টার। নমিতাও বোধহয় আশা ত্যাগ করেছে। 'ও গাধাটার কিছু হবে না' বলেছেন পণ্ডিত। অনেক গাধাকে যিনি পিটিয়ে মাছুষ করেছেন—এবং বাবলুর মেধা আর অধ্যবসায় নিয়ে ঋণ গর্বের অন্ত ছিল না, এক সপ্তাহে তার অক্ষর পরিচয় শেষ হয়েছিল বলে যে পণ্ডিতের প্রশংসার ভাষা জোগায়নি—তিনিই শেষ পর্যন্ত এ ভবিষ্যদ্বানী ক'রে বসলেন একদিন। সংসারের কোনও কাজ করবে না। আজকাল কারও সঙ্গে ভালো করে কথাই বলে না। কোন ভোরে উঠে বেরিয়ে যায় কেউ টেরই পায় না। ছুপুরে ফিরে কোনও দিন খায় কিনা তা ওর বোদিই জানে। সারাদিন ওর দেখা নেই। রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন ও গুটিগুটি এসে শুয়ে পড়ে ওর নির্দিষ্ট মাত্রেরে। হয়তো ঘুম ভেঙে যায় নমিতার অথবা বিন্দুবাসিনীর। কিন্তু মধ্যরাত্রে আর কে ছেলে শাসন করতে বসে। স্তরাং লালয়েং, তাড়য়েং কোনটাই হ'য়ে ওঠে না। এগারো বছরের এক ফোঁটা বাবলু সংসারের শাসন শৃঙ্খলাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলেছে।

অনিমেষ কি করতে পারে ? বাবলু তো ছেলে, অল্প বয়স। লভুটাকেই কি শাসন করতে পারে ? ঐ বোধহয় একমাত্র মেয়ে যার কোনও পরিবর্তন হয়নি। এপারে আসার সময় কতই বা বয়স ছিল ওর। বছর সাত আটের একটা চঞ্চল ফুটফুটে মেয়ে ছিল। আজ ওর বয়স পনেরর কোঠায়। গড়নটা বাড়ন্ত নয় বলে আজও ক্রক পড়ে। কিন্তু বয়স তো ছেলেমাছুষের নয়। লভু

বোধহয় দেহে মনে আজও সেই লতুই আছে। সেই কিশোরী বালিকা। শুধু কিছু বাজে নভেল প'ড়ে অকালপক হয়েছে ইতিমধ্যে। লেখা পড়ার ধার সেও ধারল না! লতুর জন্তে ভেবে আর কি হবে? সব গুণের অধিকারিণী হওয়া সত্যেও নমিতারই যখন কোনও ব্যবস্থা করা গেল না—তখন লতুর আর কি হ'তে পারত? কিন্তু বাবলুটার উপর বড় ভরসা ছিল যে! অনিমেষ অবাক হ'য়ে ভাবে—সংসারের সব কাজে কামিনীর এত বুদ্ধি, এত বিচক্ষণতা, আর এই সোজা কথাটা কেন সে বোঝে না? কামিনী কেন বোঝে না যে ঐ একফোটা ছেলেটার দিকে চেয়েই দিন গুনছে এতগুলো লোক। সে মানুষ হবে, লেখাপড়া শিখবে, চাকরি বাকরি ক'রে এই ভেঙ্গে পড়া সংসারটাকে আবার খাড়া করে তুলবে! মহোপাধ্যায় বংশের শেষ সম্মানটুকু হয়তো ওই পারতো উদ্ধার করতে; অন্ধ হরিপদপণ্ডিতকে এ উৎসৃতি থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারতো অন্তত শেষের কটা দিনের জন্ত।

: ওমা, বালিটুকু এখনও খাওনি? জুড়িয়ে জল হয়ে গেল যে? কামিনী এসে দাঁড়ায়।

: মা কোথায়? —অনিমেষ প্রতিপ্রশ্ন করে।

: মা জল আনতে গেছেন।

রাস্তার ধারে নলকূপ। এতদিন কামিনী অথবা নমিতাই জল নিয়ে আসতো। সম্প্রতি এ দায়িত্বটা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন বিন্দুবাসিনী। কামিনী অথবা নমিতা প্রতিবাদ করেনি। করবার উপায়ও ছিল না। নতুন একখানা শাড়ি না কেনা পর্যন্ত তাদের দুজনের কারও পক্ষে সম্ভব নয় রাস্তার কল থেকে জল তুলে আনা। বাইরে বের হবার অর্থাৎ জল আনতে যাবার একটি মাত্র এজমালি শাড়ি ছিল—কোনদিন কামিনী কোনদিন নমিতা সেখানি পরেই জল নিয়ে আসতো। সেটিও জীর্ণ হ'য়ে এসেছে। তাছাড়া টিউব-ওয়েলের ঠিক সামনেই জয়হিন্দ কেবিন। চায়ের দোকান। ডি-রকের সেক্রেটারি বিষ্টপদ মজুমদারের রেস্টোরঁ। যত রাজ্যের বেকার বকাটে ছোড়ার আড্ডা সেটা। স্বয়ং বিষ্টপদও কম না। এটা অনুভব করেছেন বলেই বিন্দুবাসিনী

সেইদায় এ দায়িত্বটা নিরেছেন। লজ্জা অবশ্য এ কাজটা ক'রে দিতে পারতো সংসারের। করেও মাঝে মাঝে কিন্তু আবার মাঝে মাঝে ভুলেও যায়। এই 'মাঝে মাঝে' ব্যাপারটা এত ঘন ঘন ঘটতে লাগলো যে শেষ পর্যন্ত বিন্দুবাসিনী আর ওর উপর ভরসা করতে রাজী নন। পানীয় জলটা মাঝে মাঝে ভুলে গেলে সংসারটাও মাঝে মাঝে অচল হ'য়ে ওঠে !

এতকথা অনিমেষ জানে না। বলে : মা জল আনতে গেছেন ? কেন ? জলটুকুও ভুলে আনতে পার না তুমি ? নমু পারে না, লজ্জা পারে না ?

একটু ইতস্তত করে কামিনী। তারপর বলে : লজ্জার কথা জানি না কিন্তু ঠাকুরঝি বা আমার লজ্জা করে—এ শাড়িটা—

: ও। তা ই'য়ে, বাবলুকেও তো বলতে পার সংসারের এটুকু কাজ ক'রে দিতে। ষাট বছরের বুড়িটাকে সেও তো একটু সাহায্য করতে পারে। আমরা তার নাগাল না পেলেও তুমি তো তার দেখা পাও।

: আচ্ছা বলব অখন ! কিন্তু বালিটা খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি !

: না খাব না। আগে আমার কথার জবাব দাও। সত্যি তুমি কি ভেবেছ মনে ? এ ভাবে বাউণ্ডলে হ'য়ে যাবে ছেলেটা ? লেখাপড়া শিখবে না ? মানুষ হ'বে না ?

কামিনী কি যেন ভাবে একটু। তারপর বসে পড়ে ওর চৌকির একপ্রান্তে। ধীরে ধীরে স্বামীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে : কথাটা তোমাকে বলব বলব ভাবছিলাম। দেখলে তো, ওর লেখাপড়া হবে না। বাবা আর ঠাকুরঝি যতই কেন না বকাঝকা করুন ও বই নিয়ে কিছুতেই বসবে না। ও চাইলে বিটুর দোকানে কাজ করতে। এক বেলার খোরাকি আর মাসে পাঁচটাকা নগদ ! অথচ তোমরা রাজী হ'লে না। তোমরা মত দাও ওকে আমি ঐ চাকরিই নিতে বলি। যা হোক সংসারের আয় তো হবে !

নমিতা বসেছিল ঘরের প্রাঙ্গণ চৌকাঠের কাছে। উঠে আসে সে। আর সম্মত হয় না তার। বলে : বাবা আর ঠাকুরঝির বকাঝকায় কেন কাজ

হয় না তা তো তোমার অজানা নেই বৌদি। বাড়িতে একজন যদি অনবরত আশকারা দিয়ে যায় তবে তাকে শাসন করে কে? বাবলু হবে চায়ের দোকানের বয়? ওর লেখাপড়া হবে না। কেন হবেনা? জানো, বাবা বলতেন ওঁর ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় বাবলুর মত মেধাবী ছেলে একটিও দেখেননি। পড়লে ও নিশ্চয়ই বৃত্তি পাবে পরীক্ষায়।

: সে কি আমিই জানি না ঠাকুরঝি? পড়াতে পারলে তুমিও এতদিনে বি. এ. পাশ ক'রে চাকরি করতে—তোমার দাদাও হয়তো ওকালতি করতে পারতো। কিন্তু তা তো হ'চ্ছে না। ইচ্ছা থাকতেও তোমরা পড়ানো চালাতে পারলে না—আর ওকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমরা পণ্ডিত করে তুলবে?

নমিতা কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে কামিনী তার যুক্তির ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে: তাছাড়া সংসারটা তো চালাতে হ'বে? তোমার দাদা আজ দু'মাস বিছানায় পড়ে। মাহুযতো কমগুলি নই আমরা সংসারে?

নমিতা জবাব দিতে পারে না। অনিমেষও কোন উত্তর খুঁজে পায় না। এতদিন সংসারটা চলছে কি ক'রে সেই এক বিশ্বয়। অবস্থা অবস্থা চরম সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে—তবু অচল হ'য়ে তো পড়েনি। চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অভাগীদের এ সংসারটাও।

: তোমরা বুঝিয়ে বল বাবাকে। ঠাকুরপোকে বিটুর দোকানেই ঢুকতে দাও!

: না! হঠাৎ দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠে অনিমেষ: জীবনে অনেক নিচে নেমেছি; কিন্তু আর নামতে পারব না।

কামিনী জবাব দেয় না। সে জানে আসল অভিমানটা কোথায়! সামাজিক মর্যাদার অভিমান। জাতের অভিমান। মতিগঞ্জ স্কুলের হেডপণ্ডিত হরিপদ চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ পুত্র মহোপাধ্যায় ৬ কৃষ্ণচন্দ্র ভিষগ্ৰন্থের পোত্র—চায়ের দোকানে ছত্রিশ জাতের ভুক্তাবশিষ্ট পরিষ্কার করবে—নিবিদ্ধ মাংসের উচ্ছিষ্ট প্লেট ধুয়ে মুছে তুলবে—এ প্রস্তাব কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছেন না তাঁরা।

অবস্থার ফেরে পণ্ডিতগরি আজ রাস্তার নলকূপে জল আনতে যান—পণ্ডিত-মশাই গিয়ে দাঁড়ান ভিক্ষার ঝুলি হাতে ভোল অফিসে—পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠপুত্র—যাকে ওকালতি পড়াবার বাসনা ছিল পণ্ডিতদম্পতীর সে আজ রিকসা চালায় ; কিন্তু ব্যাস ! ওর নিচে আর নামা যায় না।

: বালিটা খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি !

অনিমেষ আর আপত্তি করে না। চটা-ওঠা কলাই করা বাটিটা হাত বারিয়ে গ্রহণ করে।

জলভরা ঘড়াটা সশব্দে উঠানে নামিয়ে হাঁপাতে থাকেন বিন্দুবাসিনী। বয়স হয়েছে, অতবড় ঘড়াটা বয়ে আনতে তাঁর সত্যিই কষ্ট হয়।

বাইরে কে যেন ডাকে : পণ্ডিতমশায় রইছেন নাকি ঘরে ?

: কে ? ভিতরে আছেন। সাড়া দেয় অনিমেষ।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে বিষ্টুপদ। ডি-ব্লকের সেক্রেটারি তথা জয়হিন্দ-কেবিনের মালিক স্বনামধন্য বিষ্টুপদ মজুমদার। কামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ পায় না। দরজার কাছেই বিষ্টুপদ দাঁড়িয়ে আছে। কামিনী মাথায় ঘোমটা তুলে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে অনাবৃত হ'য়ে পড়ে পিঠের আধখানা—ছিন্ন কাপড়ের ফাঁকে। সেটা অল্পভব করে সে। তাড়াতাড়ি সেটুকু ঢাকতে গিয়ে ঘোমটাটা নামিয়ে দিতে হয়। বিষ্টুপদের সঙ্গে চোখা-চোখি হয় ফলে। অস্বস্তিকর অবস্থা।

বিষ্টুপদ হাসে : আরে আমাকে দেইখ্যা ফির লজ্জা পাও ক্যারে ? আমি তো ঘরেরই লুক।

: আছেন. এখানে এসে বসুন।—অনিমেষ আহ্বান করে ওঁকে চৌকিতে এসে বসতে। বিষ্টুপদ কিন্তু এগিয়ে আসে না, দ্বার ছেড়ে। সেখান থেকেই বলে : বৌমারে একখান শাড়ি কিন্তা দাও সে অনিমেষ ! ঘরের লক্ষ্মীকে একেরে উদামগা কইর্যা রাখছ, মা লক্ষ্মীতো বেবাক অখুশী অইবই !

আপাদমন্তক জালা ক'রে ওঠে অনিমেষের। দাঁতে দাঁতে চেপে বলে : ওকে যেতে দিন। দরজা ছেড়ে বসুন এখানে এসে !

এবার বিষ্টপদকে এগিয়ে আসতে হয়। কামিনী ক্ষতপদে নিজস্ব হস্ত ঘর থেকে। যেন কৌরবসভা ত্যাগ করলেন যাজ্ঞসেনী।

: মাস্টার মশয় কই? বাবলুরে দেখিনা?

: বাবা র্যাশান আনতে গেছেন। বাবলু বাড়ি নেই। কি বলছিলেন বলুন।

: কইং ছিলাম কি বাবা অন্ধ বুড়াটারে ক্যান পাঠাও ডোল অফিসে? বউডারে না পাঠাও বুইন ছুডার একটারেও তো পাঠাইতে পার?

: কেন পারিনা তা তো আপনার জানা উচিত মজুমদারবাবু। ছু ছুবার ডি-ব্রকে শাড়ি বিলি হ'ল অথচ আমাদের বাড়ি বাদ পড়ল। আপনি সেক্রেটারি, আপনার তো ভুলে যাওয়া উচিত নয়?

: কি ককুম কও! পাচখান শাড়ি তো পঞ্চাশ জন পরিবার। কারে দিয়া কারে রাখুম কও?

: যাক্ যা বলতে এসেছেন বলুন।

: বাবলুরে আমারেই দাও। দুকানে একডা ভালো ছুকরা খুঁজতাছিলাম। চাইর হারামজাদরে রাখছি—চারডারেই তাড়াইছি। হালারা সব চোর! বুঝল না বাবা, পিছন ফিরছি কি মুখে ঢুকাইছে খাওন।

বলতে বলতে পানের ডিবা থেকে একখিলি পান নিয়ে নিজের মুখে দেন তিনি। তারপর স্বর করেন: বাবলুডা হাজার হউক চোর আইবনা, পণ্ডিতের পোলা, আর যা শিশুক চুরি বিজাটা শিখে নাই—না কি কও? ...আরে ক্যা ও নমু? নমুদিদি! আমারে টুক চুন দাও সে নমুদিদি!

: আপনাকে তো আগেই বলেছি মজুরদার মশাই। ওকে আমরা লেখা-পড়া শেখাব। চাকরি করতে দেবনা।

: আরে দাতু কও তো ভালই—কিন্তু পারতেইটা কই? কোনও কাজ কামের মধ্যে চুকায়ে দাও। বদমাইসিডা কমব। তাছাড়া ছু পয়সা রজ্জগারও হইব সংসারে। পাচডাটাকা মাস মাস তাই বা আয়ে কুখিক্যা?

ঘরের হালতো দ্যাখতেছ? .বুইনগুনার বিয়া চাওন লাগকো। নম্বর দিকে তো চক্ষু তুল্যা চাওন যায়না। ...আরে এ্যাই যে চুন আনছ দেহি!

নমিতা চুনের পাত্রটা হাতে প্রবেশ করেছে একটু আগেই। বিষ্টুপদ সেটি গ্রহণ করেন। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে নমিতার দিকে। শুকনো চোঁটটা জিব দিয়ে একবার চেটে নেয়। নমিতা চুনের পাত্রটা নামিয়ে রেখে চলে যায়।

: ই্যা কি জ্ঞান কইংছিলাম? নাকি চাওন যায় না! তারপর ধর গিন্না রুজ্জগারের পথ দেখাইলেও যদি না লও তোমরা, তখন ত জি র্যাশন মিলব না! টারভেসান তো সবার জুন্তি নয়!

হাসে অনিমেষ—পাণ্ডুর হাসি। বিষ্টুপদ প্যাচ কষছে। কলোনীতে যারা বেকার—কোন রুজ্জগারের ব্যবস্থাই যারা ক'রে উঠতে পারেনি, সেই সব ছঃছ পরিবারকে স্টারভেশন ভোল দেবার ব্যবস্থা আছে।' র্যাশান কার্ড বিলি করেন 'আর. ও'-সাহেব। তিনি সরকারি কর্মচারি। তবে কে কার্ড পাবে কে পাবেনা এটা স্থির করেন তিনি ব্লক-সেক্রেটারিদের মাধ্যমেই। ব্লক-সেক্রেটারিরা কলোনীরই লোক। কিছুটা স্বায়ত্ব-শাসন দেওয়া হ'য়েছে আর কি। তাই ব্লক-সেক্রেটারি দরখাস্তগুলি নিয়ে তদন্ত ক'রে রিপোর্ট দেন। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী বিচার করা হয় কোনও পরিবার জি র্যাশন পাওয়ার প্রকৃত অধিকারী কিনা। বিষ্টুপদ ইচ্ছা করলে এঁদের জি র্যাশন পাবার অধিকারটুকু কেড়ে নিতে পারে। সেই ইচ্ছিতই যে সে করছে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না অনিমেষের। নিরুদ্ধ আক্রোশে সে ফুলতে থাকে। সে বুঝে নিয়েছে বিষ্টুপদের কারসাজি। অল্প মাহিনার বিশ্বস্ত একটি চোকরা চাকর পাওয়ার লোভে এই প্যাচ কষছে।

বিষ্টুপদের উদ্দেশ্য কিন্তু আরও গভীর। সে চায় এই পরিবারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'তে। তার খাপদ চক্ষুর দৃষ্টি ফিরছিল ওপাশের ছেঁচা বেড়ার ঘরখানির আশে পাশে। অসংবৃত্ত বসনে যেখানে ঘরকন্নার কাজ করছে কামিনী। ডি-ব্লকের টিউব-ওয়েলটা জয়হিন্দ কেবিনের ঠিক উল্টো দিকেই। চারের

দোকানে বসেই বিষ্টপদ লক্ষ্য করে পাড়ার মেয়েদের জল নেওয়া। কামিনীর সঙ্গে কয়েকবার তার দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে। মেয়েটার যে বয়স হয়েছে তা বেন বোঝাই যায় না। বছর চব্বিশ পঁচিশের কম হবে না। এক ছেলের মা। কিন্তু হ'লে কি হ'বে, মেয়েটার একটা অদ্ভুত আকর্ষণীয় শক্তি আছে। পাড়ার অনুতা ষোড়শী অষ্টাদশীদের কাউকে দেখতে তো বাকি নেই তার। ডলি, শেফালী, সরমা, নমিতা,—সবাইকেই তো দেখে ওখানে বসে, কিন্তু এক ছেলের মা এই মেয়েটার পাশে দাঁড়াতে পারে কেউ? রঙটা শ্রামবর্ণ নয়, কালোই। তা হ'ক, স্বাস্থ্য কিন্তু তার অটুট। আজ মাসখানেক মেয়েটা জল নিতে আসছে না কল থেকে। বাবলুটাকে দোকানে ঢোকাতে পারলে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। গরজটা বিষ্টপদের তাই বড় বালাই হয়ে পড়েছে। বাংলা উপন্যাস যথেষ্ট পড়া আছে বিষ্টপদের। কণ্ঠস্থ আছে বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ রসস্থ অঙ্কুশেদ। পরকীয়া প্রেম অসিদ্ধ—হিঁদুঘরের কেউ এ অনাচার সহ্য করবেনা! অদ্ভুত বিষ্টপদের তাই ধারণা।

অনিমেষ ধীরে ধীরে বলে : ও কথাটা মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই বিষ্টুবাবু। এ বাড়িতে কেউ উপার্জনক্ষম নেই ব'লে আমরা স্টারভেশন ভোলপাই। আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের ওটা থেকে বঞ্চিত করতে পারেন এটা আমার মনে আছে!

: আরে কি কও! সব কথারই তুমি বাক্য অর্থ লও দেহি। তোমাগো ভালবাসি তাই না টারভেশন ব্যবস্থা কর্যা দিছি। ...আরে এ ছিছি চুণ বেশী লইয়া লিছি দেহি। মুখ একেরে পুড়্যা গেছে। আরে অ নমু! কই গেল এয়ারা? বোমা, অ বোমা!

অসহায় অনিমেষ বস্তু দৃষ্টি মেখে শুয়ে থাকে। ঘরে এসে ঢোকে লতু। বছর পনের বয়স। বাড়ন্ত চেহারা নয়—আজও ক্রক পরে। চোখে মুখে কথা ফোটে তার। সংসারের কোন কাজে তাকে পাওয়া যাবে না। এসেই বলে : কি হ'য়েছে দাদুর? চুণে মুখ পুড়েছে বুঝি!

: হ!

লতু খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ওঠে!

: আরে অই! হাসতেছ ক্যান?

: চুণে কি আপনার মুখ পুড়েছে? পুড়েছে অন্য কিছুতে?

: কি কও?

: কই কি যে চুণেও মুখ পোড়েনা—কালিতেও মুখ পোড়েনা। এমন কি চুণ কালি একসঙ্গে মুখে পড়লেও অনেক নির্লজ্জের মুখ কিছুতেই পুড়তে চায়না কিনা!

অনিমেষ ধমক দিয়ে ওঠে: কি হ'চ্ছে—এই লতু!

: তা তুমি রাগ করলে কি হ'বে। দাছ আমাদের রসিকতা ঠিকই বোঝে—না দাছ? তা' জল দেবো? মুখটা ধুয়ে ফেলবে? এখন জনই চাও—চুণ-কালি যা চাও সব জোগাড় দেব আমি! দিদিও আসবেনা—বৌদিও না!

: তুই যা বলছি—যা এখান থেকে! ধমকে ওঠে অনিমেষ। হাসতে হাসতে লতু চলে যায়।

মুখখানা কালি ক'রে ব'সে থাকে বিষ্টুপদ। তারপর হঠাৎ হেসে সে লতু করে ব্যাপারটা: আরে লতুর কথা ধর ক্যান। এ্যাকেরে পোলাপান! তা যাউক! কাল থিকা বাবলুরে দুকানে পাঠাইবা তো?

হরিপদ পণ্ডিত ইতিমধ্যে ফিরে এসেছিলেন। সমস্ত শরীরটা তাঁর ভিজে গেছে। বুষ্টির জলে না ঘামে তা তিনিই জানেন। উত্তেজনায় পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছিলেন তিনি। বিষ্টুপদের প্রস্তাবটা কানে গিয়েছিল তাঁর। তাই উঠান থেকেই বলেন: না!

: না? না—ক্যান?

: কারণ ব্রাহ্মণের ছেলে কোন জন্মে শূদ্রের দোকানে চাকরের কাজ করে না তাই।

: অ;—বুঝছি। তা বামুন ঠাকুরের ভিকার অন্ন তো মিষ্ট লাগবই।

বামুনের ব্যবসাই যে ভিক্ষা। এখন আমার টাহাড়া দিয়া জ্ঞান আমি চাইল্যা
যাই।

: টাকা? কিসের টাকা?

বিষ্টুপদ পকেট থেকে একটুকরা কাগজ বার ক'রে মেলে ধরে। বিশ্বরের
উপর বিশ্বয়। এগারো বছরের বাবলুর আঁকা বাঁকা অঙ্করে লেখা, “দশটাকা
ধার হিসাবে বুঝিয়া পাইলাম। বাবলু।”

প্রথমটা বাক্যস্মৃতি হয়না কারও। অনিমেষ সামলে নেয় নিজেকে।
বলে: আপনি ছেলেমানুষ নন বিষ্টুবাবু। এগারো বছরের ছেলের
যে হাতচিঠি দিয়ে টাকা ধার করার অধিকার নেই—আর নিলেও যে
তার জ্ঞান তার বাবা দাদা দায়ী হয় না—এ সহজে কথাটা আপনার জ্ঞান
উচিত।

: আপনারা টাহা দিবান না?

: না! একবার নয়—একশ'বার না! অনিমেষ উত্তেজিত। হরিপদ
নীরব।

: বেশ এখন আর আমারে ছুষবান না। আমি আদায় করবাম!

: আদায় করতে পারেন করবেন। গায়ের জামাকাপড় খুলে নিতে
পারেন। ধার সে শোধ দেবে কেমন করে?

হাহা করে হাসে বিষ্টুপদ।

: টাহা আদায়ের ফন্দিও কিছু জ্ঞান আছে দাদু! উত্তলের কথা না
ভাইব্যা টাহা দি' নাই! আচ্ছা চলি!

ভিজা ছাতাটা তুলে নিয়ে বিষ্টুপদ রওনা দেয়। দৃঢ় পদক্ষেপ তার।
সে পদক্ষেপে টাকা আদায় সম্বন্ধে কোনও সংশয় আছে ব'লে মনে হয় না।
অনিমেষ বিস্মিত হয়। হরিপদের বোধহয় বিস্মিত হবার মতোও মানসিক
অবস্থা নেই। বিদ্যুৎবাসিনী বলেন: বাবলু টাকা ধার করেছে? এক-আধ
নয় দশটাকা? আজ আশুক ছেলে ঘরে।

কেউ সে কথার জবাব দেয় না।

বিষ্টপদ ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়বার আগেই কে তাকে ডাকে পিছন থেকে : শুন্ন !

অনতিদূরে কামিনী ! আশ্চর্য ! যে মেয়েটা তাকে দেখলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, ভুলেও মুখ তুলে তাকায় না,—সেই আজ তাকে পিছন থেকে ডাকছে ! বিষ্টপদ ফিরে এসে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে দাঁড়ায় । একটু পিছিয়ে দাঁড়ায় কামিনী ।

: বাবলুকে কিছু বলবেন না—সে আপনার টাকা ফেরত দেবে ।

কি কও ! আজ দেড় মাস হয়। গেছে এক পয়সা দেয় নাই—এ্যারে আর বিশ্বাস কি ?

: আমি কথা দিছি । আমি আপনার টাকা শোধ দেব ।

: তুমি ? তুমি কই পাইবা ?

: সে কথা যাক । আপনি কথা দিন বাবলুকে যারধর করবেন না । হঠাৎ খুশীতে হাসি উথলে ওঠে বিষ্টপদের সর্পচক্ষুতে । এ ব্যাপার তো আশা করা যায়নি । এ যে গাছে না উঠতেই এককাদি ! ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে বিষ্টপদ : এড়া কি কও, তুমি দিবা টাহা আর তাই আমি হাত পাইত্যা নিবাম ?

কামিনী সতর্ক হ'য়ে স'রে দাঁড়ায় ।

: তুমি ভরসা দিলি আর আমার ভয়ভা কি ?

কামিনী এবারও নিরুত্তর ।

: জল আনবার যাওনা দেহি—ক্যারে ? বিষ্টপদ একেবারে বিগলিত । কামিনী একটা কঠিন জবাব দেবার আগেই পিছন থেকে ডাক শোনে : বোমা !

তিন পা পিছিয়ে দাঁড়ায় বিষ্টপদ । বিন্দুবাসিনী এগিয়ে আসেন । দ্রুতপদে বিষ্টপদ গলিটা পার হয়ে যায় । একবারও পিছন ফিরে তাকায় না ।

: অনেক সঙ্ক করেছি বোমা—অনেক নিচে নেমে গেছি আমরা ! শেষ আঘাতটা বোধহয় তোমার হাতেই পাওনা ছিল ! ছিঃ !

কামিনী শিউরে ওঠে ! এ কী কথা—আত্মকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে যায় : এ কি বলছেন আপনি ! মা, আমি আমি—কথাটা শেষ করতে পারেনা ।

: ঠিকই বলছি বোমা। বলবারও আর কিছু নেই তোমার—
বুঝবারও বাকি নেই কিছু আমার। কিন্তু এ নিয়ে আর একটি কথা নয়।
দ্বিতীয়বার যেন এ দৃশ্য আমাকে না দেখতে হয়। ক্রতপদে বিন্দুবাসিনী ফিরে
যান বাড়ির দিকে।

স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে কামিনী। যুগ্ময়ী মূর্তি। কিসের থেকে কি
হ'য়ে গেল—যেন বুঝতেই পারেনা।

কথা হচ্ছিল নিতাই কবিরাজের ডাক্তারখানায়।

যোগেন নায়েক বলে : যে যাই বলুক ঠাকুর্দা, আমার মত আর একবার
চেষ্টা ক'রে দেখা।

ঠাকুর্দা অর্থাৎ বৃদ্ধ নিতাই কবিরাজ জবাব দেন না। হাঁটু পর্যন্ত কাপড়
তুলে টুলের উপর উবু হ'য়ে বসে নিমীলিত লোচনে বিড়ি টেনে চলেন।
জবাব দেয় প্রমোদ পাল। বলে : কি ভাবে চেষ্টা করতে চাও তুমি ?

: সেই সনাতন পদ্ধতিতে। চল সবাই মিলে গিয়ে দরবার করি ডি. এম.
এর সাথে। হয় কাজ দাও, নয় ডোল দাও—নয় ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে
দাঁড় করিয়ে শেষ ক'রে দাও আমাদের। তোমরাও বাঁচ, আমরাও বাঁচি।

ভূষণ বলে : এ গান তো গাওয়া হ'য়ে গেছে বাবা। বারবার একটি
কেতন কি ভালো লাগবে ওঁদের ?

: তা ছাড়া আর কি করা যায় বল' ? আমরা কি সখ ক'রে এককথা
বারবার বলি ? সেবার বলেছিলাম, ওঁরা কায়দা ক'রে ফিরিয়ে দিলেন
আমাদের। মনে ভাবলাম—বুঝি ব্যবস্থা হয়ে গেল। ফিরে এসে দেখি যে
তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেছি। তাই আবার একই সুরে গাওনা
শুরু করতে চাইছি।

বিড়িটাতে একটা অস্তিম টান দিয়ে সেটা বাইরে ফেলে দেন ঠাকুর্দা।
গুছিয়ে বসে বলেন : ব্যাপারটা তলিয়ে দেখ যোগেন। সেবার আমরা সবাই
এক রা কেটেছিলাম। বুড়ো বাচ্ছা মায় ঘরের বউ পর্যন্ত গলা মিলিয়ে হেঁকে

ছিল কাজ দাও ব'লে। এবার আমাদের দল ভেঙে গেছে! সেবার যারা আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবার তারাই দাঁড়িয়েছে আমাদের বাধা হ'য়ে। কলোনীরই লোক তারা এবং বেশ কমতালশালীই। তারা আমাদের বিপক্ষে যাবে।

প্রমোদ বলে : ভিভাইড এ্যাও রুল! সত্যিই এবার আমরা কিছুতেই এক হ'তে পারব না।

ঠাকুরদা বলেন : আর তাছাড়া মনে ক'রে দেখ সেবারকার কষ্টটা। এবার অনেকেই যা হ'ক ক'রে খাচ্ছে। তারা কেন সে কষ্ট সহ করতে যাবে? কষ্টটাও তো কম নয়? বলি সেবারকার কথা ভুলে গেলে নাকি সব? কি হে যোগেন মনে পড়ে? ভ্রমণ?

লোকগুলি জবাব দেয় না। দেবার প্রয়োজনও বোধ করে না। সেদিনের স্মৃতি কি ভুলবার? না কি মুখে স্বীকার না করলেই মুছে যাবে সেদিনের স্মৃতি মন থেকে।

বছর পাঁচেক আগেকার কথা।

কলোনীতে তখন নতুন এসে বসেছে উদ্বাস্তরা। পার্মানেন্ট লায়াবেলিটি ক্যাম্পের নরকবাস যখন অসহ্য হয়ে উঠেছিল তখন এই লোকগুলো স্বপ্ন দেখতো পুনর্বাসনের। পার্মানেন্ট লায়াবেলিটি ক্যাম্প এদের ছিল না। কোন মানবিক সংজ্ঞা। সেখানে তাদের আশ্রয় দেওয়া হ'য়েছিল মিলিটারীদের তৈরী বড় বড় গুদাম ঘরে। সেখানে থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল এরা। সেখানে ওদের না ছিল কোন সামাজিক বন্ধন, না মানবিক মর্যাদা। শেয়ালদ' হাওড়া স্টেশনের জনপ্রবাহের মধ্যে মাদুরটিকে উচু ক'রে ধরে ছেলে কোলে ব'সে থাকতো ওরা। কখনও রাত কাটতো গাছের তলায়, কখনও দেড় হাত উচু তাঁবুর মধ্যে। লরী বোঝাই ক'রে হয়তো নিয়ে গিয়ে ভুলতো কোনও পি. এল ক্যাম্পে। গোলাকৃতি লাহোর সেডের অন্ধকূপে আশ্রয় পেত নতুন ক'রে। সেখানে ওদের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো। মাথার উপর একখানা নিজস্ব চালার জন্ত লোকগুলো উন্মুখ হ'য়ে উঠেছিল। 'যাবৎ

জীবেং ডোল ডকেং' এই অপূৰ্ণ ব্যবস্থাটা সকলে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। যারা ওটা মেনে নিতে পারলো তারা মানবজীবনের চরম মোক্ষলাভ করলো সন্দেহ নেই। তারা হ'য়ে উঠলো হুঃখে অমুদ্বিগ্নমন, স্নঃখে বিগতস্পৃহ। যাকে ব'লে একেবারে স্থিতপ্রজ্ঞ। রোজগারের ধান্দা নেই, ভবিষ্যতের চিন্তা নেই, সপ্তাহান্তে ডোলটি নিয়ে এসে বাকি সময় ভগবান অথবা সরকারকে গাল পাড়া। দীর্ঘ পাঁচ সাত বছর যারা এ স্বর্গে বাস করেছে তাদের ইহকাল তো বটেই পরকালটিও বোধকরি ঝরঝরে হ'য়ে গেল।

কিন্তু ব্যবস্থাটা সকলে মেনে নিতে পারেনা। অনেকে বিদ্রোহ করে। তারা চায় পুনর্বাসন। মানুষের মতো বাঁচতে। তারা যখন শুনলো যে সরকার পাঁচ কাঠা ক'রে জমি দেবে, বাড়ি করবার জন্ম ঋণ দেবে—তখন যেন ওরা হাতে স্বর্গ পেল। মনে হ'ল জীবনের এই একমাত্র কাম্য। পায়ের নীচে এক মুঠো নিজস্ব জমি,—যেখানে লাউ কুমড়া-শাক-আলু-বিলাতি বেগুন লাগাতে পারবে। মাথার উপর একটা নিজস্ব ছাদ—যেটাকে 'আমার বাড়ি' ব'লে পরিচয় দেওয়া যাবে। লোকগুলো ছুটে এলো পুনর্বাসতির লোভে। বাড়ি তৈরী করার প্রথম ইন্সটলমেন্ট-ঋণ এলো। কিছুটা খরচ হ'ল অবুঝ পোড়া পেটের চাহিদা মেটাতে—কিছু সত্যিই বাড়ি তৈরী করতে। এমনি ভাবে ক্রমে ক্রমে ওদের প্রায় সকলেই মাথা গোঁজার একটা ক'রে আশ্রয় খাড়া করল। এতদিনে সত্যিই তাহ'লে হ'ল বাড়ি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওরা।

এবার দেখা দিল আসল সমস্যা! দশ-পনের-হাজার লোক এসে বসেছে একটা বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝখানে। মাঠ হয়েছে জনপদ—উদয় নগর উদ্ভাস্ত কলোনী! কিন্তু রোজগার কই? খাবো কি? বাজারে দোকান দিল কেউ—কিন্তু কিনবে কে? ক্রেতা কই? জংসনের মহাজনের কাছ থেকে ভাড়া খাটবে বলে সাইকেল রিক্সা নিয়ে এলো কেউ—কিন্তু চড়বে কে? সকলেই বলে কাজ দাও; কাজ নাও বলবার মতো উদ্বুদ্ধ পরমা নেই কারও হাতে।

ব'সে খেলে কুবেরেরও ধন ফুরায়। গৃহ-নির্মাণ ঋণের উদ্ভব অর্থ আর কতটুকু? প্রথমে আবেদন নিবেদন। কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে লাগলেন। পরিকল্পনা করতে সময় লাগবে। 'পরিসংখ্যান' সংগ্রহ করতেই বছর ঘুরে যায়! কিন্তু অভাব, অসুখ আর মৃত্যু তো সময়ের জল বসে থাকবেনা। মৃত্যু প্রবেশ করল কলোনীতে।

এ ওর মুখের দিকে তাকায়। খাবো কি? রোজগার কই? ধীরে ধীরে গড়া বাড়ি খুলে ফেললে—তিলে তিলে বিক্রয় হয়ে গেল সব। জানালা দরজা-করোগেটটিন-সিমেণ্টেরবোরা-ইট। কর্তৃপক্ষের দাক্ষিণ্যে কতক ফিরে গেল পি এল ক্যাম্পের ভূস্বর্গে। যারা রইল তারা মুখোমুখী দাঁড়ালো অনশন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে। প্রথমে অসুখ। এ বাড়ি ও বাড়ি লোকে জরে পড়লো। ঘুমলে কিছুদিন কেউ বা—তারপর সরে গেল ছুনিয়া থেকে। কাদলে পরিজনবর্গ অল্পের একজন ভাগীদার কমে যাওয়ার সৌভাগ্য সঙ্গেও! কর্তৃপক্ষ বিচলিত হ'লেন। এত অসুখ বিস্ময় হ'চ্ছে কেন? দ্রুতগতিতে এসে পৌঁছালো এক মোবাইল মেডিক্যাল যুনিট।

অমুখ দেবে কি? এদের একমাত্র অসুখ অনাহার। পথ্য চাই। ডাক্তার ছিলেন একটু ছিট গ্রন্থ মানুষ। সিভিল সার্জেন জানতে চাইলেন কি কি অমুখ চাই তার ফর্দ। ডাক্তার জবাব দিলে—সপ্তাহে এক ওয়াগন চাল!

বদলি হয়ে গেল পাগলা ডাক্তার!

সরকারি পরিকল্পনার আগেই মহাকালের স্বীম রূপায়িত হল একের পর এক। এল অভাব, অসুখ, মৃত্যু, মহামারী! গ্রহণের পূর্বে ধূসর বর্ণের ছায়াপাতে যেমন করে ম্লান হ'য়ে যায় চন্দ্রহাস তেমনি করেই লোকগুলোর নতুন-বসতি-পাওয়া আনন্দ পূর্ণিমার উপর প্রথমেই হল অনাহার মৃত্যুর করাল ছায়াপাত। আকাশের বুক থেকে তীক্ষ্ণ চীৎকারে নেমে আসে শকুনের দল। হাতি পৌতার বিল কলোনীর দিকে হাত বাড়ায়। কলোনীর কাছে পিঠে নদী নেই। ওটাই শ্মশান!

যে ভগবানের কথা মনে হ'ত দেশে থাকতে দাক্তার সময় মধ্যরাত্রে অদূর

আকাশ রক্তাভ হয়ে উঠতে দেখলে—যে ভগবানের কথা মনে পড়েছিল পার্টিমানের পর দেশ ছেড়ে রওনা দেবার সময়, যে ভগবানের নাম মনে পড়েছিল শেয়ালদা স্টেশনে অনাহার মৃত্যুতে মুখোমুখী দেখে—তার কথাই উঠে পড়ে আবার !

: ভগমান ! আর কত দূরে তুমি ?

: নাই, নাই ! ভগমান নাই ! থাহক্লেও তুমি কানা—তুমি বোবা !

: ছিঃ ! ও কথা কওন নাই বাবা । ভগমান দীনের দয়াল !

: কওন নাই ? ক্যান কওন নাই ? হাজারবার কইবাম । বারো বিঘা নাবি ধানের জমি আছিল । দু জোড়া গাই ! আমার খাওনের অভাব । তোমাগো দীনের দয়াল ক্যান আমার এ দশা করল কও ? কি অপরাধ করছিলাম আমি ?

ও পক্ষ নির্বাক । সেই শাস্ত চক্রাবর্তন । সুখের দিনে মনে পড়েনা তাঁকে, মনে পড়ে দুঃখরাত্রে । আর দুর্দশা যখন চরম সীমায় এসে মর্মের মাঝখানে বসিয়ে দেয় তীক্ষ্ণশলাকা তখন জেগে ওঠে মনের কালাপাহাড় ! ‘থাহক্লেও তুমি কানা তুমি বোবা’ ।

অসহায় মানুষগুলো জোট বাঁধলো । কাজ চাই । অন্ন চাই ! সার বেঁধে ওরা চলল সদরে । যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কিশোর-কিশোরী । সন্তান-বন্ধা সন্তানজননী—মৃতবৎসা নারী । ছেলা সমাহর্তার বাড়ি ঘেরাও করল ওরা ।

: কি চাই ?

: কি চাই ! চাই অন্ন-বস্ত্র-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সংসার-সদ্বর্ষ-আনন্দ । চাই মানুষের মত বাঁচতে । আপাতত চাই কাজ । শ্রমের বিনিময়ে গ্রাসাচ্ছাদন ।

একসঙ্গে সবাই চিৎকার করলে কাজ হয় না । দলপতিহীন জনতা ভাড়াভাড়ি বেছে নিয়ে পাঠালো পাঁচজনকে ওদের প্রতিনিধি ক’রে । যারা বেশ চালাক-চতুর—দু কথা গুছিয়ে বলতে জানে । গোকুল দাশ, বিটুপদ, নবীন পতিতত্তি—আরও দুজনকে । দীর্ঘ আলোচনা হল । দুদিন, তিন দিন ।

জনতা বাইরের বাগানে পথের পাশে অপেক্ষা করতে থাকে। সহরের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ দিলে দুধ, কেউ জল। স্কুল কলেজের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মুষ্টি ভিক্ষা তুলে এনে দিলে। তিন দিন ওরা পড়ে রইল জেলা শাসকের বাড়ির আশে পাশে। সেখানেই একজনের মৃত্যু হল। সে মৃত্যু মহান। একই কারণে কলোনীতে যারা মরেছে তাদের সঙ্গে সে মৃত্যু যন্ত্রণার বোধকরি কোনও তফাৎ ছিল না, কিন্তু মৃত্যু দৃশ্যের তফাৎ ছিল। স্থান মাহাত্ম্যে মৃত ব্যক্তি শহীদ হয়ে গেল। জেলা শাসকের ফটকের কাছেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল ভাগ্যবানটি। কেউ বলে অনাহার-জনিত মৃত্যু—কেউ বলে উদরাময়। খবরের কাগজের রিপোর্টারেরা এসে ফটো তুলে নিয়ে গেল। কাগজে বার হল বিস্তারিত বিবরণ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতা এই মৃত্যু সংবাদে ছুটে এলেন। যেন এটি হচ্ছিল না ব'লেই এতক্ষণ আনরে নামতে পারছিলেন না তাঁরা। ধর্মঘট পরিচালনাব দায়িত্ব তাঁরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে চাইলেন। এসে পৌঁছালো কয়েকটি পতাকা আর মাইক। ওরা বলে : এ্যাডিন আছিলেন কই ? র'ণ মশয় র'ণ। আমাগো বিচার আমরাই কবমু।

এঁরা বলেন : তবে মর বেটারা।

অভিশম্পাত সঙ্গেও কিন্তু মরল না আর কেউ।

তিনদিন পরে পঞ্চায়েত জানালেন ওদের দাবী সরকার মেনে নিয়েছেন। অবিলম্বে শুরু হবে টেস্ট রিলিফের কাজ। যারা অশক্ত পক্ষ তাদের ফ্রি স্টারভেশন ভোল দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে।

ওরা বলে : রও রও, ব্যাপারটা বুঝা লই।

এরা বলে : আরে ব্যাপার তো সবই বুঝাইবাম। অখন খাওনের বন্দোবস্ত হৈছে থায়্যা লও !

এরপর আর কথা চলে না। লপ্সি প্রস্তুত। চাল ডাল মিশ্রিত খিচুরী। সারি সারি ওরা বসে যায়। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ। ধর্মঘট প্রত্যাহারের সর্বগুলির আলোচনা আপাতত স্থগিত থাকে। অনাহারক্লিষ্ট ককালগুলোর

অনেকেই পরিমাণের অতিরিক্ত আহার ক'রে অস্থস্থ হ'য়ে পড়ে। ওরা ফিরে আসে।

শুরু হয় টেস্ট-রিলিফের কাজ। মাটি কাটার কাজ। পাঁচটি ব্লকে বিভক্ত করা হ'ল কলোনীকে। এ, বি, সি, ডি, ই। পাঁচজন সেক্রেটারি তার। ওরাই যাদের মনোনয়ন করে পাঠিয়েছিল তারাই। সেই গোকুল বিষ্ট্র নবীন!

ব্লক সেক্রেটারির কাছে দরখাস্ত কর—তিনি রেকমেণ্ড করলে পেতেও পার স্টারভেশন ডোল। ট্রাকে ক'রে বড় বড় ড্রাম এসে পৌঁছালো—গুঁড়ো দুধ ভর্তি তাতে। পীমবোর্ডের গোলাকৃতি আধার। তার গারে লেখা আমেরিকার দেশবাসীর। এগুলি উপহার দিচ্ছে ভারতবাসীকে। সে উপহারও কিঞ্চিৎ লাভ করতে পার যদি ব্লক সেক্রেটারির। অস্থগ্রহ করেন। র্যাশানের চাল, ধুতি শাড়ি বিতরণ করা হয় এই সেক্রেটারিদের মাধ্যমেই। কিছু লোক কাজ পায়; কিছু পায় ডোল ফ্রি র্যাশান। গোকুলদাস পায় কয়লার ডিপো খোলার অস্থমতি—বিষ্ট্র জয়হিন্দ কেবিন মাথা তোলে—নবীন পতিতুস্তি মহাজনী ব্যবসা শুরু করেন। এঁরা মূলধন কোথায় পেলেন সে প্রশ্নটা করবার সাহস হলনা কারও।

সেদিনের স্মৃতি কি ভুলবার? নাকি মুখে স্বীকার না করলেই সেদিনের স্মৃতি মুছে যাবে মন থেকে? লোকগুলো নীরবে বসে থাকে।

নিতাই কবিরাজ তাই আবার বলেন : তাই ব'লছিলাম প্রমোদ, দল বেঁধে যদি দরবার করতে যেতে চাও তবে কী তোমাদের দাবী তা স্পষ্ট করে জানাতে হবে।

: দাবী আর কি? দাবী কাজ। টেস্ট-রিলিফের কাজ তো আজ দু বছর বন্ধ। তা ছাড়া আমরা চাই একটা স্থায়ী ব্যবস্থা। আমরা চেষ্টামেচি করব আর ওঁরা দু এক মাসের টেস্ট-রিলিফ করবেন তা চলবে না।

: বুঝলাম। তা স্থায়ী ব্যবস্থাটা কি রকম হ'বে?

: সেটা আমরা কেন বলব? সরকার বলবে। আমাদের এখানে একটা কারখানা হ'তে পারে। কাপড়ের মিল, চিনির কল, কাগজের

করিখানা। কি সম্ভবপর তা সরকারি বিশেষজ্ঞেরা বলুক। তাতেই তিন চার হাজার লোক কাজ পেতে পারে। তাছাড়া ধরুন ঠাকুরদা, আমাদের মধ্যে ছুতোর আছে—কামার আছে—তাঁতি আছে; তাদের দিয়ে একটা কোয়াপারেটিভ হ'তে পারে। আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিক—মজুরী দিক।

ঠাকুরদা হাসেন : কিছু মনে করিসনা ভূষণ, কিন্তু কোয়াপারেটিভের সেক্রেটারি করবি কাকে? টাকাটা কাকে নাড়াচাড়া করতে দিবি?

আপনিই বিবেচনা ক'রে বলুন। যাকে সবাই মিলে বিশ্বাস ক'রে দেবে তাকেই। আপনি ভার নিতে চান আপনাকেই দেব। তবে তহবিল তছরূপ হ'লে আমরা থানা পুলিশ করতে পারবনা। স্নেফ মাথা ফাটিয়ে হাতি পোতার পুঁতে দিয়ে আসব। হাতি পোতা কলোনীর অদূরবর্তী জলাটা। সেইটাই কলোনীর শ্মশান।

: কিন্তু তাদের হ'য়ে সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবে কে? সবাই একবাক্যে বলে : তুমি ঠাকুরদা, তুমি।

নিতাই কবিরাজ আর একটা বিড়ি ধরান : কোন অধিকারে? আমি তো কলোনী পঞ্চায়েতের কেউ নই?

ওরা আবার বলে : আমরা তোমাকে নির্বাচিত করলাম কলোনীর পক্ষ থেকে। পঞ্চায়েতকে আমরা মানিনা।

ঠাকুরদা আবার একই প্রশ্ন করেন : কোন অধিকারে?

ওরা মুখ চাওয়া চাওয়া করে। ঠাকুরদা বুঝিয়ে বলেন : বাপুহে, গোটা কলোনীর দশ-পনের হাজার লোকের পক্ষ থেকে আমাকে নির্বাচন করার অধিকারটা তোমরা পেলে কোথা থেকে?

ভূষণ রায় অত ঘোরপ্যাচ ভালবাসেনা। বলে : ওসব বুঝিনা ঠাকুরদা। তাহলে তুমি বল কি করতে হ'বে?

: আমি বলি এরকম হঠাৎ কিছু করাটা ঠিক নয়। কথাবার্তা যে বলতে যাবে সে একজন সর্ববাদিসম্মত নেতা হওয়া চাই। সরকারকে বুঝিয়ে দিতে

হ'বে যে, যে পাঁচজনকে নিয়ে পঞ্চায়েত গড়া হ'য়েছে তাদের উপর আমাদের আস্থা নেই।

: আমরাও তো তাই বলছি—তুমি গিয়ে বুঝিয়ে বল'।

: না! আমাকে যদি সবাই পাঠায় তবেই আমি যাবো। তোমাদের কথা নয়। তোমরা বরং প্রত্যেক ব্লকে গিয়ে ব'লে এস। একটা নির্দিষ্ট দিনে সবাই জমায়েত হ'ক। সেখানে ওদের পাঁচজনকেও নিমন্ত্রণ করব আমরা। আমাদের অভাব অভিযোগ আমরা পেশ করব। ওরা পাঁচজন ইচ্ছা করলে জবাবদিহি করতে পারে। সে সুযোগ দেব আমরা। তারপর সেই সভাতেই আমরা তিনজনকে মনোনীত করব। তারা তিনজন কর্তৃপক্ষকে গিয়ে জানাবে আমাদের অভাব অভিযোগ। তাহলে আর কারও আপত্তি হ'তে পারে না।

ভূষণ উৎসাহে ঠাকুরদার পায়ের ধুলোই নিয়ে ফেলে, বলে : তবে শুভ্র শীত্ৰং ঠাকুর্দা। আজ বিকালেই সভা হ'ক।

: না আজ বিষ্-দ্-বার, তার অমাবশ্যা। আজ নয়। রবিবারে, রবিবার বিকাল পাঁচটায়—খেলার মাঠে।

ওরা তাতেই রাজি।

মনে মনে হাসে ভূষণ। ই-ব্লকের ভূষণ রায়। ঠাকুর্দাকে ওরা সবাই মেনে চলে। আর ঠাকুর্দা মেনে চলেন পাঞ্জির আদেশ, হাচি টিক্‌টিকির নির্দেশ! বিংশশতাব্দীর জননেতা হবার সমস্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঠাকুর্দা রয়ে গেছেন উনবিংশ শতাব্দীর মনোবৃত্তি নিয়ে। ছেলেবেলা থেকেই ছেলে ছেলে কেটেছে। গঠনমূলক কাজে ছিলেন চিরকালই। নহা-নানান একান্ত উক্ত ছিলেন তিনি। হাটু পর্যন্ত কাপড়, একমাথা রুম্ম চুল—গারে একটা এণ্ডির চাদর, চোখে নিকেলের চশমা। স্কুলে পড়বার সুযোগ পান নি। তবে দীর্ঘদিন রাজবন্দী থাকা অবস্থায় সহবন্দীদের সাহচর্যে পড়াশুনাটা করতে পেরেছিলেন। রাজনীতি-সমাজনীতি সবকিছু পড়াশুনা করলে কি হ'বে—পৈত্রিক কবিরাজীতেই তাঁর বিশ্বাস বেশী—এ্যালোপ্যাথির চেয়ে। দশহাজার লোকের

নেতৃত্ব দেবার আহ্বান এসে পৌঁছেছে যার কাছে তিনি বিচার করতে বসেছেন
 তিথি আর বার ! তবু ভূষণ ঠেকেই নেতা বলে মেনে নেয়। মেনে নেয়
 প্রমোদ, কানাই, যোগেন। ওরা জানে,—পারলে এই হাঁচি টিকটিকি-অগ্নেবা-মধা
 বিজড়িত ঠাকুর্দাই পারবে এই দশ পনের হাজার লোককে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে।
 লোকটাকে সবাই বিশ্বাস করে, ভালবাসে। আর যাই হ'ক মানুষটা খাঁটি।
 একেবারে নির্ভেজাল খাঁটি। রাজনীতির মধ্যে এমন খাঁটি মানুষ দিয়ে
 কারবার চালান মুশকিল। পাকা সোনা দিয়ে যেমন গহনা গড়ানো চলে না
 —একটু খাদ মেশাতেই হয়—আত্মস্তু খাঁটি মানুষ দিয়েও তেমনি রাজনীতি
 চলে না। একটু শঠতার খাদ না মেশালে প্রতিপক্ষকে বাগে আনা যায় না—
 ভূষণ এটা বিশ্বাস করে। কিন্তু এই দশ পনের হাজার লোকের নেতৃত্ব দেওয়ার
 মত ক্ষমতামালী একচ্ছত্র নেতাই বা কোথায় পাওয়া যায় ? ভূষণ, কানাই,
 যোগেন প্রভৃতি নব্যপন্থীরা তাই ঠাকুর্দার হাতেই ভুলে দিতে চায়—সে
 গুরু দায়িত্ব।

ভোরের আলো সবে ফুটে উঠছে। অন্ধকারের মধ্যে ভাল করে কিছু
 দেখা যায় না। অনিমেষ ঘুমাচ্ছে। ঘুমাচ্ছে গোরাও। সন্তর্পণে দ্বার খুলে
 বার হ'য়ে আসে কামিনী। পূর্ব আকাশটা একটু একটু করে ফস' হ'য়ে
 আসছে। হিম হিম একটা শিরশিরে হাওয়া বইছে। বারান্দার একটা
 কোণায় কোঁচার খুঁটে আপাদমস্তক ঢেকে মাছরের উপর ঘুমাচ্ছে বাবলু।
 কামিনী লঠনটা আলে। চলে যায় রান্নাঘরের দিকে। তাল খুলে ভিতরে
 ঢোকে। কুলুঙ্গির উপর থেকে একটা টিনের কোঁটা বার করে। সেটি বার
 করার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় কোন গোপন জিনিস। তারপর ধীরে ধীরে
 বেরিয়ে আসে। আবার কি মনে করে ফিরে যায়। একটা মুখ ঢাকা
 হাঁড়ির ভিতর থেকে বার করে গোটা চারেক মোয়া। আঁচলে নিয়ে
 বেরিয়ে আসে। শিকল ভুলে দেয় রান্নাঘরে। তারপর ঠেলে তোলেন
 বাবলুকে।

ঘুমের চোখে খড়মড়িয়ে উঠে বসে বাবলু : দিদিয়া উঠেছে ?

: না কেউ ওঠেনি। এই নে—টিনের বাস্‌টা দেয় ওর হাতে। বাবলু উঠে বসে।

: এগুলোও নিয়ে যা—মোরাগুলো দেয় ওর চাদরে ঢেলে। বলে : একটা সতেরোর লোকাল চলে গেলে খিড়কির দোরে আসিস্।

বাবলু হাসে। চুরি করার আনন্দে ছুটু ছেলেরা যেভাবে হাসে ! এ যেন একটা ভারি মজার খেলা ! ছুজনে যায় দরজার কাছ পর্যন্ত। খিড়কি খুলে বাবলু বেরিয়ে যায়। কামিনী ডাকে : শোন ! চলতি ঝুঁনে গুঠানামা করবি না কখনও। আমার মাথার দিবি দেওয়া আছে—মনে থাকে যেন। আর শোন, ফেরার পথে বিষ্টু দোকানীকে গোটা দুই টাকা দিয়ে আসিস্।

বাবলু ঘাড় নেড়ে সাব দেয়। রাস্তার টিউব-ওয়েলে গিয়ে মুখটা ধুয়ে নেয়। কামিনী ওর গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ পিছন থেকে কে ডাকে : বোদি।

: কে ? পিছন ফিরে কামিনী দেখে নমিতা উঠে এসেছে।

: কথা বলছিলে কার সঙ্গে ?

বাবলুর মুখ ধোওয়া শেষ হয় না। একছুটে অন্ধকারে মিশিয়ে যায়। কামিনী বলে : কই না তো ?

: কই না তো ! এই যে গোটা দুই টাকার কথা কি বলছিলে কাকে ! কামিনী ইতস্তত ক'রে বলে : তোমরা সবাই দেখি কান শুনতে ধান শোন !

: তা কানই হ'ক আর ধানই হ'ক, কথা বলছিলে তো ? কার সঙ্গে ? কামিনী ওর কোড়ুল দেখে কোড়ুক বোধ করে। বলে : ভুতের সঙ্গে !

গম্ভীর হয়ে যায় নমিতা।

অচল সংসারটিকে কোন রকমে চালিয়ে নেওয়ার জন্যই এই প্রচেষ্টা কামিনীর। সংসারের প্রত্যেকটি লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে গম্ভীর স্বাবে সে চিড়ে ভাজে। চীনাবাদাম মটরভাজা মিশিয়ে পাতলা টিন্-পেপারে মুড়ে রেখে

দেয়। সকালবেলা বাবলু সেগুলি নিয়ে বেরিয়ে যায়। লোকাল ট্রেনের
কামরার কামরার ফেরি করে : উদয়নগরের স্পেশাল-ব্র্যাও সারে-চার-ডাঙ্গা।
টক-ঝাল-মিষ্টি-মিষ্টি। এক প্যাকেট এক আনা, তিনটে দু আনা।

কথাটা গোপন থাকে দেবর-বৌদির মধ্যেই। ওরা জানে এটা বাড়ির
কেউই অমুমোদন করবে না। কি করে করবে? বাবলু করবে চানচুর
ফেরি? ওর লেখাপড়া হবে না? অসম্ভব। সকালবেলা বাবলু রওনা হয়ে
যায়। কামিনী সংসারের কাজে ডুবে যায়। ওর মনটা পিষতে থাকে
লোকাল ট্রেনের চাকার। কর্মব্যস্ত ঘণ্টাগুলোর মধ্যে অবসর পেলেই মনে
মনে বলে : ঠাকুর! তুমি ওকে দেখ! ঐটুকু ছেলে! বিপদ আপদে তুমিই
রক্ষা ক'র ঠাকুর।

বেলা বাড়তে থাকে।

বাবলু ওদিকে পৌছে যায় তার কর্মস্থলে। ডেলি-প্যাসেঞ্জার ভর্তি
লোকাল ট্রেনের কামরা। কাঁধে কোলানো ব্যাগ থেকে টিসু-পেপারে মোড়া
কয়েকটি প্যাকেট হাতে নিয়ে আর অন্য হাতে জানালার গরাদ ধরে ধরে
বাবলু চলন্ত কামরার বাইরে দিয়ে এঘর ওঘর করে।

: উদয়নগরের স্পেশাল-ব্র্যাও সাড়ে-চার-ডাঙ্গা। টক-ঝাল-মিষ্টি-মিষ্টি।
বাবলুর এ ব্যবসাও নিরঙ্কুশ নয়। ছরস্তু প্রতিযোগিতা চলে এ ব্যবসায়ে।
আরও চার পাঁচ জন হকার ফেরি করে। রোজই তারা বিক্রি করে এই
ট্রেনগুলিতে। ওরা বরদাস্ত করতে চায় না এই নবাগত নাবালকটিকে। এরা
জানে ডেলি প্যাসেঞ্জারের একটা ক্ষুদ্রতম অংশই কেনে খুচরা পয়সার সওয়া
চলন্ত ট্রেনের কামরায়। তার জন্তে নতুন ভাগিদার ওরা কিছুতেই মেনে
নেবে না।

লোকগুলো কি নিবিকার! ঝাড়া আধঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিলেও ওদের
মনটা জব হয় না। নেড়াদা বকতে থাকে

: আপনার মাথা ঝিমঝিম করছে। মনে হচ্ছে কে যেন রগের দুটো
পাশ চেপে ধরে আছে। অথবা পেটের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। কিম্বা

শরীরের কোন অংশে এমন বেদনা হ'চ্ছে যে আশ্বত্থ্য করার ইচ্ছা আগছে আপনার মনে—এ অবস্থায় আপনি একটি বড়ি জল দিয়ে খেয়ে ফেলুন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব শান্ত হ'য়ে যাবে।

লোকগুলো নির্বিকার ভাবে বসে থাকে। নেড়া থামতেই বাব্লু শুরু করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওর মাথায় এক প্রচণ্ড টাটি মেরে বসে আর একজন হকার। মর্টনের লজেন্স ফিরি করছিল সে। হেঁকে ওঠে : বিখ্যাত মর্টন কোম্পানীর আনারসের লজেন্স !

বাব্লু মার খেয়ে হুজুম করতে চায় না। প্রতিবাদ করে। সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে ওঠে ওপাশ থেকে আরও দুজন হকার। মশলামুড়ি আর হাতকাটা তেল। বাব্লু জানে ওরা সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেছে তার বিরুদ্ধে। তাই যে কামরায় সে ওঠে সেখানেই ভীড় করে ওঠে ওরা কজন। প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাড়াবার মতলব। কত মতলবই আছে ওদের ! বাব্লুর তো জানতে বাকি নেই কিছু। দুই হকারে মিথ্যা ঝগড়া করে। নিলামের ডাকের মতো ডাকাডাকি করে কমিয়ে দেয় জিনিসের দর। যেন ঝাঁকের মাথায় ভুলে খুব কম দর হেঁকে বসেছে। দু'টাকার জিনিস ছয় আনার বিক্রি হতে দেখলে গ্রাম্য প্যাসেঞ্জার লোভে পড়ে কিনে ফেলে সে মাল। বাব্লু নেমে যায় পরের স্টেশনে। ওঠে গিয়ে পাশের কামরাটায়। হাতকাটা-তেল কি একটা ইঙ্গিত করে মশলা-মুড়িকে। মশলা-মুড়িরও বয়স অল্প। বাব্লুর চেয়ে বছর চারেক বড় হ'বে। কলোনীরই ছেলে। ওরা হাসে দুজনে। তারাও নামে সেই স্টেশনে। ওঠে গিয়ে পাশের কামরায়। বাব্লু সেখানে সবে ইকতে শুরু করেছিল। থামিয়ে দেয় মর্টন লজেন্স।

বাব্লু বলে : বারে ! আমি যে কামরায় যাবো—তোমরাও সেখানে উঠবে।

: চুপ্ বে ! বেশী চেঁচালে দেবো ঠেলে লাইনের তলায়। সত্যিই ছোট-খাট একটা খাকা দেয় সে। বাব্লুর হাত থেকে পড়ে যায় মোয়া কটা।

একজন বৃদ্ধ যাত্রী বাব্লুকে সমর্থন করে বলেন : তা বাপু তোমরা

ওকে এরকম কেন কর বলত ? আমি তো রোজই এই লোকালে ক'লকাতা যাই, আর পাঁচটা পঞ্চাশে ফিরি—রোজই দেখি ছেলোটিকে তোমরা উত্যক্ত কর ।

মর্টন লন্ডেন বলে : ওর লাইসেন্স নেই স্তার । টিকিটও নেই । ঐ দেখুন রেল কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিয়েছে বিনা টিকিটে ভ্রমণ বন্ধ করুন !

বৃদ্ধ ডেলি প্যাসেঞ্জার বলেন : তোমার লাইসেন্স আছে ?

: আলবৎ !

: কই দেখি ?

: এই দেখুন স্তার ! এ আবার কি রসিকতা । বল্লাম লাইসেন্স আছে ; তা নয় কই দেখি ! এ রকম তো নিয়ম নয় স্তার । আপনি তো রোজই এই ট্রেনে 'শালদ' যান আর পাঁচটা পঞ্চাশে ফেরেন । গেটে রোজই দেখি বৃদ্ধ পকেটে হাত চেপে ধরে বলেন মাছলি । গেট-কীপার কোনদিন বলে কি—কই দেখি ?

ভদ্রলোক পাশের সহযাত্রীকে বলেন—কথায় এদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠবেন না মশাই !

বাবলু বিষন্ন মুখে নেমে যায় ।

গাড়ী থেমেছে পরের স্টেশনে ।

এদিকেও বেলা বাড়তে থাকে । নমিতা রান্নাঘরের কাজ ক'রে চলে । মুখ তার গম্ভীর । কামিনী গোরাকে তেল মাখাচ্ছে । নাচতে নাচতে ঢুকলো লতু । হাতে তার একখানা চিঠি । নমিতা ডাকে : লতু এদিকে আস কোথায় বেরিয়েছিলি সাত সকালে ?

: বা রে ! আমি তো এখানেই ছিলাম !

: এখানেই ছিলি ! তখন থেকে যে ডাকছি—মশলাটা বেটে দিতে ।

: ও লড়া বাপু আমি বাটতে পারি না । বড় হাত জালা করে ।

কামিনী বলে : আমি দিচ্ছি ঠাকুরকি ।

: না থাক। আমিই ক'রে নিচ্ছি।

নমিতা সরিয়ে দেয় কামিনীকে। ওকে যেন সহ করতে পারছে না সে।
কামিনী মৃদু আপত্তি জানায়: থাক কেন ঠাকুরকি? দিচ্ছি বেটে আমি—

: আর জালিও না বোদি। ছেলেকে তোয়াজ করছ তাই কর।
আমারই হয়েছে যত খোয়াড়। সকাল থেকে পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন,
জিজ্ঞাসা করলাম—তো বলে এখানেই ছিলাম। সবই ভুতুড়ে কাণ্ড। সবাই
ভুতের সঙ্গে কথা বলে এ বাড়িতে।

কামিনী আর কিছু বলে না।

লতু কাছে এসে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে: দিদি?

নমিতা বিরক্ত হ'য়ে বলে: আ: কি হ'চ্ছে?

: তুই কাকে চিঠি লিখেছিলি রে?

: কী?

: কাকে তুই চিঠি লিখেছিলি রে দিদি?

: চিঠি লিখেছিলাম? কাকে? কই না তো?

: কই না তো? আমি যে দেখলাম—চোখে চলমা, দোহারা চেহারা,
মাথায় কোঁকড়ানো চুল—তুই তাকে চিঠি লিখছিলি?

নমিতা রেগে ওঠে—কি বক্ছিস্ পাগলের মত? নভেল পড়ে পড়ে কি
তোর মাথা একেবারে খাওয়া হ'য়ে গেছে? শুধু পাড়ায় পাড়ায় বকাটে মেরেদের
সঙ্গে মিশে—

: বেশ কাউকে লিখিস নি তো? এটা তবে কি? কে জবাব দিল?
লতু একখানা বন্ধ খাম বার ক'রে দেখায়। পড়ে: শ্রীনমিতা চক্রবর্তী, C/o,
শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী, প্লট ১১০৭, ডি-ব্লক, উদয় নগর!

নমিতা উঠে আসে বিস্মিত হ'য়ে। লতু লুকিয়ে ফেলে চিঠিখানা।

: তুমি ভুবে ভুবে জল খাও ব'লে—মনে ভাবো আমরা কিছুই বুঝি না?

নমিতা এক ধমক দিয়ে চিঠিখানা ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়। কামিনীও
কোঁতুহলী হ'য়ে বনিয়ে আসে। নমিতা সকলের সামনেই খোলে চিঠিখানা।

ইংরাজি টাইপ করা চিঠি। মনে মনে পড়ে যায়। মুখখান্না উজ্জল হ'য়ে ওঠে ওর।

কামিনী প্রশ্ন না ক'রে পারে না : কার চিঠি ঠাকুরঝি ?

নমিতা চলতে শুরু করেছিল। হঠাৎ থুঁরে বলে : ভুঁতের চিঠি নয় বোদি !

কামিনী ঘরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। নমিতা এসে পৌছায় অনিমেঘের কাছে। রোগজীর্ণ অনিমেমেঘের মাথার কাছে বসে বৃদ্ধ হরিপদ ওর অরতপ্ত কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

নমিতা বলে : বাবা, স্কুল অথরিটি আমাকেই সিলেক্ট করেছে। অবিলম্বে জয়েন করতে বলেছে !

উজ্জল হ'য়ে ওঠে অন্ধের মুখ। যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করেন তিনি।

রাত দশটা বেজে গেছে। কোরোসিন সাত্রয়ের জন্তু সবাই সন্ধ্যারাত্রেই খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে নিয়ে দোরে খিল দেয়। কলোনী ঘুমাচ্ছে। দূরে দূরে এক আধটা বাতি জ্বলছে এখানে ওখানে। সন্ধ্যা থেকে বর্ষা নেমেছে। চারিদিকেই জমেছে কাদা। টেস্ট-রিলিফের কাজে রাস্তাগুলোয় শুধু মাটি ফেলাই হ'য়েছিল। জলনিকাশের কোনও ব্যবস্থা হয়নি। এক এক জায়গায় এক ইঁটু কাদা জমে যায় বর্ষাকালে। টিপ্ টিপ্ ক'রে ইন্সেপ্তি বৃষ্টি পড়ছেই। ব্যাঙ থেকে চলেছে একটানা। সভ্য জগতের সঙ্গে এদের সম্পর্ক শুধু রেলগাড়ীর যাতায়াত। স্টেশন কলোনী থেকে দূরে নয়। বস্তুত কলোনীর একান্ত দিগে রেল লাইনটা চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। নিয়মিত গাড়ী এসে দাঁড়ায়—স্টেশনের কল-কোলাহল ভেসে আসে কলোনীতে। ওরা টের পায় সভ্য জগতের সঙ্গে ওদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। ওদের দিনগুলো ঘণ্টার হিসাবে ভাগ করা নয়। ট্রেন-টাইমিংএ ভাগ করা। লোহ-শকটগুলোই ওদের বাড়ি। কেউ জিজ্ঞাসা করে না, কটা বেজেছে ? বলে, একটা সতেরো চলে গেছে ?

হ্যাঁচা বেড়ার রাস্তাঘরে বলে কামিনী একরাশ চিড়ে ভাজছিল। বাড়িসুদ্ধ

সবাই বুঝছে। বাড়ির একটা ছেলে যে এখনও করেনি সে বিষয়ে বেন কারও কোনও চিন্তা নেই। থাকবে কেন? নিয়মিত যে ছেলে সন্ধ্যা হ'তেই বাড়ি ফেরে—রাত হ'লে তার জন্তই ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক; আর যে ছেলের গৃহ প্রত্যাগমনের নিয়মিত সময়ই হ'চ্ছে মধ্যরাত্তর তার জন্ত ভেবে লাভ কি? হোক সে বালক! কামিনী কিন্তু নিশ্চিতই বুঝতে পারে না। দায়িত্বটা তারই। সেই ওকে পাঠায় এ ছুঁহুঁ কাজে। তাছাড়া এই সময়েই ও চানচুর ভেজে রাখে।

ঘরে কয়েকটা মাটির পাত্র। খুঁজলে এক আধখানা কলাইয়ের অথবা এ্যালুমিনিয়ামের তৈজসও মিলতে পারে। উনানের ও পাশে কাঠগুলো গাদা দিয়ে সাজানো। উনানের আগুনে যতটা শুকিয়ে যায়। কামিনীর মুখের একপাশ উনানের উত্তাপে রক্তাভ। ফেলে আসা জীবনের কথাই বৃষ্টি ভাবছে বসে ও। বধু হয়ে যখন সে প্রথম আসে চক্রবর্তীর উচ্ছল সংসারে তখন নব-বধূটির কী সমাদর! কি আনন্দের ছিল সেই দিনগুলো। লতু তখন ছেলেমানুষ। নমিতা কিন্তু ওর সমবয়সী। নববিবাহিতের গোপন-জীবন সম্বন্ধে তার কত কৌতূহল। নমিতার বিবাহও স্থির হ'য়েছিল। অনিমেষের বিয়ের সঙ্গে একসঙ্গেই হওয়ার কথা ছিল। বিয়ের তারিখের কিছুদিন আগে ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই অনিমেষের বিয়েটাই হ'ল সেবার। তারপর কিন্তু নমিতার বিয়ে দেওয়া ঘটে উঠল না। কত পাত্রপক্ষ এসে দেখে গেল। কতদূর অগ্রসর হয়েও ভেঙ্গে গেছে সম্বন্ধ। কামিনীর তারি ছুঁখ হ'ত। কেন হয় না নমিতার বিয়ে? লেখাপড়া জানা সন্দরী, সম্বংশজাত কুমারী কস্তা। কেন তার বিয়ে হচ্ছে না? তারপরেই হল বন্ধ-বিভাগ।

চলে এল ওরা এপারে। পি. এল. ক্যাম্পে থাকার সময় একবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন হরিপদ মাস্টার। তখন দৃষ্টিহীন হয়েছেন তিনি। ক্যাম্পেরই একটি ছেলে রাজি হয় নমিতাকে দেখে। ছেলেটির না ছিল রূপ না গুণ। বিড়ির দোকান ছিল তার একটা। গলায় একটা সিঁকের কুমাল বেঁধে কোথা থেকে-জোঁগাড়-করা মাতগাড়হীন উল্টো-হাতল একটা রেসিং সাইকেল চড়ে

চকড় দিয়ে বেড়াতো সারা ক্যাম্পটা। গান গাইত—আধুনিক হিন্দি সিনেমা-সঙ্গীত। ভ্রামণের ছেলে বলে মনেই হ'ত না। হরিপদ চুপ করে রইলেন। অনিমেষ নিয়ে এল পাত্রকে। নমিতাকে যাচাই করে নিল সে দেখতে এসে। পছন্দ হয়ে গেল তার। নগদ পাঁচশ টাকা বরপণ পেলে সে রাজি আছে পণ্ডিতকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত করতে। হরিপদ অর্থনৈতিক অঙ্কুহাত তুলে আপত্তি জানালেন। অনিমেষ কিন্তু উঠে পড়ে লেগেছিল বোনের বিবাহ ব্যাপারে। অনেক ধরাধরি ক'রে সে জোগাড় করলে একটা ম্যারেজ গ্রান্ট। অনাথা উদ্বাস্ত মেয়েদের বিয়ে দেবার জন্য সরকার অর্থ সাহায্য করেন কেন্দ্র বিশেষে। পাত্র বরপণের টাকাটা আগাম চাইলে। রাজি হ'ল না অনিমেষ। মাত্র ছ'শ টাকা সে দিল আগাম খরচ বাবদ। ঐ টাকাটা নিয়েই সে পালাল। বিড়ির দোকান সে আগেই বিক্রি করেছিল।

তারপর থেকে হরিপদ আর চেষ্টা করেন নি। অনিমেষ চেষ্টা করছিল জানতে পেরে নমিতা এসে প্রতিবাদ করে। বিয়ে সে করবে না। অন্ধ বাপের সেবায় সে কাটিয়ে দেবে জীবন। হরিপদ ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেন—বৃদ্ধের জীবনের চেয়ে নমিতার জীবনের বিস্তারটা বড়। বৃদ্ধের অবর্তমানেও নমিতাকে ছুনিয়াদারী করতে হবে। নমিতা কিন্তু অটল। বয়স হয়েছে তার। তার কথারও দাম দিতে হয়। সে দৃঢ় আপত্তি জানালো যখন তখন চুপ ক'রে যেতে হল অনিমেষকেও। মনকে সে বোঝালে বোনের বিবাহ ত সে ব্যবস্থা করতে পারতই শুধু—নমিতা রাজি নয় যে।

তাই নমিতার প্রতি একটা গোপন মমতা ছিল কামিনীর। আহা বেচারী জানতেই পারল না কি মধুময় এ জীবন! নমিতা রুঢ় কথা বললেও সহ্য ক'রে যেত কামিনী, যতটা পারে। পুরানো দিনের কথাতেই একেবারে বিভোর হ'য়ে যায় সে।

খুঁট ক'রে শব্দ হয় বাইরে। চম্কে ওঠে কামিনী।

: বোদি আমি!

কামিনী তাড়াতাড়ি কাঁপটা সরিয়ে দেয়। ঘরে ঢোকে বাবলু। জলে

ভিজ়ে হি হি করে কাঁপছে সে নীতে । কামিনী ওকে জড়িয়ে ধরে । কাঁপটা
টেনে বাবলুকে এনে বসায় উনানের পাড়ে । সম্বন্ধে মুছে নেয় গুর কাঁকড়া
চুলগুলো আঁচল দিয়ে ।

: এত রাত করে ? ইস্ একেবারে ভিজ়ে গেছিস যে ! ছি ছি ; না বাপু
আর তোকে পাঠাব না এ কাজে ।

: আরে দূর । এটুকু ভিজ়লে কি হয় ? কিন্তু বৌদি, প্যাকেটগুলো বোধ
হয় সব নষ্ট হ'ল ।

উম্মনের উত্তাপে বাবলু এটু সামলে নিয়েছে । হাতের ব্যাগটা উবুড় করে
ঢালে মেজ্জেতে । কামিনী গুনে গুনে তুলতে থাকে । হাফপ্যান্টের পকেট
থেকে খুচরা পয়সা বার ক'রে দেয় বাবলু । কামিনী প্রশ্ন করে : আজ তুপুরে
খেতে এলিনে যে বড় ?

: সে অনেক কথা ।

কামিনীর গোনা শেষ হয় । খুচরা পয়সার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বলে : মাত্র
পাঁচ প্যাকেট চানাচুর খেয়ে আছিস সারাদিন ? পাঁচ প্যাকেটের দাম কম
দেখছি ?

: আরে দূর, আমি চানাচুর খাব কোন ছুঃখে ? ময়রাতে কি সন্দেশ যায় ?
বন্ধুদের খাইয়েছি । আজ ওদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল যে ।

: কাদের সঙ্গে ?

: আর যারা ফেরি করে । মর্টন দা, হাতকাটা তেল দা, মসলামুড়ি আর
মিঠাবাংলা দা ।

: মিঠাবাংলাদা কি রে ? তোর বন্ধুর নাম ?

: দূর, নাম হবে কেন ? আমরা ঐ বলে ডাকি ? ওরা আমাকে ডাকে
সাড়ে-চার-ভাজা বলে ।

: তা ভাল ; কিন্তু তুই যে বড় খেতে এলি না ? এমনি করলে কিন্তু কাল
থেকে যেতে দেব না ।

বাবলু প্রতিবাদ করে : বারে, তুমি যে মোয়া দিলে সঙ্গে ?

: তা হোক, রোজ ছপুরে খেতে আসতে হবে।

: তা আসব না হয়, এখন খেতে নাও দিকি। পেটের মধ্যে শুভ নিশ্বস্তের
মুহুর্ত হয়ে গেছে।

: দিচ্ছি, দাঁড়া আগে তোর প্যান্টটা ছাড়াই।

কামিনী উঠে যায় ওঘর থেকে বাবলুর একটা প্যান্ট আনতে। বাবলু
উনানের ধারে বসে হাত পা-গুলো সোঁকে নেয়। আজ তার মনে ক্ষুধার
জোয়ার এসেছে। বাবলুর বাজারে যারা ছিল তার প্রতিযোগী তাদের সঙ্গে
সন্ধি হ'য়ে গেল। বাবলুর হিসাবে বাবলুর কাছে আজকের দিনটা স্বর্ণীয়।
একটু পরে কামিনী ফিরে আসে তার একখানা শায়া হাতে ক'রে, বলে :
তোর প্যান্ট এখনও শুকায় নি। এখানাই পর।

: দূর! প্রতিবাদ করে বাবলু—ও কি পুরুষ মানুষে পরে নাকি? আমার
লজ্জা করে না বুঝি।

কামিনী হাসি লুকিয়ে বলে—নে, আর পাগলামি কবিস না। এটাই প'বে
খেয়ে নে। বাহাদুরী দেখাতে হবে না।

ঝাঁকড়া মাথা নেড়ে বাবলু দৃঢ় স্বরে বলে : না, ও আমি কিছুতেই
পরব না।

: বাবলু !!

কামিনীর ঐ একটি আস্থানে নিখাদে নেমে আসে বাবলুর কণ্ঠস্বর : বা—বে
তোমার সব তাতেই ধমক। আজকে কেমন মজা হ'ল তা শুনবে না—
সারাদিন পর বাড়ি ফিরলাম,—তা কেবল ধমকই দিচ্ছ।

বলে বটে, তবে হাতটাও বাড়ায়। বোদিব দিকে পিছন ফিরে ভিজে
প্যান্টটা ছেড়ে শায়াটা পরে। তারপর পিড়িতে এসে বসে। কামিনীর সঙ্গে
চোখাচোখী হ'তেই ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে কামিনী। ভাতের খালাটা এগিয়ে
দিতে দিতে বলে : এই তো লক্ষী মেয়ে,—খুড়ি ছেলে !

লাফ দিয়ে উঠে পড়ে বাবলু। কামিনী চট ক'রে ধরে ফেলে তাকে :
কি হ'ল ?

: দূর, শুধু এই পরে থাক। যায় নাকি !

: কেন ? লজ্জা করে ?

: করে না ?

: শুধু এইটা পরে লজ্জা ক'রছে তা বললেই হয় বাপু। তা দিচ্ছি এনে...

: কী ?

: আর বাকি সবগুলো, যা চাইছ। শাড়ি, ব্লাউস, বডিস...

এবার বাবলুকে ধরে রাখা সত্যিই শক্ত হয় কামিনীর পক্ষে। কিন্তু হাতটা সে ছাড়ে না। জোর ক'রে কাছে টেনে নেয়। ওর ডান হাতটা এঁটো, বা হাতে আঁচল দিয়ে ভিজ়ে মাথাটা আর একবার মুছে নিয়ে মিষ্টি ক'রে বলে : আমার কাছে আবার লজ্জা কিরে ? তোকে যে এইটুকু বেলা থেকে মানুষ ক'রলাম। গোরা কি আমার কাছে লজ্জা পায় ? লক্ষী ভাইটি আমার, রাগ করিস না। আচ্ছা আর, তোকে খাইয়ে দেই।

বাবলু বোধ হয় একটু নরম হয়। আর প্রতিবাদ করে না। খেতে বসে। ভাতের গরাস পাকিয়ে বাবলুর মুখে তুলে দিয়ে কামিনী ডাকে : বাবলু।

: উ ?

: আমি ভাবছিলাম, এবার তোর ব্যবসার কথা বাবাকে বলি,—কেমন ?

: ওরে বাস্‌রে, অমন কাজও ক'র না বোদি। তাহলেই আমাদের ব্যবসার গণেশ উন্টোবে। বাবা কিছুতেই আমাকে বিক্রি করতে দেবে না। তা কি হয়। বাবলু হবে চানাচুরওয়াল! ওর লেখাপড়া হবে না? ও পণ্ডিত হবে না?

কামিনী ওর নকল করা কণ্ঠস্বরে হেসে ফেলে। তবু বলে : কিন্তু কথাটা তো মিথ্যে নয়। ইয়ারে, সত্যিই লেখাপড়া শেখা হবে না তোর ?

: ছেলেমানুষের মতো কথা বল না বোদি। লেখাপড়া শিখে মানুষও হ'তে কি আমারই অসাধ ? কিন্তু কি করবে বল ? সংসারটা তো চালাতে হ'বে ? এতগুলো লোককে তুমি কি খেতে দেবে যদি আমরা ব্যবসাটা বন্ধ ক'রে দেই ?

: বন্ধ করতে তো বলছি না আমি। কিন্তু সকলকে লুকিয়ে এ কাজটা করা কি ঠিক হচ্ছে ?

: কেন নয় ? ওরা সবাই সমান। দাদা-দিদি-মা সব সব। জানতে পারলে এখনি সবাই উপদেশ দিতে ছুটে আসবে। বাবলু শুধু লেখাপড়া করবে, আর কিছু নয় !

কথাটা কামিনীরও অজানা নয়। এই জন্মই এতদিন সাহস করে বলতে পারেনি কাউকে। বাবলুর আশঙ্কা মিথ্যা নয় ; কিন্তু তবু সকলকে না জানিয়ে এই যৌথ ব্যবসাটা চালানোর সমস্ত দায়িত্ব সে একা নিতেও চায় না আর। একটু ইতস্ততঃ ক'রে তাই বলে : কিন্তু আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না বাবলু !

: কেন তোমার আবার কি হ'ল ?

: তুই এই সংসারের জন্মে উদয়াস্ত পরিভ্রম করছিস্ অথচ ওরা মনে করেন—তুই বুঝি আড্ডা মেরে বেড়াস্ সারাদিন। সব সময় সবাই তোকে গালাগালি দেয়। শুনলে আমার কষ্ট হয় না ?

ভাতের দলটা তাড়াতাড়ি গিলে নিয়ে বাবলু হেসে ওঠে : আরে দূর। ওদের ওসব ছেলেমানুষী কথায় কান দিতে গেলে চলে ?

হাসে কামিনীও, বলে : তোর ধারণা, তুই ছাড়া এ বাড়িতে সবাই ছেলে-মানুষ, না রে ?

বাবলু কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। কামিনী প্রশ্নটা বদলে নেয়। বলে : তা হ্যাঁরে, আজ তোদের রেলের কামরায় কি হ'য়েছে বলবি বলছিলি যে তখন। কি হ'য়েছে আজ ?

আজ কি হয়েছে ? আজ যা হ'য়েছে তাতে বাবলু হাতে স্বর্গ পেয়েছে। আর সেই কথাটাই বিস্তারিত ক'রে বলবার জন্ম ওর অন্তরাঙ্গা ছটফট করছিল এতক্ষণ। সবার দৃষ্টির আড়ালে দেবর-বৌদির এই যে যৌথ ব্যবসা এর বিরুদ্ধে বাধা আছে অনেক। বাবলুর মতে বাধা তিনটি, প্রথমত মূলধন, দ্বিতীয়তঃ ব্যাপারটার গোপনীয়তা। কিন্তু এ ছাড়াও ব্যবসাটার আর একটা বড় বাধা

ছিল। সেটা উৎপাদন কেন্দ্র নয়—বিক্রয়-কেন্দ্রে। সেটা হচ্ছে সার্বজনীন প্রতিকূলতা। এই স্বদর্শন বালকটিকে স্টেশনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে ওরা কোতূহলী হ'য়ে এগিয়ে এসেছিল প্রথম দিন। মশলামুড়ি, মর্টন আর হাতকাটা তেল। কাকের বাসায় কোকিল শাবককে দেখে যেমন ক'রে এগিয়ে আসে বায়সকুল। তারপর যেই বোঝা গেল আগন্তুক ছেলেটিও ফেরি করতে চায় তখন উপমাটার পুরা তাৎপর্য অসুধাবনযোগ্য হয়ে ওঠে। বায়সচকুর ভাঙনায় জর্জরিত বাবলু এ কয়দিন শুধু এ কামরা ও কামরাই করেছে। আজ ছপুর্নেও তার অবস্থা কাহিল হ'য়ে উঠেছিল। ভাবলেও বুকটা টিপ টিপ করে এখনও।

তখনও মেঘলা করেনি। এচও রোডে স্টেশন প্ল্যাটফর্মটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। মাঠের মধ্যে থেকে কঁপে কঁপে উঠছে উত্তাপ। ঝিম্ ঝিম্ করছে সারা স্টেশন। ওভার ব্রীজের নীচে লোহার কাঠামোর একটা টি আয়রনের উপর বসে ছিল বাবলু বিষন্ন হয়ে। সারা সকালে মাত্র এক প্যাকেট বিক্রি হয়েছে তার। করবে কি ক'রে? যখন যেখানে সে গিয়ে দাঁড়ায় তার উদয়নগরের স্পেশাল ব্র্যাণ্ড চানাচুরের বাণ্ডিল নিয়ে, সেখানেই দেখা দেয় ওরা। বাধা দেয় নানাভাবে। উত্যক্ত করে। বাবলু লক্ষ্য করে ওর দিকে এগিয়ে আসছে মশলামুড়ি, হাতকাটা তেল, তানসেনগুলি আর মর্টন।

মর্টন বলে : কি বে ? হকারি করার সখ মিটল ?

বাবলু চুপ ক'রে থাকে। জানে, কথা বললেই ওরা আরও পিছনে লাগবে। হাতকাটা তেল বলে : আর কেন বাওয়া ! এ লাইনটা ছাড় না চাঁহু !

তানসেনগুলি ওর খুতনিটা নেড়ে দিয়ে ফোড়ন কাটে : যা বে বাড়ি যা। মায়ের আঁচলের তলায় বসে লালটুকটুক রাজকন্তোর গল্প শোন গে !

হো হো করে হেসে ওঠে সবাই।

আর সখ হয় না বাবলুর। উঠে দাঁড়ায়, বলে : কেন তোমরা এমন করছ বলত ? আমি কি করেছি তোমাদের ?

: কি করেছ ? পাকাধানে মই দিতে এসেছ দাঁহু। শোন বে, এ

লাইনে আর আমরা হকার বাড়াতে দেব না। এমনিতেই না যত মন্দির
ডেলি-প্যাসেঞ্জারের লাইন।

সগর্জনে সবুজ রঙের পাকিস্তান মেল প্রবেশ করে প্র্যাটফর্মে।

মর্টন বলে : চল্ চল্। বাবলুর দিকে ঘুরে বলে : কি বে খোকাবাবু ?
তুইও আসবি নাকি ? দেবো ঠেলে ফেলে ঐ লাইনের তলায়।

ওরা এগিয়ে যায়। বাবলু সাহস পায় না। ধীরে ধীরে সে চলে যায়
ইঞ্জিনের দিকে। ইঞ্জিন! ঐ যন্ত্রটা চিরদিনই আকর্ষণ করে বাবলুকে।
কী আছে ওর লৌহকন্দরে? কেমন ক'রে টেনে নিয়ে চলে এতবড় লোক
বোঝাই এই বিরাট রেলগাড়ীটাকে? ঝংঝং করে তামার পাইপগুলো।
নীল পোষাক পরা একটা লোক কালো রঙের একটা তেল লাগায়। তারপর
একটা হাতুড়ি দিয়ে অহেতুক ভাবে প্রত্যেক গাড়ির চাকায় একবার ক'রে
পিটিয়ে চলে যায়। অবাক বিষ্ময়ে বাবলু ইঞ্জিনের কলকজাগুলি
দেখতে থাকে।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাইভার ওকে ডাকে। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসে বাবলু।
ড্রাইভার ওর থলির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে : কেৎনা করকে? বাবলু
ইংরাজি করে জবাব দেয় : ওয়ান এ্যানা স্তার!

: টু পাইস?

: নো স্তার!

কপট ধমক লাগায় ড্রাইভার! বাবলু চমকে পিছিয়ে যায়। ড্রাইভার
কৌতুক বোধ করে। বয়লারের ঢালাটা খুলে বলে...হু পয়সায় না দিলে
ফেলে দেবে ওর ভিতর।

বাবলু তিন লাফে সড়ে পড়ে!

হা হা করে হাসে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাইভার!

এগিয়ে আসে মশলামুড়ি।

ড্রাইভার তাকেও ডাকে : হাউমাচ্ এ প্যাকেট?

: এক আনা স্তার!

: টু পাইস ?

: টু পাইস কাদার মাদার স্তার, কিন্তু বাপ মা ছাড়াও দুনিয়ার মানুষ আছে স্তার ! তাই এ্যানাদার টু পাইস কর মাই সুইট হার্ট !

হা হা ক'রে হাসে সাহেব । বয়লারের প্রচণ্ড উত্তাপ আর বাইরের কক প্রকৃতির দাবদাহের মধ্যে এমন রসঘন রসিকতায় প্রাণটা সরস হ'য়ে ওঠে ওর । এক প্যাকেট মশলামুড়ি নিয়ে কেলে দেয় একটা দোয়ানি : ওয়ান এ্যানা কর ইয়োর প্যাকেট এ্যাও এ্যানাদার কর ইয়োর জোকস্ !

মশলামুড়ি সেলাম করে সাহেবকে । দোয়ানিটা কুড়িয়ে নেয় । তারপর বাবলুকে অহেতুক একটা ভেংচি ~~কিছু~~ চলে যায় ফেরি করতে । বাবলু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে ! এগারো বছরের বালকটির সঙ্গে যেন সবাই শক্ততা করছে ।

হুইসিল দিয়ে ট্রেনটা ছাড়লো একটু পরেই । বাবলু তখনও ইঞ্জিনের কাছে প্র্যাটফর্মের সীমান্তে দাঁড়িয়ে । হঠাৎ ওর নজরে পড়ে মর্টনদা ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছে আর অপস্রমমান গাড়ীটার জানালা থেকে মুখ বার করা পাকিস্তানযাত্রী একজনকে বলছে—

: আর দু আনা, আর দু আনা !

লোকটা দু হাতের বৃদ্ধানুষ্ঠ নাচিয়ে ভেঙচি কাটলে মর্টনদাকে । গাড়ীর গতিবৃদ্ধি পাওয়ার যাত্রীটি দেশান্তর যাত্রার আগে শেষ ফাঁকি দেবার সুযোগ পেয়েছে এপারের মানুষকে । মর্টন ছুটে গেল লোকটার দিকে । ফাঁকি বাজি ! যাত্রীটির কাছে গিয়ে পৌছতেই সে দিলে এক ধাক্কা । মর্টন পড়ে গেল প্র্যাটফর্মের উপর ! অল্পের জন্য চাকার নিচে পড়ল না ! লজ্জেলের শিশিটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে চুরমার হ'য়ে গেল । ছড়িয়ে পড়ল সবুজ রঙের লজ্জেল সারা প্র্যাটফর্মে ! হা হা ক'রে হেসে উঠল লোকটা ! অপমানে, আঘাতে আর লোকসানে চোখ কেটে জল বেরিয়ে এল মর্টনের । হাঁটুর কাছটা ছড়ে গেছে তার !

বাবলুর মুখেও ফুটে উঠল একটা অসহায়তার হাহাকার ! মুহূর্তে সে মুখে

ফিরে এল একটা প্রতিহিংসার কাঠিন্য। লোকটার পৈশাচিক উল্লাসদীপ্ত অট্টহাস্য আর ভুলুঙিত মর্টনদার অসহায় মূর্তি যেন আগুন ধরিয়ে দিল এগার বছরের বালকটির মাথায়। পর মুহূর্তেই জানালা থেকে বার করা অট্টহাস্যরত মুখখানা এসে গেল বাবলুর নাগালের মধ্যে। প্রাণপণ শক্তিতে বাবলু মেরে বসল ওর দাড়ি-ওয়ালা গালে একটা প্রচণ্ড চড়!

ছুই বিপরীত গতির বেগে সেও ঘুরে পড়ল প্লাটফর্মে। হাতটা তার কিম্ব-কিম্ব করছে। হেসে উঠল প্লাটফর্ম স্বল্প লোক। অনেকেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। তারা খুশী হ'ল। বেশ করেছে ছোকরা। বাহাদুর! মর্টন ভাঙা শিশির দুঃখ ভুলে ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল। টেচিয়ে ওঠে : এই মেঠাইওলা! লাও শিগ'গির আধসের রসগোল্লা। শ্রী সারাদিন উপোস ক'রে আছে! হাতকাটা-তেল চট করে বাবলুর পাশে বসে টেনে নেয় ওর হাতখানা। বাবলুর হাতটা লাল হ'য়ে উঠেছে। রক্ত জমে গেছে! নিজের ব্যাগ থেকে একটা ওষুধ বার ক'রে মালিশ করতে লেগে যায়। বলে : বাবলুর যখন এতটা বেজেছে ও শ্রী বোধহয় বাপের নাম ভুলে গেছে মাইরি!

অতি দুঃখেও বন্ধুরা হো হো ক'রে হেসে ওঠে! প্রাণখোলা হাসি। বাবলুও!

এই গল্পটাই বিস্তারিত ক'রে বলতে যাচ্ছিল বাবলু। কিন্তু বাধা পড়ল তাতে।

ওঘর থেকে বিন্দুবাসিনী সাড়া দেন : বোমা, কথা বলছ কার সঙ্গে রাস্তাঘরে?

বাবলু একেবারে চুপ। ছড়ানো চানাচুরের প্যাকেটগুলো কামিনী কুড়িয়ে নেয়। রাখে ভুলে একটা মাটির হাঁড়িতে।

: কি হ'ল বোমা? সাড়া দিচ্ছ না কেন?

ও ঘর থেকেই তাঁকে খামিয়ে দেয় নমিতা : তোমার বৌ আজকাল ভুতের সঙ্গে কথা বলে মা। ওতে কান দিতে নেই!

বিন্দুবাসিনী এগিয়ে আসেন দ্বারপ্রান্তে : ও! দেওরটি কিরে এসেছেন
বুঝি ?

জবাব দেয় না কেউ !

: তুই বেটামুদির কাছে দশটাকা ধার করেছিস ?

বাবলুর খাওয়া বন্ধ হ'য়ে যায়। চূপ করে থাকে। কামিনী বলে : এখন
কেন মা ? আগে ওর খাওয়াটা মিটে যাক। সারাদিন না খেয়ে আছে ছেলেটা !

: তুমি চূপ কর বোমা। সারাদিন না খেয়ে থাকবারই ছেলে বটে ও !
বাপ-মা না খেয়ে মরছে আর ও বাজারে ধার করছে ! এক আধ পয়সা
নয়—দশ টাকা ! বল হতভাগা !

এগিয়ে আসেন উনি দ্বার ছেড়ে বাবলুর দিকে। বাবলু কি ভাবলে সেই
জানে। হঠাৎ পিঁড়ি থেকে লাফিয়ে উঠে সোজা বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।
বিন্দুবাসিনী ওকে ধরবার জন্ত বাড়িয়ে দেন একটা হাত। হাবার সময় বাধ্য
হয়ে বাবলুকে একটা ধাক্কা মেরে যেতে হল। পড়তে পড়তে সামলে
নেন বিন্দুবাসিনী। কামিনী এগিয়ে আসে। বিন্দুবাসিনী থামিয়ে দেন :
থাক ! দুধকলা দিয়ে কী সাপই পুষেছি ! দুধের ছেলেটাকে পর্বস্ত মন্ত্র পড়ে
বস করেছে ডাইনি !

ক্ষুধার্ত বাবলুর অর্ধভুক্ত থালাখানার দিকে চেয়ে কামিনী বলে : দুধের
ছেলেকে বশ করতে হ'লে মন্ত্রের দরকার হয় না মা। ও একটু স্নেহের
কান্নাল। আমার কাছে সেটুকু পায় বলেই ছুটে আসে আমার কাছে !

নমিতাও উঠে এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারপ্রান্তে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে : তা
তো বুঝলাম, কিন্তু মার চেয়ে যে ভালবাসে—তাকে কি বলে জান বোঠান ?

: জানি ঠাকুরঝি, বলে ডা'ন ! কিন্তু সারাদিন উপোস ক'রে যে মাকে
দেখে বাড়া ভাত কেলে ছেলে ছুটে পালাল তাকে—

: কী ! কী বললে তুমি ? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ! ছোটলোকের
ঘর থেকে এসেছ ব'লে মনে কর তোমার সব ইতরামোই সহ্য করব আমরা !
তোমার আশকারাতেই না ও সাহস পেয়েছে বেটামুদির কাছে টাকা ধার

করতে? আমি ঠিক জানি—ঐ ভাইনির পরামর্শেই তুখের বাছা টাকা ধার করেছে! কী? অস্বীকার করতে পার একথা?

: অস্বীকার করব কেন মা? টাকা এনে ও আমাকেই দিয়েছে!

নমিতা বলে ওঠে: বাঃ! কী গৌরবের কথা! শত্রুর জানলো না—স্বামী জানলো না আর বাড়ির বোঁ টাকা ধার করলেন বাইরের লোকের কাছে। ধার তো করলে বোঁদি, শোধ দেবে কে?

: আমিই শোধ দেব ঠাকুরঝি। তোমার মাইনের টাকায় হাত দেব না!

বিন্দুবাগিনী বিকৃত কণ্ঠে বলে ওঠেন: তা তো দেবেই বাছা! শোধ যে কি ক'রে দেবে তা তো কাল সকালেই দেখেছি! গলির মধ্যে তাই এত ঢলাঢলি!

নমিতা যোগ দেয়: আর শেষরাতে খিড়কিতে দাঁড়িয়ে ভূতেব সঙ্গে হাসাহাসি!

কামিনীর সমস্ত শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে যায়! চিৎকার করে ওঠে: ঠাকুরঝি! কী বলছ? এত ইতর মন তোমাদের? তুমি না শিক্ষিত!

নমিতা গ্লোবের সঙ্গে বলে: আমরাই ইতর নয়? আর শিক্ষার কথা তুলছ বোঁদি? মুদির সঙ্গে পীরিত ক'রে সংসার চালাবার শিক্ষা তো স্কুলে শেখায় না! ওটা বুঝি তোমার মায়ের কাছে শিখেছ বোঁঠান?

: কি বললে?

: তুমি বেটামুদির সঙ্গে পীরিত ক'রে রোজগার করবে আব সেই অন্ন আমরা খাব মনে করেছে?

কামিনীর সমস্ত শরীরে যেন জ্বালা ধরে যায়। বাপ-মায়ের আঁতুরে মেয়ে ছিল সে! মায়ের কথা মনে পড়ে যায়! যাদের জন্তে সে এত করেছে তারাই বধন তাকে আঘাত করলে, নারীত্বের চরম অবমাননাকর ইঙ্গিত ক'রে তাকে ধুলার সাথে মিশিয়ে দিলে—এমনকি তার স্বর্গগতা মায়ের নামেও লেপন করলে চরম কলঙ্কের কালিমা, তখন কামিনীর হিতাহিতজ্ঞান লোপ পেয়ে

গেল ! বসে : তাই তো দেখতে পাই ঠাকুরঝি ! কি ক'রে সংসারটা চলছে
তা দেখছি তোমরা সকলেই জেনে ফেলেছ ! কই অন্নজল তো কারও মুখে
আটকাচ্ছে না ! খেতে দিলে না এক ফোঁটা ছেলেটাকেই !

ডুগরে কৈদে উঠলেন বিদ্যুৎবাসিনী !

: বোমা !

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন হরিপদ পণ্ডিত—অন্ধ পদক্ষেপে । তাঁর
ঐ কণ্ঠস্বর, কৌচার খুঁট গায়ে জড়িয়ে ঐ উঠে আসার ভজিটার সস্থিত ফিরে
পায় কামিনী ! মনে পড়ে এতক্ষণ কার সঙ্গে ঝগড়া করছিল । কি নিয়ে
ঝগড়া করছিল ! সমস্ত শরীর খরখর ক'রে কৈপে ওঠে ওর ।

: তোমার খাণ্ডী আর ননদ সব জেনেই অন্ন গ্রহণ করেছেন—বলছিলে
তুমি । বিশ্বাস কর বোমা—আমি এ কথা জানতাম না । জানলে, তোমার
এভাবে রোজগার করা অন্ন হরিপদ পণ্ডিতের গলা দিয়ে নামতো না ! কিন্তু
যে কথা তুমি নিজমুখে স্বীকার করলে আর তাই নিয়ে বড়াই করলে—সে
কথা জানার পরেও যদি তোমার রোজগার করা অন্নে ভাগ বসাই তবে সে
অন্ন আমার কাছে গোমাংস ! কিন্তু রাত অনেক হ'য়েছে—এভাবে—

কথাটা শেষ হ'ল না । হরিপদ পণ্ডিতের কথা শেষ হবার আগেই
অনশনক্লিষ্ট কামিনীর সংজ্ঞাহারা দেহটা লুটিয়ে পড়ল মেজের উপর ।

বাবলুর অহুঙ্ক অন্নপাত্রটা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল সে । অন্নলক্ষী ছড়িয়ে পড়ল
সারা ঘরময় ।

ও ঘর থেকে রোগজীর্ণ অনিমেব শুধু প্রশ্ন করে : কী হ'ল ?

কেউ সাড়া দিল না সে ডাকে !

দিন আর কাটে না কামিনীর । কোথা থেকে কি যেন হ'য়ে গেল । এ
কয়টা বছর আঘাত সে কম পায়নি । গোছান সংসার, ঘর বাড়ি সব ছেড়ে
এসেছে । অভাব অনটনের তীব্র কষাঘাতে সংসার যখন জর্জরিত হ'য়ে
পড়েছে তখন দক্ষ নাবিকের মতই সে চালিয়ে এসেছে সংসার তরীটিকে ।

খাণ্ডী ছিলেন, তাঁর গায়ে অভাব অনটনের উত্তাপ লাগতে দেয়নি। নন্দ ছিল কিন্তু অবিবাহিত মেয়েকে সীমন্তিনী মাত্রেই ভাবে নাবালিকা ব'লে। তাই কামিনীই নিজেকে থেকে নিয়েছিল গোটা সংসারটাকে চালিয়ে নেওয়ার ভার। জরাগ্রস্ত স্বশ্র, রোগাক্রান্ত স্বামী, নাবালক দেবর, এদের নিয়ে সে যে কি করে চালিয়ে এসেছে এতদিন কেউ তা জানে না। বোধকরি যিনি সব জানতে পারেন একমাত্র তিনিই খবর রাখতেন এই নিরলস বধূটির অতীত সাধনার। নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা সাধ-আহ্লাদের কথা মনেও পড়েনি এতদিন। দিনের শেষে দুটি শাকার রোঁধে দিতে পেরেছে প্রিয়জনকে এইটুকুই ছিল ওর পরম সাধনা। সেই ছিল ওর একমাত্র সুখ। সে সুখেও বৃদ্ধি বঞ্চিত করলেন ওকে ভগবান।

হরিপদ মাস্টার সজ্জীক সকল পৃথক হ'য়ে গেলেন।

হরিশ মিত্রের প্লটের অসমাপ্ত বাড়িটার উঠে গেছেন ওরা। হরিশ মিত্রও ডেসার্টার। ওরা ভিন্ন কার্ড করাবার দরখাস্ত করেছেন।

অনিমেঘ জানতে চেয়েছিল একবার কারণটা।

হরিপদ বলেছিলেন : তোমার রোজগার নেই—কি ক'রে টানবে আমাদের সবাইকে। তাছাড়া এখানে থাকলে বোমার স্নেহের আতিশয্যে বাবলুকে মাহুষ করতে পারব না আমরা। ওই তো এখন আমাদের একমাত্র ভরসা।

অনিমেঘের কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে, বলে : রোজগার তো আমাদের কারও নেই বাবা। যদি না খেয়েই মরতে হয় তবে সবাই মিলে একসঙ্গে মরি না কেন ?

: না। উপার্জনের অনেক পন্থা আছে অনিমেঘ। পুত্র উপযুক্ত হ'লে তাকে পৃথক সংসার করতে দিতে হয়। সংসারের এই নিয়ম। তুমি দুঃখ কর না।

অনিমেঘ চুপ ক'রে থাকে।

: আর তাছাড়া কারও কোনও উপার্জন নেই এ কথাও তো সত্য নয়। নমিতা স্কুল-মাস্টারির চাকরিটা পেয়েছে। সেও তোমাদের সংসারে মাসিক কিছু ক'রে পাঠাবে।

অনিমেব বলে : আমরা কি কোন অপরাধ করলাম ? তাই কি আমাদের ত্যাগ করে যাচ্ছেন ?

ওর মাথায় একখানা হাত রেখে হরিপদ পণ্ডিত বলেন : তোকে এই অস্থূল শরীরে ফেলে যেতে হ'চ্ছে—এ কি আমারই কম দুঃখ ? তুই ভালো হ'য়ে ওঠ ! হ হ ক'রে কঁদে উঠলেন বিন্দুবাসিনী ।

বাইরের উঠানে কয়েকটি বাস বিছানা বাঁধা । একখানা গোরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সামনে । মালপত্র উঠছে তাতে । লতু আর নমিতা . দেখে শুনে মালপত্র ওঠাচ্ছে । বাবলু অল্পপস্থিত । দ্বারের কাছে পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে কামিনী । একটা কথাও বলতে পারেনি । সমস্ত জিনিসটা যেন তার কাছে বোধগম্য হচ্ছিল না । অভিমানের বসে রাগের মাথায় সে যদি একটা কথা বলেই ফেলে—তাই ঐক্য সত্য হ'য়ে উঠবে ? আর সে যে ছেঁচাবেড়ার রান্নাঘরের চতুঃসীমায় তিলে তিলে বছরের পর বছর আত্মদান করে এলো ;—জীবনের সব স্থখ সব আহ্লাদ বলি দিয়ে এই সংসারটিকে ভারবাহী বলদের মত নীরবে চালিয়ে নিয়ে এল তার কোনও মর্খাদা এরা দেবেনা । বিন্দুবাসিনীর কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, নমিতা না হয় নতুন চাকরির মোহে ধরাকে সরা জান করছে, কিন্তু ওর খবর ? হরিপদ পণ্ডিত মশাই ? তিনি কি ক'রে বিশ্বাস করলেন এতবড় স্বর্ণিত মিথ্যা অভিযোগ । মা, আর মালম্ভী ছাড়া ডাকেননি কোনদিন—আর আজ এক মুহূর্তে উনি ধরে নিলেন যে পুত্রবধূর অন্তর্নিহিত উপার্জনের অগ্নি চলেছে তাঁর সংসার ! ছরস্তু অভিমানে কামিনীর অন্তঃকরণ স্ফুটনোন্মুখ আগ্নেয়গিরির মত থরথর করে কাঁপছিল ।

হরিপদ বলেন : উঠে এসো বড় বউ । আমাদের বাবার সময় হ'ল ।

বিন্দুবাসিনী অশ্রুসিক্ত মুখটা মুছে উঠে বসেন । বলেন : ওকে ওই সর্বনাশীর হাতে ছেড়ে যেতে হ'বে—তাবলেও আমার হাত পা হিম হ'য়ে যাচ্ছে ।

অনিমেব উল্লেখ চেয়ে থাকে । কামিনী নীরব ।

দয়্যার দিকে পা বাড়াতেই কামিনী প্রণাম করে।

হরিপদ যন্ত্রচালিতের মতো বলেন : কল্যাণমস্ত।

কামিনী আর স্থির থাকতে পারেনা, বলে : কেন, কেন আপনি আমাদের
ত্যাগ ক'রে যাচ্ছেন ? আমি দেব না যেতে। সমস্ত মিথ্যা কথা।

: মিথ্যাই হ'ক বোমা ! আমি আশীর্বাদ করছি তোমার স্মৃতি হ'ক।

: স্মৃতি হ'ক !

কান্নায় রুদ্ধ হ'য়ে আসে অভিমানিনী মেয়েটির কণ্ঠ ! স্মৃতি হ'ক ?
অর্থাৎ কাল রাত্রে তার শব্দর যা বলেছেন তা তাঁর মুখের কথা নয়, মনের কথা।
রাগের মাথায় কথাগুলি বলে ফেলেননি তিনি—এ তাঁর অন্তরের বিশ্বাস।
তিনিও ধরে নিয়েছেন অসং উপায়ে উপার্জন করছে কামিনী ! তবু একবার
সে শেষ চেষ্টা করে : আমার সমস্ত কথা শুনবেন না আপনি ?

নমিতা বলে ওঠে : যাবার সময় আবার কেন ওসব কথা তুলছ বোদি।
আমাদের যেতে দাও।

জ্ঞান হাশে কামিনী। ছুরন্ত অভিমানে তার অন্তঃকরণ ছাই হ'য়ে যাচ্ছিল।
বলে : বুঝেছি ঠাকুরঝি। এস তোমরা। যাওয়াটা তোমাদের প্রয়োজন
—যুক্তিতে তো তোমরা এখন কান দেবে না ?

নমিতা বলে : মানে ?

: মানে আমরাই এখন তোমাদের বোকা। তুমিই এখন একমাত্র
উপার্জনক্ষম এ বাড়িতে। তাই আলাদা হওয়াটা তোমার প্রয়োজন।

নমিতা বলে : তুমি বলেই একথা ভাবতে পারলে আর মুখে বলতেও
আটকালো না ; কিন্তু উপার্জন তো তোমারও আছে বোদি !

: নমিতা !!—গর্জন ক'রে ওঠেন হরিপদ পণ্ডিত !

চমকে ওঠে নমিতা, কামিনীও। এ কণ্ঠস্বর ওরা চেনে। ওরা বোঝে
এ নিয়ে কোনও আলোচনা করতে দেবেন না অঙ্ক বৃদ্ধ। যাবেন তিনি নিশ্চয়ই
—তবে নীরবেই যেতে চান। কামিনীর দিকে অঙ্ক হতক্ষেপে তিনি শাস্ত
সমাহিত কণ্ঠে বলেন : সত্যিদের জোরে সাবিত্রী ফিরিয়ে এনেছিলেন

সত্যবানকে, লক্ষ্মীন্দরকে বেহলা। তুমি অনিমেষকে সারিয়ে তোল এই
আশীর্বাদই করে গেলাম।

ওরা চলে যান !

কামিনী চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

সমস্ত দিন অনিমেষ একটা কথাও বলে না। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে শূন্তের
দিকে। দিন কারও বসে থাকে না। সংসারের নানান দাবী আছে। আছে
শিশুপুত্রের আহ্বার—আছে রোগীর পথ্য। কামিনী মনকে শক্ত করে।
উনান জালে। দুটি ভাত ফুটিয়ে আর একটা বেগুন সেদ্ধ ক'রে ছেলেকে
খাওয়ায়। গোরাও বোধহয় বুঝেছে—কী একটা হ'য়েছে আজ। অগ্ন্যাগ্ন
দিনের মত কোনও ছটামি করে না। মায়ের কাছে দুটি খেয়ে নিয়ে চুপ
ক'রে শুয়ে পড়ে বাপের পাশটিতে। কামিনী একবাটি বালি গরম ক'রে নিয়ে
আসে অনিমেষের কাছে। ওকে খেতে বলে। অনিমেষ পাত্রটা নেয় না।
হাত নেড়ে জানায় যে সে খাবে না।

যে স্বামীর কাছে কামিনীর অদেয় কিছুই নেই—যে স্বামী তার হৃদয়ের
সমস্ত কথার খবর রাখে—যার কাছে দেহমনের গোপনতম সংবাদ উদ্ধার
ক'রে ঢেলে দিয়েছে কামিনী—নিঃসঙ্কোচে ; সেই স্বামীর কাছেই আজ সে
গিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কি জানি ও কি বুঝেছে। কী ভেবেছে !
কতটুকু বিশ্বাস করেছে তাই বা কে বলতে পারে। তরঙ্গমুখর নদীবক্ষে
নিমজ্জমান লোক যখন সবলে আঁকড়ে ধরে ভেসে যাওয়া কাঠ—তখন চোখ
খুলে সে দেখতে চায় না—ওটা ভাসাকাঠ না কুমীর ! কামিনীও তার শেষ
অবলম্বনটাকে বাচাই ক'রে উঠতে সাহস পায় না। অন্তরের সখী নমিতা
বিশ্বাস করেছে, মাতৃসমা' স্বাস্ত্রী বিশ্বাস ক'রেছেন, হরিপদ পণ্ডিতের মত
দেবভূল্য লোক পৰ্বস্ত অবিশ্বাস করেন নি এরপর কোন সাহসে কামিনী
বাচাই করতে যাবে তার শেষ আশ্রয়স্থলকে ! বালির বাটিটা নারিয়ে রেখে
সে চলে আসে রান্নাঘরে। উনানে জল ঢেলে দিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে।

অনিমেষ ওকে ডাকে : শোন।

যন্ত্রচালিতের মত কামিনী এসে দাঁড়ায় ওর শয্যাপার্শ্বে।

: কি হয়েছে বলতো? কি মিথ্যা অভিযোগের কথা বলছিলে তুমি!
কালরাত্রে হ'লই বা কি?

আর স্থির রাখতে পারে না কামিনী নিজেকে। ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বামীর বুকে। ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। অনিমেষ বুঝেছে ওকে এখন খানিকটা কাঁদতে দিতে হবে। তাই চুপ ক'রে থাকে। অনেকটা কঁদে কামিনী একটু হাল্কা বোধ করে। অনিমেষ আবার বলে : কি হ'য়েছে বলো। কেন বাবা আমাদের ছেড়ে গেলেন। ওঠ, মুখ তোল।

কামিনী ওর বুকের মধ্যেই মুখ লুকিয়ে বলে : ওঁরা বিশ্বাস করেছেন যে আমি অসৎ উপায়ে উপার্জন করে তোমাদের এ সংসারটা চালাচ্ছিলাম এতদিন—

: অসৎ উপায়? চুরি ক'রে?

: ওগো না, না! আমি আমি—

: বুঝেছি থাক।

কামার প্লাবনে বুঝি ভেসে যাবে কামিনী।

অনিমেষ শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলে : ওঠো বউ, আমি বিশ্বাস করিনি। ওঁরা না চিনলেও আমি তো তোমাকে চিনি। ওঠো, আমার বালি নিয়ে এস। আমাকে বাঁচতে হবে। আমার রোগ মুক্তিভেই একমাত্র—, আমি মরব না, আমি মরতে পারি না!

কামিনী ওকে নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরে। একটাও কথা বলে না!

নিজেকে কামিনী সামলে নেয়। তার সবকিছু তাহ'লে ফুরিয়ে যায় নি। তার স্বামী, তার জীবনমরণের সাথী তাকে অবিশ্বাস করেনি। অনিমেষ বেঁচে উঠতে চায়। অনিমেষ বেঁচে উঠবে। ব্রত-উপবাস নয়, সেবা দিয়ে, পরিচর্যা ক'রে, শুশ্রূষা ক'রে সে মৃতকর স্বামীকে সারিয়ে তুলবে। যতবড় সত্যায়ত্ত্বই হ'ন হরিপদ পাণ্ডিত, যত প্রজ্ঞাপদ-পূজ্য ব্যক্তিই হ'ন তিনি—সে সত্যীত্বের

মহিমময় মৰ্যাদার সামনে তাঁকেও এসে স্বীকার করতে হবে জ্ঞাতি। এই ভাঙ্গা সংসার জোড়া দেওয়াই হ'বে কামিনীর জীবনের ব্রত।

দ্বিগুণ উৎসাহে জলে ওঠে কামিনী। তাকে লড়াই ক'রে প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু লড়বে যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে—সেই দারিদ্র যে অসীম শক্তিশালী। অনিমেবের অস্থখটা কি তাই জানা যায়নি আজও। একঘাসের উপর সে শয্যাশায়ী। কোনও চিকিৎসক এসে দেখেন নি তাকে। মোবাইল যুনিটের ডাক্তারখানায় হরিপদ পণ্ডিত গিয়ে রোগীর অবস্থা বর্ণনা করতেন। আর মনকে-প্রবোধ-দেওয়া লাল-নীল জল নিয়ে আসতেন। তাই খাওয়ান হ'ত অনিমেবকে। মায়ের চরণামৃত ছিল এ ছাড়াও।

কামিনী স্থির করল যেমন ক'রে হ'ক ডাক্তার দিয়ে অনিমেবকে দেখাতে হবে। কলোনীর বড় ডাক্তার লালুবাবু। তাঁর দর্শনী বেশী। চৌধুরী ডাক্তারও বাড়িতে এসে দেখলে ছ'টাকা নেন। এক আছেন নিতাই ঠাকুরদা। অনেক ক্ষেত্রে বিনা দর্শনীতেই রোগী দেখেন তিনি,—কামিনী শুনেছে একথা। কিন্তু নিতাই কবিরাজ থাকেন কালোনীর একেবারে অপর প্রান্তে—ই-রকে। কে ডেকে আনবে তাঁকে? তাছাড়া কামিনীর সংসারে চাল ভাল সবই ফুরিয়ে এসেছে। বিষ্টপদর কাছে যে দশটা টাকা ধার করা আছে তাও শোধ করা হয়নি। অন্তত একখানা শাড়ি তাকে কিনতে হবে এ মাসেই। এখানা ব্যবহারের অযোগ্য হ'য়ে পড়েছে।

কামিনী অবাক হ'য়ে ভাবে কি ক'রে এ ব্যবস্থা অনুমোদন করলেন হরিপদ মাস্টার? ধরে নেওয়া যাক তাঁর অনুমান সত্য, তিনি জানতে পেরে-ছিলেন যে তাঁর পুত্রবধু চক্রবর্তী পরিবারের সমস্ত সম্মান বিসর্জন দিয়ে বিপথেই পা বাড়িয়েছিল। বেশ কথা। কিন্তু কেন সে গিয়েছিল ও পথে? তাঁদের সংসারের মুখ চেয়েই তো? সে উপার্জনে কি ঠর পুত্রবধু গহনা গড়েছে? তবে? তাহ'লে কেন তিনি তিরস্কার ক'রে ওকে সংপথে আনবার চেষ্টা করলেন না? স্কুলের কোনও ছেলে ছষ্টুমি করলে কি তিনি তাকে শোধরাবার চেষ্টা করতেন না? বিপথেই যদি যাত্রা শুরু ক'রে থাকে সে তবে

তাকে এভাবে একল। রেখে যাওয়াটা কি সেই পাপপথে যাত্রার ব্যবস্থাটাই
 স্বগম ক'রে দেওয়া নয়? এ কথা কি হরিপদ পণ্ডিত বোঝেন না? আর
 তা ছাড়া কামিনী যদি বিপথে যায় তাহ'লে কি অনিমেষকে ত্যাগ করতে
 হবে? অনিমেষের অপরাধটা কি? তিনি কি বিশ্বাস করেন অনিমেষের
 অসুমোদন আছে কামিনীর এ ব্যবস্থায়? রোগজীর্ণ পাণ্ডুর ঐ মানুষটার
 সম্বন্ধে একথা ভাবতে পারলেন তিনি? তা ছাড়া কাণ্ডজ্ঞানহীনতার চরম
 পরিচয় কি রেখে গেলেন না ঔরা। একজন অসুস্থ মানুষ—একটি শিশু আর
 একজন যুবতী নারীর পক্ষে বিনা রোজগারে কি ক'রে চলবে সংসার? কে
 জলটা তুলে আনবে? চালটা হুনটা কিনে আনবে? অন্ততঃ লতুকে কিংবা
 বাবলুকে এ পরিবারে দিয়ে যাওয়া কি উচিত ছিল না ঔদের? অভিমানে
 মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে কামিনীর। আর বাবলুটাই বা কি? ভুলেও
 একবার আসে না বৌদির কাছে! একবার মনেও পড়ে না দাদা বৌদির
 কথা! মনে পড়বে কেন? এখন যে দিদি রোজগার করছে! বৌদির ফ্যান-
 ভাতের কথা আর মনে পড়বে কেন। উঃ! কি নেমকহারাম ছেলেটা!
 ছুনিয়ার উপর অন্ধা হারায় কামিনী। শুধু স্বার্থ! আর কিছু চায় না কেউ!
 মানুষে মানুষে এত যে মধুর সম্বন্ধ—যা নিয়ে গড়ে উঠেছে এত সাহিত্য এত
 কাব্য—তা শুধু স্বার্থের খাতিরেই। প্রয়োজনের মানদণ্ডে বিচার হবে
 অন্তরের সমস্ত কোমলবৃত্তিগুলি।

ঔরা যেদিন চলে যান সেদিন রাত্রেই একবার এসেছিল বাবলু। তারপর
 থেকে ভুলেও এ পথ মাড়ায়নি। সেদিন সকালেই ঔরা চলে গেছেন। রাত্রে
 অনিমেষ ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর একখানা হাত গোরার গায়ের উপর।
 গোরাও ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে ওর বাপকে। ওদের নিশ্চিন্ত নিদ্রার
 ছবিখানি বসে বসে দেখছিল কামিনী। হঠাৎ বাইরে কে ডাকল : বৌদি!

জানালা দিয়ে উকি মারে বাবলু।

পরক্ষণেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বৌদিকে।

কাদামাখা খালি পা, ছেঁড়া সার্ট আর হাকপ্যান্ট। হাতে জড়ান কামিনীর

শাখাটা। কয়লার গুঁড়োতে বাবলুর মাথাটা ভর্তি। সেগুলি ঝাড়তে ঝাড়তে কামিনী বলে : তুই কোথেকে রে ?

বাবলু প্রতিপ্রশ্ন করে : বাবা মা নাকি চলে গেছেন ? কোথায় গেছেন ?
: সে কি রে ? তুই জানিস না ? হরিশ মিত্রের প্লটে। তুই হাসনি সেখানে ?

ঝাঁকড়া মাথাটা নেড়ে বাবলু জানায়—না।

: তবে জামা কাপড় পেলি কোথায় ? কাল তো পালিয়ে গেলি আমার শায়া পরে।

: এগুলো মশলামুড়ির। আমার সব কথা শুনে একদিনের ভেঁটে খার দিয়েছে ও। বোদি, আমি এখানে থাকব—ও বাড়ি যাব না কিন্তু।

ওর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে কামিনী বলে : ছি বাবলু, ওকথা বলতে নেই। ওঁরা বাপ মা, ওঁরা গুরুজন। ওঁদের কাছেই থাকতে হবে তোমাকে।

: তুমিও তো গুরুজন—দাদাও তো গুরুজন।

: সে তো ঠিক কথাই। তবে বাবা বলেছেন আমাদের ডিউটি ভাগ হ'য়ে গেছে। তুই বাবা মাকে দেখবি, আমি দেখব তোর দাদা আর গোরাকে। তোর দাদা ভালো হয়ে গেলেই আবার আমরা সব এক হব।

বাবলু বড় বড় চোখে মাতৃসমা বোদির কথাটা প্রণিধান করবার প্রয়াস পায়।

: কি রে পারবি না ?

: কিন্তু দিদিরাই তো দেখতে পারে বাবা মাকে। তাছাড়া সবাই এক সঙ্গে থাকলে ক্ষতি কি হ'ত।

: ক্ষতি হ'ত। সব কথা তো তুই বুঝবি না ভাই। কি রে পারবি না বাবা মাকে মানুষ করতে ?

বাবলু গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ে। এগারো বছরের বাবলু বাপমাকে মানুষ করার দায়িত্ব নেয়। পকেট থেকে কিছু খুচরা পয়সা বার ক'রে বলে : এটা নাও। আর নতুন কত প্যাকেট বানিয়েছ দাও।

কামিনী পরসটা নিতে পারে না। বলে : ও পরসা তোয় কাছেই থাক বাবলু। তোদের সংসারে খরচ করিস। মাকে সব কথা খুলে বলিস। তাঁকেই পরসটা দিস্।

: মাকে বল্লে মা আমাকে চানাচুর বিক্রি করতে দেবে না।

: তবে দিদিকে দিস্। আর বলিস সমস্ত কথা খুলে। বুঝেছিস ?

: ওর। সবাই সমান। জানতে পারলে রক্ষা রাখবে না কি ?

: না রে! কথাটা এখন বলে দেওয়াই দরকার। আমিই বলতে চেয়েছিলাম—কিন্তু বলা হয়নি। তুই বল্লে হয়তো সব মিটে যাবে। বলবি তো ?

: আচ্ছা বলব এখন। তাহলে নতুন প্যাকেটগুলো দাও।

: আর ভাজিনি আমি।

: তবে কালকের সেই ফেরত দেওয়া প্যাকেটগুলোই দাও।

কামিনী চুপ করে থাকে। বাবলু রান্নাঘরের ও কোনা থেকে মাটির হাঁড়ি উবুড় ক'রে বার করে প্যাকেটগুলো।

কামিনীর মনে পড়ে যায়—‘তোমার রোজগার করা অল্পে যদি আমি ভাগ বসাই তবে সে অল্প আমার কাছে গোমাংস!’

: ওগুলো নিস্নে বাবলু।

: বারে! তুমি নতুনও ভাজবে না—পুরানোগুলোও দেবে না। তবে আমার বিক্রি বন্ধ থাক্ কালকে!

কামিনী চুপ ক'রে থাকে। কি বলতে পারে সে? কি করেই বা বোঝাবে তাকে—কেন সে আজ আর সাহায্য করতে পারে না এই ক্ষুদ্রে ব্যবসায়ীকে।

: কাল তাহলে এসে নতুন প্যাকেট নিয়ে যাবো। বেশী করে ভেজে রেখ কিন্তু।

কামিনী ধীরে ধীরে বলে : আমি আর চিড়ে ভাজব না বাবলু!

বাবলুর মুখের ভাব বদলে যায়। অক্ষুটে বলে : ভাজবে না? ও

ভাজবে না! তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেলে : তবে আমার ব্যবসা উঠে যাক। আমরা না খেয়ে মরি! তাড়িয়ে দিলে বাড়ি থেকে—কিছু বললাম না। টাকা নিলে না তাও কিছু বললাম না—ভাজা প্যাকেটগুলো চাইলাম তাও দিলে না! এখন বলছি চিঁড়ে ভেজে দেবে না। আমি কি নিজে ভাজতে পারি? তুমি কি চাও আমরা সবাই না খেয়ে মরি!

কামিনী ওকে বুকে টেনে নেয়। অব্যক্ত যন্ত্রণায় হ হ করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। ভারী গলায় ওকে বলে : আজ তুমি অনেক কথাই বুঝবি না বাবলু। বড় হ'লে যখন এসব কথা মনে পড়বে তখন অন্তত এটুকু বিশ্বাস করিস তোরা বৌদি কখনও কোন মন্দ কাজ করেনি। আমাকে আর কাদাসনে বাবলু। বাড়ি যা! ঠাকুরঝিকে বলিস চিঁড়ে ভেজে দিতে।

বাবলুর রাগে একতিলও কমে না এ কথায়। হ্রস্ব অভিমানে চানচুরের প্যাকেটগুলো মেজের ছড়িয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় সে ঝড়ের মতো।

সেই শেষ।

আর আসেনি বাবলু!

কামিনী অবাক হ'য়ে যায়। বাবলু নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে গেছে নমিতাকে চিঁড়ে ভেজে দিতে। কথা প্রসঙ্গে সবই জানাজানি হ'য়ে যাওয়া উচিত। আজ সাত দিন হ'য়ে গেছে। এতদিনে নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন ওরা কি ভাবে রোজগার করত ওরা দেবর-বৌদি। তবু এল না নমিতা অথবা লতু বৌদির কাছে ক্ষমা চাইতে। একবার বাবলুকেও পাঠালো না জানতে অনিমেষ কেমন আছে! কারও যেন কোনও দায়িত্ব নেই। এই ছুতো ক'রে বেকার পুত্রকে ফেলে পালিয়েছেন ওরা ধার্মিক সেজে! কামিনী গলায় দড়ি দেবে তবু গিয়ে দাঁড়াবে না সেখানে ভিখারীর বেশে! কখনই না!

কলোনীর প্রায় কেন্দ্রস্থলে একটা লম্বা টিনের ঘর। দেওয়াল, জানাল, দরজা, ছাদ সমস্ত টিনের। এটি মেয়েদের স্থল। দারুণ গ্রীষ্মে যখন টিনের নিচু-চালার তলায়, ছাত্রীদের ব্লাউস-ব্রক ভিজে ওঠে তখনও নিরবচ্ছিন্ন

ধারায় চলতে থাকে অধ্যয়ন-অধ্যাপন। আবার যখন টিনের চালে পড়ে চড়বড় করে ঝুটি তখনও ছাত্রীরা মুখস্থ করতে থাকে—‘মাক্রিকার উত্তরে সাহারা মরুভূমি...পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি!’ ছাত্রীদের অধ্যয়নই যখন উপশ্রব। তখন কঠিন উপশ্রবই করছে তারা বলতে হবে। অগ্নিকুণ্ডের উপর উপবেশন করে যদি গাজনের সন্ন্যাসী মোক্ষপথের পাশপোর্ট পায় তবে এই টিনের চালার দাবদাহে অর্ধসিদ্ধ কোমলাঙ্গী মেয়েগুলি নিশ্চয়ই আশা করতে পারে, যা সরস্বতী খুলীমনেই ওদের অন্তত পাশ মার্কটা পাইয়ে দেবেন। দুর্ভাগ্যবশত এ ব্যবস্থাটায় খুলী হ’তে পারেন নি সুরেশা ঘোষ—মেয়েস্কুলের নবনিযুক্ত হেডমিস্ট্রেস।

এই নিয়মই কথা হচ্ছিল টিচারস্ ক্রমে। হেডমিস্ট্রেস সুরেশা দেবীর বয়স অল্প; কিন্তু রাশভারী মহিলা তিনি। শোনা যায় যে বড় ঘরের মেয়ে সখ ক’রে চাকরি করতে এসেছেন। তিনিই বলছিলেন: আপনারা কি বলেন? আমি আজ ছ’মাস হ’ল এসে চার্জ নিয়েছি, কিন্তু স্কুলের হালচাল দেখে বুঝেছি এর উন্নতি হওয়া দুঃসাধ্য। এক একটা পায়রার খোপের মত ঘরে গাদাগাদি ক’রে বসে ছাত্রীরা। একটা ম্যাপ নেই, লাইব্রারী রেফারেন্স নেই, টিচারদের বসবার চেয়ারের পায়া ভাঙা, নিচু ক্রাসে বেঞ্চি পর্যন্ত নেই। তাছাড়া এই টিনের চালার উত্তাপে মেয়েদের পক্ষে পড়ায় মন দেওয়াও কষ্টকর। আমি ওয়েলফেয়ার অফিসারকে বহুবার বলেছি; কিন্তু কোনই ব্যবস্থা হয়নি। এ ক্ষেত্রে কি করণীয়? আপনারা কি পরামর্শ দেন?

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। এ রকের শোভনাদিই বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনিই উঠে দাঁড়ান: কথা তো নতুন নয়। আমাগো ইস্কুলের আজ পাঁচ বছর এই হাল। কর্তৃপক্ষ যখন শুনতাহেন না তখন আর কি করন? এমনিই চলুক।

: এটা তো সহজ যুক্তি। কিন্তু যেটা চলা উচিত নয়—সেটা এতদিন চলেছে বলেই তো তাকে চিরদিন মেনে নেব না আমরা।

: তবু কি ইস্কুল বন্ধ কর্যা দিবার কথা কন না কি?

: দরকার হ'লে তাও করতে হবে।

অল্প আলোচনার পরেই কিছু বোকা গেল প্রধান শিক্ষকজীর সঙ্গে এ বিষয়ে অস্তান্ত সকলে একমত নন। এই টিনের ঘরখানি আছে বলে মাস গেলে গ্রাসাচ্ছাদনের যা হ'ক একটা ব্যবস্থা হয় এঁদের। ঘেরেগুলো তবু কিছু লেখাপড়া শেখে, গৌন হ'লেও, সেটাও ত ধরতে হবে। স্কুলকে যদি উনি উন্নত করতে পারেন তো করুন—কিন্তু উন্নত করতে গিয়ে যদি স্কুলটা বন্ধই ক'রে দিতে হয় তা'হলে আর উন্নতি কি হ'ল? হেডমিস্ট্রেস্ স্পর্টাই বিরক্ত হলেন। আলোচনা সেখানেই বন্ধ রেখে রওনা হলেন বাড়ির দিকে। শোভনাদি মৈত্রেরীকে জিজ্ঞাসা করেন : ঘর বাইত। না ?

: যাইতাম না? এইহানো বইয়া করবামটা কি?

একে একে সকলেই রওনা হ'য়ে পড়ে। ডি. ব্রকের নথিতা চক্রবর্তী নূতন চাকরি পেয়েছে। প্রথম মাসের মাইনেটাই আগাম নিতে হয়েছে। আজকের আলোচনায় বেচারী দমে গেল। অনেক আশা ভরসা নিয়ে এসেছে সে চাকরি করতে। এই চাকরিটি দিয়েই সে রক্ষা করবে একটা গোটা পরিবারকে। অঙ্ক বাপ, বৃদ্ধা মা, ছোট ভাই বোনদের। তাছাড়া মাসিক কিছু সাহায্য করতে হবে দাদাকে, বতদিন না সুস্থ হয়ে ওঠে সে। নিজের অন্ত দুঃখ নাই তার। একলা মানুষ হ'লে কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু সমস্ত পরিবারটার কথা ভেবে মনটা ভারি হয়ে উঠল। নিজে সে বিবাহ করবে না— অঙ্ক বাপের পরিচর্যায় বিকিয়ে দেবে জীবনটা; কিন্তু লভু? কে বলবে পনের বছরের মেয়ে? না বেড়েছে দেহে, না মনে। এখনও কিশোরী বালিকার মত পাড়ায় পাড়ায় ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়।

পায়ে পায়ে সে বাড়ির দিকে চলে আসে। হঠাৎ ভীষণ রাগ হ'য়ে গেল হেড মিস্ট্রিসের উপর। কি দরকার বাপু আপনার একটা গড়া জিনিস ভেঙ্গে দেওয়ায়? সখের চাকরি করতে এসেছেন, ভালো না লাগে তাহ'লে রিজাইন দিয়ে বাড়ি চলে গেলেই পারেন। কিন্তু লজ্জটাকে এবার শাসনে আনতে হবে। এমন পাগলির মত পাড়ার পাড়ায় বেড়াতে দেওয়া উচিত

নয়। বাবা মাকে সে কোনও দিনই মানে না—দিসিকেই বরং ভয় করে তবু একটু। লতুর আদর আবিহারও সহ করতে হ'য়েছে অনেক নমিতাকে। সব জিনিসেরই কিছু সীমা থাকা উচিত। লতুরও বোঝা উচিত সে আর ছেলেমানুষ নেই। এভাবে ছেড়ে দিলে বিপদ হ'তেই বা কতকণ? অবশ্য লতু খুব চালাক মেয়ে। বাংলা উপক্ৰাস পড়ে পড়ে অনেক কিছুই বুঝে ফেলেছে সে। তবু সাবধানের মার নেই।

: কে, লতু বুঝি?

: না বাবা, আমি।

: ও নমু। লতু কোথায় রে? ছপুর বেলা সেই ঘে বেরিয়েছে এখনও এল না তো?

নমিতা চুপ ক'রে থাকে। স্বান ঘরে গিয়ে দেখে জলটাও তুলে রেখে যায়নি লতু। এক ফোঁটা জল নেই বালতিতে।

বিন্দুবাসিনী বলেন : ওমা একটুও জল নেই? আমি দেখছি।

: থাক্ আমিই নিয়ে আসছি, দাও।

মায়ের হাত থেকে বালতিটা নিয়ে নমিতা বেরিয়ে যায়। টিউব ওয়েল অনেকটা দূরে। ভীষণ রাগ হয় লতুটার উপর। কচি খুকি তো নয়। সারাদিন ফুলে গরমে সেজ হ'য়ে দিদি ফিরবে—অথচ ঘরের একটি কাজও ক'রে রেখে যায়নি। হয় মা, নয় দিদি কেউ ককক! সকালবেলা যে হেঁড়া কাপড়খানা কেচে জলচৌকির উপর রেখে গিয়েছিল সেখানাও মেলে দেওয়া হয়নি। ফলে ফুলের ফস। কাপড়টা ছেড়ে রাখবার উপায়ও নেই। আর কেউ না জাহুক মা তো জানে ওর বাইরে বেরবার জন্তু এই একখানা মাত্র শাড়ি। এটি কিনতে বাধ্য হ'য়েছে সে চাকরি পাওয়ার পর। মায়ের নাকছাবিটা হারাতে হয়েছে এজন্তেই। অথচ কেউ সংসারের কথা একটু ভাবে না! অল্পদিন ফুল থেকে কিরে সে এখানা ফুলে রাখে। সন্তর্পণে ভাঁজ ক'রে রেখে দেয়। পরে হেঁড়া শাড়িটা। আজ বাধ্য হ'য়ে এটাই পরে থাকতে হ'ল।

ডি/১১৪১ নম্বর বাড়িখানায় সম্মতি উঠে এসেছেন হরিপদ পণ্ডিত।

বাড়িটার গির্জার মেডেল পর্বত পীথা হয়েছিল। অর্থাৎ দরজা জানালার মাথা পর্বত। ছ-খানি ঘর। ‘ওয়েল-কেয়ার অফিসারের’ অল্পগ্রহে এর মাথার ধান-কয়েক করোগেটেড টিন চাপাতে পেরেছেন পণ্ডিত। ঘরের ভিতর চুকে তাই ভালো করে মাথা খাড়া ক’রে উঠে দাঁড়ানো যায় না। হরিশবাবু ডেসার্টার, বাড়িটা তিনি শেষ করেন নি বটে কিন্তু কয়েকটি গাঁদা ফুলের চারা গাছ লাগিয়ে গেছেন। শুকিয়ে রয়েছে সেগুলো। লাগিয়েছিলেন কয়েকটা রজনীগন্ধাও। ফুল ধরেনি তাতে। সবুজ সতেজ ডাঁটা বেরিয়ে এসেছে তার ভিতর থেকে। তার মাথায় ঈষৎ লালচে-সবুজ কলির গুচ্ছ। আষাঢ় মাস পড়ে গেছে—তবু ফুল ধরেনি অমৃতের গাছে। সব গাছে যখন ফুল বরাবর সময় হ’য়ে এল তখন ফুল ফোটাতে বোধ হয় লজ্জাই পাচ্ছে ওর চারা গাছ। ভাবে নমিতা—নিজের দিকে চেয়েই।

হাত মুখ ধুয়ে এসে বসে বাপের কাছে।

প্রশ্ন করে : খেয়েছ কিছু ?

: এখন আবার খাই না কি আমি ?

ছজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। শেষে বৃদ্ধ বলেন : বাগানে যাবি না ? চল ডাঁটা গাছগুলোর তলায় আগাছাগুলো তুলে দিই গে।

হরিশ মিত্রই লাগিয়েছিলেন ডাঁটা গাছগুলো।

নমিতা হেসে বলে : সে আমিই তুলব এখন রবিবারে। তুমি যেন তুলতে ব’স না। তাহ’লে আগাছা বলে ডাঁটা গাছগুলোই তুলে ফেলবে শেষে।

বৃদ্ধ হাসেন। তারপর আবার বলেন : তুই একটু বুঝিয়ে বলিস লতুকে। কি খিজির মত সারাদিন খালি ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ভালো লাগে না একটু। আমার কথা শোনে না—তোমার মায়ের কথা তো কানেই তোলে না—কলোনীর ছেলেকের তো জানিস ! অতবড় মেয়ে—বদনাম রটতে কতক্ষণ !

নমিতা প্রশ্ন করে : বাবলু এসেছিল আজ ?

: ওই আর এক ছেলে ! হতভাগা কোথাকার ! আজ সন্ধ্যায় হ’য়ে গেল

—এলনা একবার এ বাড়ি! লতুর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল রাত্তার। লতুকে বলেছে—সে স্বেই আছে—আসবে না এ বাড়ি।

: এটা বোদির ভারি অস্তায়। এভাবে বাবলুকে আটকে রাখা।

: কিন্তু সেই বা কি করে? অহু তো বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। বাড়িতে আর দ্বিতীয় প্রাণী কে আছে যে জলটা তুলে আনে—বাজারটা ক'রে দেয়। থাক বাবলু ওখানেই।

বিন্দুবাসিনী যোগ দেন : কিন্তু ওখানে থাকলে তো ও মানুষ হবে না। তুমিই তো আসবার সময় অহুকে বললে বাবলুকে মানুষ করবার জন্য আলাদা হ'চ্ছি আমরা!

বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন : অহুহু মানুষটাকে সত্য কথা বলে এলেই কি খুশী হ'তে তোমরা?

নমিতা বলে : কিন্তু তাই বলে বাবলুকে কি একবার খোজ নিতেও পাঠাতে পারত না এ দশ দিনে?

বৃদ্ধ চুপ করে থাকেন। তারপর আবার প্রশ্ন করেন : টাকাটা পাঠিয়েছিস?

: হ্যাঁ বাবা।

: কবে?

: আজই।

: অহু কেমন আছে?

: তা তো জানি না।

: তা তো জানি না! কে নিয়ে গিয়েছিল টাকাটা। তুই না লতু?

: আমি মনি-অর্ডার করেছি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন বৃদ্ধ : কাজটা ভালো করিসনি নমু। লতুকে পাঠালেই পারতিস। অহুটা কেমন আছে জেনে আসত।

: সেও তো একটা খবর পাঠাতে পারত? তারও তো উচিত ছিল বাবলুকে এ বাড়ি পাঠিয়ে তোমাকে একটা খবর দেওয়া!

নীরব থাকেন চক্রবর্তী।

বিন্দুবাসিনী যোগ দেন : তার নিজেরই আনা উচিত ছিল বাবলুর হাত ধরে। অভাবের তাড়নায় অন্তায় যদি করেই থাকে কিছু—তার কি উচিত ছিলনা তোমার কাছে কমা চেয়ে আমাদের কিরিরে নিয়ে যাওয়া ?

নমিতাও কি একটা বলতে যাচ্ছিল, চুপ ক'রে গেল। একজন অপরিচিত যুবক এগিয়ে আসছে ওদের বাড়ির দিকে। হঠাৎ হাত তুলে নমস্কার করে। নমিতাও প্রতিনমস্কার করে। যুবকটির দেহাবয়ব সুগঠিত। চুলগুলি অশ্রুবিমুক্ত। জামাটার হাতা অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। চোখে চশমা—খালি পা। নমিতা একটা মোড়া এগিয়ে দেয়। বিন্দুবাসিনী উঠে যান ভিতরে। যুবকটি বলে : নমিতা চক্রবর্তী কার নাম ?

উত্তর দেন বৃদ্ধ : কে ?

প্রতি প্রশ্ন করে ভূষণ : আপনিই হরিপদ চক্রবর্তী মশাই ?

: হ্যাঁ, বহুন। আপনি ?

বসেই ছিল যুবকটি। বলে : আমার নাম ভূষণ, ভূষণ রায়। এ ব্লকে ৭২৪নং প্লটে থাকি আমি। তা আপনার ঠিকানা শুনেছিলাম ২০৭ ?

: হ্যাঁ, আমরা সম্প্রতি উঠে এসেছি।

: ও। দেখুন আমি এসেছিলাম আপনার মেয়ের কাছে। নমিতা দেবীর কাছে। আপনিই আশা করি।

নমিতা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকে।

: ক'লকাতায় গোলদিঘীর ধারে হকাস কর্নারে আমার একটা দোকান আছে। রেডিমেট-ক্লক, ব্লাউস, ইজেরের দোকান। আপনাদের মত মেয়েদের দিয়ে আমরা জামা কাপড় বানিয়ে নিই। বিক্রি করি সেই দোকানে। অনেক মেয়ে আমাদের সরবরাহ দেয়। যারা সেলাই করতে জানে, সময়ও আছে যথেষ্ট, অথচ নেই মূলধন অথবা বিক্রি করার ব্যবস্থা, তারা এভাবে আমাদের সাহায্য করে। বিনিময়ে আমরাও মজুরি দিয়ে সাহায্য করি তাদের। আমার আছে কাপড়, আছে দোকান—আপনার আছে সেলাই শিল্প, আছে অধ্যবসায় ; আমি—

ওকে ধামিরে দিবে নমিতা বলে : প্রথমত আমি সেলাই করতে জানি একথা জানলেন কার কাছে ? আর দ্বিতীয়ত আমার অথও অবসর আছে এটাই বা ধরে নিলেন কি করে ?

লোকটি একটুও অপ্রতিভ হয় না, বলে : এবার কঠিন প্রশ্ন করেছেন। আপনার এক নম্বর প্রশ্নের জবাব আমরা জহরী—ঠিক চিনে নিতে পারি। ক’দিন আগে সি. ভি. পি. এন্সলিসনে আপনার কয়েকটি সেলাইয়ের নমুনা দেখি। সেখানেই আপনার ঠিকানা পাই। আর দ্বিতীয়ত অবসর না থাকার কোনও কারণ নেই। সংসারের কাজ ছাড়া দুপুরটা সব গৃহস্থ মেয়ের কাছেই অথও অবসর।

বৃদ্ধ হরিপদ যোগ দেন : নমিতা স্কুলে পড়ায়।

: নমিতা স্কুলে পড়ায়! টিচার! সর্বনাশ! মাপ করবেন—আমি জানতাম না। আচ্ছা আসি আমি।

সত্যিই উঠে দাঁড়ায় ভদ্রলোক। নমিতা ওর ভাবগতিক দেখে হেসে ফেলে। বলে : তা বলে পালাবার কি আছে ?

: আছে নমিতা দেবী, আছে! কিছু মনে করবেন না আপনি—ঐ স্কুল-মাস্টার জীবটিকে আমি শূদ্রী, দস্তী প্রভৃতির পর্যায়েই ফেলি এবং চাণক্য বাক্য স্মরণ করে শত হস্ত দূর দিয়ে চলি—

স্কুলমাস্টার হরিপদ পণ্ডিত কথাটা বোধ হয় সহ্য করতে পারেন না। সংশোধন করে দেন : চাণক্য পণ্ডিত কিন্তু মাস্টার মশাইদের কাছ থেকে শত হস্ত দূরে সরে যেতে বলেন নি—

: কারণ তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন। আমি মূর্খ মানুষ; মাস্টার মশাইদের ভয় করি! ছেলেবেলায় বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—

: তাই বুঝি আজও টিচার দেখলে দাঁড়িয়ে ওঠেন?—বলে নমিতা।

বসে পড়ে কুণ্ডল : নাঃ! আপনি আমাকে আবার বসিয়ে দিলেন দেখছি।

: বসিয়েছি বটে, তবে পথে বসাইনি। যদিও স্কুলে আমার অনেকটা সময়

কাটে, তবু রাঙে আপনার কাজটা ক'রে দিতে পারব। সংসারের অবস্থা ভেঁ
বুঝতে পারেন—যেটুকু আর বাড়ানো যায়।

ভূষণ ঘনিয়ে বসে। নিজের পরিচয় দেয়। ভূষণের আদি নিবাস কুঠিয়া।
কলোনীতে এসেছে একেবারে আদি পৰ্ব্বই। হাউস-বিডিং লোন দিয়ে গড়ে
ভুলেছে একখানা বাড়ি। শ্বল-ট্রেন্ড লোনের অর্ধে স্বক করেছে এই জামা
কাপড়ের ব্যবসা। বাড়িতে আছেন বৃদ্ধা পিসী আর মা-হারা দু'বছরের
মিঠুয়া। একটা হাতকল ছিল। মিঠুয়ার মা স্বালা একা হাতেই ভূষণের
দোকানের জন্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত মাল সরবরাহ করত। অক্লান্ত পরিশ্রম
করত স্বালা। সে মারা যাবার পর পিসীই চালায় কলটা; কিন্তু আজকাল
বৃদ্ধার পক্ষে আর সম্ভব হ'চ্ছে না এতটা পরিশ্রম। মা-হারা নাতনীটাকে মাহুয
করাই কঠিন হ'য়ে পড়েছে তাঁর পক্ষে। তাছাড়া চোখে ছানিও পড়েছে।
এদিকে ক্যাসানও পালটাচ্ছে অনবরত। নূতন নমুনা এনে দিলে তার সেলাই
যুগে 'কাট' বুঝে নিয়ে নতুন জামা কাটার মতো শিক্ষা নেই পিসীর। অথচ
মামুলি জামার চাহিদা গেছে কমে। ফলে ভূষণ বিপদে পড়েছে। দিন কয়েক
আগে উদয়নগরের অনতিদূরে সি. ডি. পি. টাউনশিপে একটা প্রদর্শনী দেখতে
গিয়েছিল ভূষণ। সেখানে ওর নজরে পড়ে কয়েকটি সেলাইয়ের নমুনা।
উদয়নগর কলোনীর নমিতা চক্রবর্তীর হাতের কাজ। খোঁজ নিতে নিতে ঠিক
এসে পৌঁচেছে সন্ধানী ভূষণ।

নমিতা প্রশ্ন করে : স্বালা দেবী কতদিন মারা গেছেন ?

: বছর দুই।

: সে কি, এই যে বয়েন মিঠুয়ার বয়সও দু'বছর।

: হ্যাঁ, মিঠুয়া হবার সময় মারা যায় সে।

: তাহ'লে আবার বিয়ে করেন নি কেন এতদিনে ?

ভূষণ অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে নমিতার দিকে। প্রশ্নটার জবাব
দিতে পারে না। নমিতাই বয়স লজ্জিত হয়। এত অল্প পরিচয়ে এ
রকম ব্যক্তিগত প্রশ্ন করাটা নিশ্চয়ই অপোহন হয়েছে তার তরফে। তাই

তখনে নেবার দল বলে : মানে, মেয়েটাকে তো মারু করতে হবে আপনাকে ।

কৈফিয়তটা নিজের কাছেও খুব জোরদার মনে হয় না । হরিপদ পণ্ডিতও বোধকরি কথাবার্তার ধরনটা ঠিক বরদাস্ত করতে পারছিলেন না, উনি বলে বসেন : সে কথা যাক, এখন সেলাইয়ের কথা কি হচ্ছিল যেন...

নমিতা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আলোচনাটা ভিন্ন পথে মোড় ঘোঁরায় । তাড়াতাড়ি কাজের কথা পাড়ে । কি জাতীয় জামা চাই । আগে তার নমুনা দেখাতে হবে । মজুরি কত পাওয়া যাবে সে কথাও নিঃসঙ্কোচে জেনে নেয় । ব্যবসাই যদি করতে হয় তবে সমস্ত জেনে বুঝে কাজে হাত দেওয়া ভালো । বৃদ্ধ আবার যোগ দেন আলোচনায় : রান্নাবান্না, ঘরের কাজ, তার উপর ছল । এর পরেও কি পারবি ও কাজ ।

নমিতা ভূষণকেই প্রশ্ন করে : কি পরিমাণ মাল সরবরাহ চাই আপনার ?
: ধরণ সপ্তাহে আধ ডজন ব্রুক, ছটা ব্লাউস আর ডজন খানেক ইজের বা সায়া ।

: মাত্র ? এতেই চলবে আপনার দোকান ? এ থেকেই সব খরচ মিটিয়ে চলবে আপনার আমার সংসার ?

: ভুল করছেন নমিতা দেবী । আমার দোকানে অন্তত শ' চারেক টাকার মাল জমে আছে । সেটা তো খাপাতে হবে । আপনাকে দিয়ে কিছু চটকদার মাল বানিয়ে নেব যাতে তাই দেখে লোক দোকানে ভেড়ে । তারপর যখন দাম শুনে পিছপাও হ'বে তখন বার করব আমার ঐ মাল । তাছাড়া আপনার মত অনেক মেয়েই জামা সরবরাহ করে আমাকে ।

আবার শুরু হয় গভীর আলোচনা । সেলাই কলটা পৌছে দিয়ে যাবে ভূষণ কালকেই—সেই সঙ্গে দিয়ে যাবে কিছু নতুন নমুনাও—আর ছিটের কাপড় ।

আলোচনার মাঝখানেই এল লভু । প্রায় নাচতে নাচতেই এল । তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিটা লক্ষ্য হয়নি তার । সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে । এসেই বলে :

এই দিদি, তোকে একটা লোক খুঁজছিল। ঠিক যেমন বলেছিলেন আমি।
চোখে চশমা, কঁকরা চুল।

হঠাৎ ভূত দেখার মতোই ভূষণকে দেখে একহাত জিব কাটে!

ভূষণ বলে: আপনার বোন বুধি? দেখি দেখি খুকি—এদিকে
এসোতো! এ জামাটা বুধি আপনারই করা? প্রশ্নটা নমিতাকে।

খুকি।

লতু একটা বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে চলে যায় ভিতরে।

: কি হ'ল? —বিস্ময় কুটে ওঠে ভূষণের চোখে।

: আপনি ওকে খুকি বলেছেন, তাই। উনি হ'চ্ছেন শ্রীমতী লতিকা
দেবী!

: ও হো হো! বড় ভুল হ'য়ে গেছে তো! এই দেখুন—লেখা পড়া তো
শিখিনি—তাই বিজ্ঞানাগর মশায়ের উপদেশটা মনে থাকে না 'কানাকে কানা
বলিও না, খুকিকে খুকি বলিও না'।

হরিপদ চক্রবর্তী জাত মাষ্টার। ভুল উদ্ধৃতিটা আবার সংশোধন ক'রে
দেন তিনি: না না, বিজ্ঞানাগর মশাই ঠিক ও কথা বলেন নি।

ভূষণও মেনে নেয়, বলে: আজ্ঞে না, তিনি পণ্ডিত মানুষ, কানাকে কানা
বলবেন কেন? তিনি কানাকে বলতেন পদ্মপলাশলোচন, খোঁড়াকে বলতেন
তেনজিং নোরকে আর খুকিদের বলতেন শ্রীযুক্তেশ্বরী ঠানুদিদি মহাশয়া।

সশব্দে হেসে ওঠেন বৃদ্ধ পণ্ডিত। নমিতাও মুখ নিচু করে হাসি গোপন
করতে। আর পাশের ঘরে ফুলতে থাকে লতু। আচ্ছা এর শোধ সে নেবে।

নমিতার যেন নতুন জীবন শুরু হ'য়েছে। উদয়াস্ত পরিভ্রম। সকালে,
বিকালে, রাত্রে খচখচ খচখচ ক'রে কল চালায়। সুবালার কলটা পৌছে
দিয়ে গেছে ভূষণ নমিতাদের বাড়ি। প্রথম সপ্তাহের শেষে ভূষণ এসে জামা-
কাপড়গুলো হাতে নিয়ে কি খুসী। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে নমিতার
শিল্পকে। বলে,—এ রকম জিনিস দিতে পারলে বত দেবেন ততই নেব আমি।

আর কাঁটতি বাড়লে আমারও লাভ আপনারও লাভ।

: নিশ্চয়ই। পরস্পরের সাহায্যের জন্যই তো এ ব্যবস্থা।

নমিতা একটু ইতস্তত করে। মজুরিটা কবে নাগাদ পাওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করা দরকার, কিন্তু এ পার্থিব প্রশ্নটা করতে কেমন যেন মন সরছে না। বিমুগ্ধ ভূষণ একটির পর একটি ছায়া পাট ভেঙ্গে দেখল আর সত্যিকারের শিল্প সমালোচকের মতোই প্রশংসা করল—ঠিক তার পরেই মজুরির কথাটা তোলা কেমন যেন বেমানান লাগে।

বিন্দুবাসিনী এসে দাঁড়ান দ্বারপ্রান্তে।

নমিতা বলে : আমার মা।

ভূষণ পায়ের ধুলো নিয়ে বলে : আজ আসি তবে ?

বিন্দুবাসিনী বলেন : এখনি যাবে ? তাড়া আছে কোন ?

: না তাড়া আর কিসের ?

: তবে একটু বসে যাওনা বাবা। উনি এখনি এসে পড়বেন। আমি চায়ের জলটাও বসিয়ে দিই।

ভূষণ বলে : আপনার মেয়ের সেলাইয়ের হাত ভারি সুন্দর। আমার দোকান তো ডুবতে বসেছিল। এ যাত্রা বোধহয় উনিই রক্ষা করলেন।

নমিতা প্রতিবাদ করে : সে কি কথা ভূষণবাবু ? আপনি মজুরি দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। দুঃখীর সংসারে আপনিই বরং সাহায্য করছেন। আপনিই বাচালেন আমাদের।

লতু দরজার ওপাশ থেকে বলে : তবে বোধহয় দুটি প্রাণই দুজনের জন্য বেঁচে আছে !

ওরা চমকে ওঠে। ভূষণ বলে : কে ঠান্ডি না ?

নমিতা জবাব দিতে পারে না। সেলাইয়ের কাপড়গুলো নিয়ে ঢুক পড়ে ঘরে। দেখে লতু বালিশে মুখ গুঁজে হাসছে। নমিতা বলে : একেবারে গোম্মায় গেছিল তুই। কাকে কি বলতে হয় তাও জানিস না।

জবাব দেবার মত অবস্থা নর লতুর। সে ভুগরে ভুগরে হাসছে খালি।

সেলাইগুলো ওর দিকে এগিয়ে নিয়ে নমিতা বলে : নে, এগুলো বেঁধে দে ।
আমি চারের জলটা বসিয়ে দিই ।

লতু বলে : দায় পড়েছে আমার !

নমিতা চলে যায় । লতু কি ভাবে এক মিনিট । তারপর কাগজ কলম
টেনে নিয়ে চট ক'রে কি যেন লেখে । কাগজটা ভাঁজ ক'রে বেঁধে দেয় একটা
ব্রাউসের ভিতর । তারপর সবগুলো পাট ক'রে বেঁধে দেয় ।

ভূষণ একাই বসে ছিল বাইরে । বিশ্বাসিনী সন্ধ্যা জালতে উঠে গেছেন ।
হরিপদ এখনও ফেরেননি । এককাপ চা আর দু'টো নারকেলের নাড়ু
একটা প্লেটে নিয়ে প্রবেশ করে নমিতা । প্যাকেটটাও এগিয়ে দেয় ।

ভূষণ বলে : একটা কথা । ঐ হনুদ রডের বেবি ক্রকটার কিন্তু মজুরি
পাবেন না ।

: কেন ? আমার অপরাধ ?

: ওটা মিঠুকে দেবে তার মাসিমা ।

: ও, তা বেশ তো । তাহ'লে কিন্তু একটা সর্ভ আছে । মিঠুকে নিয়ে
আসতে হ'বে । তার মাসিমাই নিজের হাতে দেবে জামাটা ।

ভূষণ রাজি হয় । পরের দিন মিঠুকে আসবে বলে কথা দেয় । তারপর
ভূষণ বলতে থাকে তার সংসারের কথা । সুখ দুঃখের ইতিহাস । ক্রমে ওঠে
কলোনীর সামগ্রিক ভালমন্দের কথা ।

রবিবারে মিটিং করা হ'চ্ছে । সকলকে বোলো আনার ডাকে আসবার
জন্ত আহ্বান করা হ'য়েছে । সেখানে ইচ্ছা করলে নমিতাও যেতে পারে ।

নমিতা বলে : আমি কেন ? আপনারাই ও সব করুন ।

ভূষণ মাথা নাড়ে । বাগাড়ম্বর ক'রে বোকাতে চায়—মেরেরাও এগিয়ে
না এলে কিছুতেই কিছু হবে না ।

ক্রমে হরিপদও এসে যোগ দেন আলোচনার ।

লতু কিন্তু আসে না ।

ভূষণ চলে গেলে নমিতা বলে—তুই যে লুকিয়ে বসে থাকলি ?

: তবে কি নাচব তোমার ঐ ভূষণীকাকের সামনে গিয়ে?

নমিতা হেসে ফেলে: তাতেই বা দোষ কি? তুই তো ওর কাছে এখনও থুকি!

: ভাল হ'চ্ছে না কিছু দিদি! ও, কী আমার আপন জনরে! মিঠুর জন্তে জামা ক'রে দেবে তার মাসি! কেন, মাসি কেন? পিসী হ'তে কি দোষ?

খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে নমিতা: ও, তা বুঝি জানিস না? ঐ ভূষণীকাক বে বলে গেছে মিঠুকে শিথিরে দেবে তোকে 'মা' ডাকতে। তোকে মা ডাকলে তো আমাকে মাসিই ডাকতে হয়।

হুম করে একটা কিল মারে লতু দিদির পিঠে।

খেলার মাঠের ধারে রবিবার বিরাট জনসমাবেশ হ'ল।

ভূষণ অথবা যোগেনের আশার সীমারেখা ছাড়ালো জনসংখ্যা। প্রগল্ভা নিয়ে আলোচনা হ'ত যথেষ্টই। চায়ের দোকানে, বাজারে, স্টেশনে অপেক্ষমান জনতার মুখে মুখে রোজই ফেরে নানান অভিযোগের কাহিনী। একপক্ষ অভিযোগ করে, অপর পক্ষ ধৈর্য ধরে সবটা শোনে না—তার আগেই সে পেশ ক'রে বসে তার অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলিত হ'য়ে গাল পাড়ে তৃতীয়পক্ষকে। সে তৃতীয়পক্ষ কখনও কলোনী পঞ্চায়েতের কর্তা ব্যক্তির, কখনও সরকার, কখনও বা স্বয়ং ভগবান। তৃতীয় অভিযোক্তার কথা জানি না তবে বাকি কজন সে গালকে গ্রাহ্যও করে না। আজ সভা ক'রে গালপাড়া হ'বে শুনে ওরা উৎসাহভরে সবাই জমায়েত হ'ল।

প্রথম ও দ্বিতীয় অভিযোক্তা তৃতীয় অভিযোক্তার মতোই রইলেন অল্পপন্থিত। সভায় বক্তারা একে একে অভিযোগ পেশ করতে লাগলেন। কি কি চাই—তার একটা লম্বা ফিরিস্তি করা হ'ল। স্কুলের পাকাঘর, পাকা-রাস্তা, নূতন টিউবওয়েল, পুরানো নলকূপগুলির সংস্কার।

আর চাই কাজ! কর্ণের বিনিময়ে গ্রামাচ্ছাদন। অশক্তদের ক্রি ডোল।

মতিবিড়ি ক্যাক্টারির জীবন চাকি বলে : সবার আগে বাইক্যা দিতি
অইব অগোর পকাইং ।

: বাংতে অইব কি কও ? অগো তো বাইক্যা দিছিই ! ও পকাইংরে
আমরায় মানি না ।

একটা বন্দোবস্ত বোধহয় আগের থেকেই করা ছিল ; পিছন থেকে
কে চিংকার ক'রে ওঠে 'কলোনী পকায়েং—'

অনেকগুলি কণ্ঠ ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে—'ধ্বংস হোক !'

বারবার তিনবার । ক্রমশঃ কণ্ঠস্বর বাড়ে ।

: পকায়েতের বিধান—

: মান্বনা, মান্ব না !

ষোগেন নারেক উঠে দাঁড়ায় । বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলে : ভাইসব ! আপনারা
সকলে একবাক্যে জানিয়েছেন যে বর্তমান পকায়েতকে আপনারা মানেন না ।
কেন মানেন না তা বিস্তারিত বলার দরকার নেই । এ পকায়েতের পক্ষপাতিত্বের
কথা, আত্মীয় পোষণের প্রচেষ্টা, ঘুষ খাওয়ার কেচ্ছা সবাই জানেন, আমরা
আশা করেছিলাম—তাদের কেউ কেউ এ সভায় আসবেন । এলে আমরা
আমাদের অভিযোগ পেশ করতাম । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সনির্বন্ধ
নিমন্ত্রণ উপেক্ষা ক'রে তাঁরা এখানে অনুপস্থিত ।

সভায় একটা গুণ্ডগোল হয় । কেউ বলে : অইব কুইথ্যাক্যা ? অইলে
হালাগো কৈফিয়ৎ দিতি হইব না ?

: ঘরের মধ্যই অগো যতো বিক্রম—সভায় অইবার মুখ আছে নাকি ?

ভূষণ প্রভৃতি 'চূপ করুন, চূপ করুন,' ক'রে থামিয়ে দেয় গুণ্ডগোল ।
ষোগেন শুরু করে : সুতরাং সে সব স্তম্ভকারজনক আলোচনা থেকে আমরা
বিরত রইলাম । আমরা মেনে নিচ্ছি এ সভায় সকলেই বর্তমান পকায়েতের
উপর আস্থা হারিয়েছি । আমরা এ পকায়েত ভেঙ্গে দিতে চাই ।

সভায় সমর্থনসূচক সমবেত কণ্ঠস্বর শোনা যায় ।

প্রমোদের গলিটিক্স করার অভ্যাস আছে, চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে :

এ সভায় এমন কেউ কি আছেন যিনি বর্তমান পক্ষায়েতকেই বহাল রাখতে চান? যদি থাকেন তো হাত তুলুন।

কোন হাতই ওঠে না।

যোগেন বলে : সভাপতি মশাই তা হ'লে লিখে নিন—এ সিদ্ধান্ত ২ বর্ষসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল।

নিতাই কবিরাজ পূর্বেই সভাপতি নির্বাচিত হ'য়েছিলেন। তিনি কি যেন নোট করেন।

যোগেন পুনরায় শুরু করে : তাহ'লে আমরা আমাদের এ সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষকে জানাব এবং দাবী করব বর্তমান পক্ষায়েতকে অবিলম্বে পদচ্যুত করতে। তাহ'লেই প্রশ্ন দাঁড়াবে নতুন কমিটি গঠনের। কলোনীর অন্তত সাত-আট শো লোক এখানে উপস্থিত আছেন। আপনারাই নির্বাচন করে দিন।

মতিবিড়ি ফ্যাকটরির জীবেন চাকি বলে : এখন তিনজনের একটা কমিটি করেন। পরে ভোট নিয়ে পাকা কমিটি করবেন।

কানাই পাল বলে : আমারও তাই মত। আপাতত এ্যাডহক্ কমিটিই করা চলতে পারে।

জুয়ণ বলে : তিনজনের কমিটি, তার একজন হবেন মুখপাত্র বা চেয়ারম্যান। আমি প্রস্তাব করছি বর্তমান সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নিতাই কবিরাজ মশাই চেয়ারম্যান হ'ন—এবং তিনিই বাকি দুজনের নাম বলুন।

সভা একবাক্যে সমর্থন করে।

পিছন থেকে কে একজন চিৎকার ক'রে ওঠে 'নিতাই ঠাকুরদা—'

সমবেত কণ্ঠ : জিন্দাবাদ।

এটাও পূর্বপরিকল্পিত বোম্বহয়।

সভাপতি উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে ওদের থামতে বলেন। 'চুপ চুপ' একটা সাড়া পড়ে যায়। নিতাই কবিরাজ বলেন : আপনারা সবাই যদি চান তাহ'লে যতদিন না নির্বাচন করা জনকল্যাণ কমিটি গঠিত হ'চ্ছে ততদিন এ্যাডহক্ কমিটি পরিচালন করার দায়িত্ব আমি নিতে পারি। কিন্তু জুয়ণ

ভার্যার দ্বিতীয় প্রস্তাবের সঙ্গে আমি একমত নই। বাকি ছুজনেরকে আমি
নমিনেশন দিয়ে স্থির করব না। তাহ'লে বস্তুত সেটা একজনের কমিটিই
হ'য়ে যাবে। আপনাবাই স্থির ক'রে বলুন বাকি ছুজনের নাম।

কে একজন বলে : তাহ'লে একজন আমাদের জীবেন দা। মতিবিড়ি
জীবেন চাকি।

জীবেন তৎক্ষণাৎ উঠে আপত্তি দেয়। তার কারখানার কামেলা ছেড়ে
সে এ দায়িত্ব নিতে রাজি নয়।

: তাহলে ভূষণ রায়। 'এ' ব্লকের ভূষণ বাবু।

সকলেই সমর্থন করে।

আর একজন ?

জীবেন প্রস্তাব করে যোগেনের নাম।

সভাপতি বলেন : যোগেন আর ভূষণ ছুজনেই এ ব্লকের লোক। এটা
ঠিক হ'বে না। তাছাড়া সম্ভব হ'লে একজন মহিলাকে আমরা কমিটিতে
নিতে চাই। মেয়েদের অনেক অভাব অভিযোগ তিনি জানতে ও জানাতে
পারবেন।

হারাগ দেব ভাইপো পরাগ দে বলে : আমি প্রস্তাব করতে আছি যে
আমাগো মাইয়া ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেসকে কমিটিতে লওয়া হউক।

বিশ্বয়ের কথা! সভার সম্মুখে মেয়ে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস বসে ছিলেন।
আর কোনও সরকারী পদস্থ কর্মচারিই অবশ্য আসেননি সভাতে। ক্যাসডোল-
ক্লার্ক মৃণাল আর 'আর ও' সাহেবের ডেসপ্যাচার ক্লার্ক মিহির ছাড়া।
হেডমিস্ট্রেস যে সভাতে উপস্থিত আছেন সেটা ভীড়ের অনেকেই এতক্ষণ
লক্ষ্য করেনি।

হুয়েথা দেবী উঠে দাঁড়ান। জনতাকে মুখোমুখি করা তাঁর অভ্যাস
আছে। কলেজে অনেক সোয়োগে ডিবেটিং সোসাইটিতে বক্তৃতা করতে
হ'য়েছে। পরিকার কঠে বলেন : আপনাদের একজন আমাকে যে সম্মানের
পদে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, আমি সে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারলে

ধন্য হতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার পক্ষে দুটি কারণে তা সম্ভবপর নয়। যদিও কর্মোপলক্ষ্যে আমি এখানকার বাসিন্দা—তবু আমি কলোনীর রেজিষ্ট্রিকৃত লোক নই। দ্বিতীয়ত আমি সরকারী কাজ করি। আপনাদের এ সংগ্রামে আমার সহায়ত্ব প্রতি থাকলেও প্রত্যক্ষ যোগ রাখা সম্ভব নয়। তবে নিতাই বাবুর প্রস্তাবের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কমিটিতে একজন মহিলা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাই আমি প্রস্তাব করি আমাদের স্কুলের শ্রীমতী নমিতা চক্রবর্তীকে আপনারা কমিটিভুক্ত করতে পারেন। তিনি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা।

নমিতা উপস্থিত ছিল সভায়। এ প্রস্তাবে সে একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠল। তবু এটুকু সে বুঝেছে যে এখনই প্রতিবাদ না করতে পারলে আর ভবিষ্যতে পরিত্রাণ পাবে না। উঠে দাঁড়িয়ে সেই কথাই সে বলতে চায়, কিন্তু এতগুলি লোকের দৃষ্টির সম্মুখে কোন কথাই বলতে পারে না। হেডমিস্ট্রেসের দিকে চেয়ে যে কটি অসংলগ্ন কথা সে বলে তার কোনও অর্থ হয় না। হেডমিস্ট্রেস জনতার দিকে ফিরে বলেন : নমিতা সম্মত হ'য়েছে। তাকে এই গৌরবজনক পদ দেওয়ায় সে আমাকে বলছে আপনাদের ধন্যবাদ জানাতে।

সকলে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে।

নমিতা বসে পড়ে।

সভার শেষে ভূষণ এসে উদ্ধার করে নমিতাকে : আপনাকে আর আমাকে যে এরা এভাবে যুক্ত করে দেবে তা ভাবি নি।

নমিতা জবাব দিতে পারে না।

ভূষণ আবার বলে : কী এত ভাবছেন বলুন তো?

: ভাবছি আমারও তো চাকরি আছে স্কুলে। আমাকে কমিটিতে নেওয়া কি ঠিক হ'ল?

: সে দারিদ্র হেডমিস্ট্রেসের। তিনিই আপনার নাম প্রস্তাব করেছেন। সভার বিবরণীতে সেটা লিপিবদ্ধ হ'য়েছে।

: তাছাড়া—

: কি করবেন বলুন ; প্রজাপতির নির্বন্ধ !

নমিতা লাল হয়ে ওঠে ।

ভূষণ তাড়াতাড়ি প্রসন্ন বদলে নেয় । নিতাই ঠাকুরদার কর্মসম্বন্ধটি ওকে বোঝাতে থাকে । পারে পারে দুজনে বাড়ির দিকে ফিরতে থাকে । জনতা মিটিং ভেঙ্গে চলেছে যে যার বাড়ি । কয়েকজন আঙ্গুল দেখিয়ে ওদের দিকে দেখালো । কি যেন বলাবলি করছে সবাই । নমিতা অস্বোয়াস্তি বোধ করে । ওর পাশাপাশি হেঁটে চলতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হয় । মনে পড়ে যায় কেমন অবলীলাক্রমে ভূষণ বলে ‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’ ! লোকটা অসভ্য কিন্তু ।

ভূষণ কিন্তু ক্রক্ষেপ করেনা জনতাকে । সে এক নাগাড়ে বকতেই থাকে । এতগুলো লোকের ভালমন্দ এখন নির্ভর করছে তাদের উপর । এরা বাড়িঘর ফেলে, এসেছে পিছনে । ছিল পি. এল. ক্যাম্প, সেখান থেকে গিয়েছিল পুনর্বাসনে স্বদূর মধ্যপ্রদেশে—আবার ফিরে এসে উঠেছিল শেরালদ’ হাওড়া স্টেশানে । তারপর এসে উঠেছে বর্তমানে উদয়নগর কলোনীতে । উইপোকার মত বারবার গড়ে তুলছে ঘরবাড়ি । ভেঙ্গে যাচ্ছে বারবার । তবু ক্ষেদ নেই এদের । আবার গড়তে চায় এরা নূতন বন্দীক ! প্যানকরা কলোনীতে সারি সারি উইটিপি গড়ে তুলছে এরা । হার মানবে না কিছুতেই !

অনিমেষের জরটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে । বুকের বেদনাটাও । স্বপ্ন সবল জোয়ান মানুষটা ক্রমশই মিশে যাচ্ছে চোকির সঙ্গে । চোয়ালের হাড় দুটো উচু হ’য়ে উঠেছে । চোখটা গিয়েছে বসে । সারা মুখে বেরিয়েছে খোঁচা খোঁচা দাড়ি । সারাদিনই গোঙ্গায় যতক্ষণ জেগে থাকে । তার উপর ক’দিন ধরে জরটা একেবারেই ছাড়ছে না । কাল রাত্রি থেকে আবার তুল বকতে শুরু করেছে । কোটরগত চোখ দুটোর কুটে উঠছে একটা খোলাটে তমসাক্ষরতা । মাঝে মাঝে কামিনীকেও চিনতে পারছে না । কামিনীর রীতিমত ভয় হ’য়েছে । সে বুঝতে পারছে কোনও একটা অনিবার্য পরিণতির

দিকেই ছুটে চলেছে রোগী। বুকে তার পাণ্ডিত্য চাপে আছে, কিন্তু
কান্নার উপায় নেই।

রাত্রি প্রভাত হ'লে অনিমেষের গায়ে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল : ওগো
কিমে পেয়েছে ? থাকে কিছু ?

অনিমেঘ মাথা নেড়ে জানায়—না।

খেতে চাইলে দেবার মত অবশ্য কিছু ছিল না ঘরে।

: খুব কষ্ট হ'চ্ছে কি ?

অনিমেঘ জবাব দেয় না। আচ্ছন্ন মতো পড়ে থাকে। হঠাৎ কামিনীর
উদ্বেগনমিত মুখখানা ঠেলে দিয়ে বলে : দূর হ' ! কেন ডাকছিলাম আমাকে ?
আমি যাবো না !

কামিনী চুপ ক'রে বসে থাকে।

বাবলু সেই প্রথম দিনের পর আর আসেনি। বাবা-মা-দিদিদের নিয়ে
আনন্দেই আছে সে—বৌদির কথা বোধ হয় মনেই পড়ে না। লতু অথবা
নমিতা যে খবর নিতে আসবে না এটা জানা কথা। বাবলুই যখন এল না।
নিজেই যাবে কিনা ভাবতে থাকে। কয়েক দিন আগের একটা ঘটনা মনে
পড়ে যায়।

সেদিন অনিমেষের শরীরটা একটু ভালো ছিল—জ্বরটা কমে গিয়েছিল।
অনিমেঘ জিজ্ঞাসা করেছিল : মাঝে ক'দিন আমার হ'ল ছিল না, নয় ? আচ্ছা
লতু কি বাবলু আসেনি ইতিমধ্যে ?

কামিনী মাথা নেড়ে জানায়—না !

: আশ্চর্য !

হুজনেই চুপ ক'রে থাকে।

অনিমেঘ আবার বলে : দেখ, কাল থেকে মনে হ'চ্ছে—এযাত্রা বোধ হয়
আর বাঁচব না। তোমার কি হবে ?

কামিনীর চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে। অনিমেষের অরতপ্ত
কপোলে। অদ্ভুত সংঘমে সে ধীরে ধীরে বলে : বাবাকে খবর দেব ?

: কখনও নয়! আমার দিব্যি থাকল বউ—আমার প্রাণ থাকতে তুমি সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে না! যেদিন যাবে শাঁখা ভেঙ্গে যাবে।

স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে কামিনী বলেছিল: ওগো তুমি চুপ কর। অনিমেষও যে নিরুদ্ধ অভিমানে এমনি করে ফুলছিল—এভাবে যে তার বহিঃ-প্রকাশ হতে পারে—কামিনীর তা ধারণা ছিল না।

সেই কথাগুলিই মনে পড়ল তার।

সন্ধ্যার দিকে অনিমেষ আর ডাকলে সাড়া দিল না।

কামিনী একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল।

গোরাকে বসিয়ে রেখে বাইরে এল। এখনই কিছু একটা করতে হবে। গলিটা পার হ'য়েই পথচারীদের লুক-দৃষ্টিতে সচেতনতা ফিরে আসে তার। এ কাপড়খানা পরে—আর যাই হ'ক পথে বার হওয়া যায় না। আবার ফিরে আসে। ভিজে গামছাখানা জড়িয়ে নেয় গায়ে। দ্বিতীয়বার পথে বার হ'তেই দেখা হয় বিষ্টুপদর সঙ্গে। পথ আগলে দাঁড়িয়েছে সে।

: কই যাও?

পথ না পেয়ে কামিনী খেমে যায়। জবাব দেয় না।

: অনিমেষটা ক্যামন আছে?

কামিনী সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে বলে: ভালো নাই—দেখুন না এসে।

বিষ্টুপদ উদ্বিগ্ন হবার ভাব দেখায়। দুজনে ফিরে আসে বাড়িতে। বিষ্টুপদ অনিমেষের পাশে গিয়ে বসে। সান্ নেই তার। বিষ্টু নিজেকেই ধিকার দেয়। কী অপদার্থ সে! এমন একটি পূর্ণযৌবনা বধু বাস করছে তার বাড়ির একশ' হাতের মধ্যে—একেবারে অসহায় অবস্থায়—যার স্বামী ডাকলে সাড়া দেয় না—আর বিষ্টুপদ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি?

রান্নাঘরের কাছে গিয়ে বলে: জর যান্ বাড়তেছে লাগে বউ! এমন হৈছে আমারে একডা খবর দাও নাই ক্যান? কোন ডাক্তার ডাখতেছে?

: ডাক্তার? ডাক্তার ডাকব কি ক'রে?

: কও কি? আরে ছি ছি! করছ কি! আমারে কও নাই ক্যান?

কামিনী গায়ের গামছার একটা খুঁট আঁতুলে জড়াতে জড়াতে বলে : আপনার সেই দশ টাকার এক পরসাদ শোধ দিতে পারিনি, আপনাকে ডাকব কোন মুখে ?

বিষ্টপদ হেসে ওঠে, তারপর হঠাৎ ওর চিবুকটা নেড়ে দিয়ে বলে : আমাকে ডাকবা এই টানমুখেই !

বলেই বেরিয়ে যায় ।

কামিনীর চোখ দুটো জলে ওঠে । ইচ্ছা করে উনানের ওপাশ থেকে একখান চেলাকাঠ তুলে নিয়ে বসিয়ে দেয় । কিন্তু বিষ্টপদ তার আগেই বেরিয়ে যায় । রাস্তার মোড় থেকে বলে : লালুবাবুরে ডাইক্যা আনতেছি বৌ !

কামিনী কাঠের গুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে ।

বিষ্টপদ রাস্তাঘরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়ানো বধূটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে । ডাক্তার ডাকতে যেতে তার মন সরে না । উদাস দৃষ্টি-মেলা সুগঠিত-তনু বধূটির সর্বাঙ্গ লেহন ক'রে ফেরে তার কুখিত দৃষ্টি । দক্ষিণ বাহমূল অনাবৃত, হাঁটুর উপরে খানিকটা ফেসে গেছে শাড়িটা । জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের আবরণীতে ঘোবনকে শাসন করতে পারেনি মেয়েটি । বিষ্টপদ কিছুতেই ফিরে যেতে পারে না । সাহস বেড়ে গেছে তার । ফিরে আসে পায়ে পায়ে । কামিনী টের পায় না—উদাস দৃষ্টিতে চেয়েই থাকে উর্ধ্ব আকাশের দিকে !

: বৌ !

চম্কে ওঠে বধূটি !

: ডাক্তারবাবু বাইরের লুক । তোমার এ সজ্জা দেখলি মুনিষ্যবিরও মন টলে । কাপড়খান পালটে পর ।

কামিনী আর স্থির থাকতে পারে না । সে বোঝে তার অসহায়তাকে নিয়ে রসিয়ে রসিয়ে ব্যঙ্গ করতেই ফিরে এসেছে লোকটা ! সামনের দুটো দাঁত নেই । পানরসসিক্ত জিহ্বাটা দেখা যায় মুণের গহ্বরে । চোখে একটা সরীসৃপ-স্বভাব লুক দৃষ্টি । এই ক্লেশাক্ত সরীসৃপটা তাকে ধীরে ধীরে পাকে পাকে জড়িয়ে

কেনছে—এটা বুঝতে কামিনীর কষ্ট হয় না। কঠিনভাবে বলে : আপনিও তো বাইরের লোক। আর পাড়ি থাকলে আপনার সামনেও এ বেশে বের হতাম না নিশ্চয়।

: কি কও! আমি তো ঘরেরই লোক। আমার আর দেখনের বাকি আছে কি। কত দ্যাখলাম, কিরাবার কত জাখবাম।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় বিষ্টপদ।

ওঘর থেকে অনিমেষের আঁর্ত কণ্ঠ ভেসে আসে। রোগ-যন্ত্রণার কাতরাচ্ছে লোকটা। কামিনী ওর পাশে গিয়ে বসে। মাথার হাত বুলিয়ে দেয়। সে বুঝতে পেরেছে এই বার তার চরম পরীক্ষা এসে গেছে। সোনা দানা যা ছিল ঘরে অনেকদিনই ফুরিয়েছে তা, ঘটি বাটিও নিঃশেষিত হয়েছে। যেটুকু সম্পদ নিয়ে সে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এসেছিল তিলে তিলে নিঃশেষিত হ'য়েছে তা। বাকি আছে হাতের একজোড়া শাঁখা আর সীমন্তে এক ফোঁটা সিঁদুর। ঐ নিঃশেষিত-প্রাণ রোগজীর্ণ মানুষটার বুকের একটু ধুকধুকানি। এই সে ভেবে এসেছিল এতদিন। আজ হঠাৎ বিষ্টপদের লুক চোখের আরশিতে দেখেছে আরও এক সম্পদ আছে তার। সে সম্পদ তার নারীত্ব—তার পূর্ণ-যৌবনা দেহখানি। পরীক্ষা, পরীক্ষা! সমস্ত জীবনভর কঠিন পরীক্ষাই দিয়ে চলেছে সে। মাথা উচু ক'রে দেবতার সমস্ত অভিশাপই গ্রহণ করেছে। দুঃখরাত্রে সংসার তরীর-হাল ধরে দক্ষ নাবিকের মতোই পাড়ি জমিয়েছে এতদিন। আজ বোধ হয় চরমতম পরীক্ষা দেবার ভাব এসেছে ওর। নিষ্ঠুর পাষাণ-দেবতা যেন এইবার ওকে ডেকে বলছেন 'বেছে নাও, তোমার স্বামী-পুত্র একধারে, আর অন্যধারে তোমার সতীত্ব ধর্ম। কাকে চাও তুমি, বেছে নাও।'

ছুটে গিয়ে কামিনী দেওয়াল থেকে টেনে নামায় কালিঘাটের পটখানাকে ; বলে : তুমিও না মেরেমাছুষ! হতে পারো দেবতা—তবু মেরে মাছুষ তো তুমি? বল, বল রাঙ্গসী—তোমাকে এ পরীক্ষায় কেনলে তুমি কী জবাব দিতে? তোমারও তো স্বামী পুত্র আছে—তুমিও তো মহাসতী!

: মা! আমার ভয় করছে!

মায়ের উদ্গাদিনী মূর্তি দেখে ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেছে গোরা।

কামিনী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ছেলেকে : ভয় কি মাগিক? এই তো আমি। কোন ভয় নেই। ঘুমাও। ক্ষিদে পেয়েছে?

গোরা নিজীবের মত শুয়ে মাথা নাড়ে : না!

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে কামিনীর। কাল রাত্রেও গোরা কিছু খায়নি। বিকালে খেয়েছিল আধখানা পেঁপে। আজ এত বেলাতেও ওর ক্ষিদে পায়নি। অতটুকু ছেলে পর্যন্ত বুঝেছে মায়ের অসহায়তা। ঘরে কিছু নাই। মাকে করুণা ক'রে মিথ্যা বলছে সে। আর ঐ বিষ্টুপদ, ঐ নির্ভুর ভগবান—তার অসহায়তা নিয়ে উল্লাস করে, ব্যঙ্গ করে। সে মানে না,—ঈশ্বর নাই! মা-কালী নাই! ফটোখানা সে নামিয়ে রাখে।

ওর মনের মধ্যেও জেগে উঠেছে বুঝি কালাপাহাড়—‘থাহ্, ক্লেও তুমি বোবা, তুমি কানা!’

: বো!

উঠে বসে কামিনী। বিষ্টুপদ ফিরে এসেছে। বিষ্টুপদ ওকে ‘বো’ বলে ডাকে কেন?

: ডাক্তারবাবু এসেছেন?

: না আয়েন নাই। এখান পড়্যা লও!

বিষ্টুপদের হাতে একটা লালপাড় তাঁতের শাড়ি।

কামিনী স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

: লও লও! আর মশ'করা ক'র না!

: না!

: না ক্যান? কাপড় পড়বা না?

: না।

জীবের ডগাটা বেরিয়ে আসে বিষ্টুপদের। বলে : ঐ বস্ত্রহরণের গোপনারী সাজ্যাই থাকবা?

মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে কামিনীর। একটা অসহায় আক্রোশে কুলতে থাকে।

বিষ্টপদর সাহস বেড়ে যায়। থপ্ করে কামিনীর হাতখানা ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। ওঁজের দেয় শাড়িখানা ওর শাঁখাসর্বস্ব হাতে।

কামিনী আর সহ করতে পারে না। ঠাস্ করে মারে এক চড় বিষ্টপদর গালে। বিষ্টপদ এতটা আশঙ্কা করেনি। একটা অসহায় মেয়ে, বিবজ্রপ্রায় বধূর এতটা হুঃসাহস হবে তা সে কল্পনাই করতে পারেনি। এগিয়ে আসে একপা। হাত বাড়ায় ঐ নারী-মাংসের দিকে। কামিনী চিৎকার ক'রে উঠতে যায়। এক বিন্দু শঙ্ক বার হয় না তার কণ্ঠনালী দিয়ে। সভয়ে হুঁহাতে মুখ ঢাকে সে। পরমুহূর্তেই একটা ক্লেদাক্ত জান্তব আলিঙ্গনের আশঙ্কায় সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই চিৎকার ক'রে ওঠে গোরা ‘—মা!’

বিষ্টপদ চমকে ওঠে! অনিমেষের অবশ্য ঘুম ভাঙেনি; কিন্তু ঐ এক-অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দের আওয়াজটায় ঘরটা গম্গম্ করতে থাকে। সোজা হয়ে দাঁড়ায় কামিনী। তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হ'য়েছে। সে নিঃসহায়! সে শুধু অসহায়! বধূ নয়—সে জননী! সন্তান সেকথা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে তার মাতৃ-সম্বোধনে। বিষ্টপদ কামিনীর চোখে দেখতে পায় সেই হিংস্রতা—যেটা ফুটে ওঠে নরহত্যাকারীর চোখে চরম মুহূর্তের পূর্বক্ষণে! বিষ্টপদ গোরার উপস্থিতিতে আত্মসংবরণ করতে বাধ্য হয়। বলে: থাঙ্কল তোমার শাড়ি। ডাক্তারের প্রয়োজন বুঝল্য। আমারে খবর দিব্য।; স্ত্রাংটো হয্য। আসবা না। শাড়িখান পইড়্যাই আসবা।

চলে যায় বিষ্টপদ!

গোরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হ হ ক'রে কেঁদে ওঠে কামিনী।

: আমার ভয় কি! আমার গোরাটাদ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কেউ পারবে না আমার গায়ে হাত দিতে।

জননী আর পুত্রের অশ্রুস্রোত মিশে যায় ভি-রকের একটা জীর্ণ কুটিরের একান্তে !

হুনিয়া সে খবর রাখে না !

নমিতার দিনগুলিতে যেন নতুন স্রল লেগেছে। মাঝে মাঝে গুন্ গুন্ ক'রে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। মনে পড়ে ঘুরে ফিরে ঐ একটা লোকের কথাই। ওর হাতের কাজ যে গিয়ে বিক্রি করছে ক'লকাতার বাজারে। স্কুল থেকে ফিরে সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত ফর্সা শাড়িটা ছাড়ে না। গামছা দিয়ে রগড়ে মুখটা মোছে। কপালে পরে একটা লাল টিপ। পাউডার মাখা ছেড়ে দিয়েছে অনেক দিন। নতুন ক'রে কিনতে লজ্জা করে—নতু কি ভাববে।

সপ্তাহ কয়েক ঘন ঘন আসছে ভূষণ। এ সপ্তাহান্তেও আবার এল। এসেই বলে : কই আপনার বোন কোথায়। ডাকুন তো তাকে।

একটু ঘাবড়ে যায় নমিতা—কেন কি হয়েছে ?

: আরে বাপরে বাপ ! ঠান্দিদি বলেছি বলে কি এ রকম রসিকতা করতে হয় ? মার খেতে খেতে বেঁচে গেছি সেদিন।

কথাটা অতিরঞ্জিত নয়। নমিতার তৈরী জামা-জকগুলো নিয়ে ভূষণ দোকানে রাখে। এ সপ্তাহে বিক্রি ভালোই হয়েছে। একদিন এক ভদ্র-মহিলা দোকানে এসে ত্রিশ ইঞ্চি ব্লাউস খোজেন। ভূষণ নমিতার করা ব্লাউসের বাণ্ডিলটা বার ক'রে দেয়। প্রথমটা খুলেই ভদ্রমহিলা একখণ্ড কাগজ আবিষ্কার করেন। সেটি দেখে তাঁর মুখ চোখ বেগুনি হয়ে ওঠে ;—কাগজ-খানা দেন তিনি সন্দের ভদ্রলোককে। তিনি মারতে আসেন আরকি ! খন্দেয়ের সঙ্গে রসিকতা ! প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম। শেষে পাশের দোকানদারেরা রক্ষা করে। ভূষণ হাত জোর ক'রে বলে—দাঁড়ির দোকান থেকে বাণ্ডিল-বাঁধা জামা এনেছে, ভিতরে কি কাগজ আছে সে জানে না। অনেক বকাঝকা ক'রে ওঁরা চলে যান। ভূষণ তখন কাগজখানা ভুলে নিয়ে দেখে তাতে লেখা আছে :

ভূষণী কাকের মত চেহারাটি প্রভু ।

আরশি সামনে ল'য়ে দেখেছেন কতু ?

ধর্মিকার ভুললোকের সঙ্গে যে মহিলাটি এসেছিলেন তাঁর তল্লমেহখানি ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ । গাভ্রদাহ হবার এটাই হয়তো কারণ ।

লতুকে খুঁজে পাওয়া গেল না ।

ভূষণ বলে : একদিন আপনাকে নিয়ে যাব আমাদের বাড়ি । পিসীমা আপনাকে দেখতে চান ।

: বেশ তো, যাব ।

অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে ভূষণ । বিন্দুবাসিনী কখন উঠে যান । আজ লতুও বাড়ি নেই । হরিপদ মাস্টারও অল্পপস্থিত । ছুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে । বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে যায় । ভূষণ বলে,—কি যে করি, সপ্তাহে দুদিন মাত্র বাড়িতে থাকি । একা একা মিঠুয়াটা সারা সপ্তাহ কাঁদে । আমাদের পাড়ায় ওর সমবয়সী নেই । পিসীমার সঙ্গে আর কী খেলা করবে । ও মেয়েটাকে মানুষ করাই কঠিন হ'য়ে উঠেছে ।

: আপনার বোন-টোন নেই ?

এ প্রশ্নের মধ্যে হাসির কি আছে ? ভূষণ মিটি মিটি হাসতে থাকে ।

নমিতা অন্বস্তি বোধ করে । ভূষণ অবশেষে বলে : ছিল, মারা গেছে ।

: ও ! তা হ'লে আবার একটা বিয়ে ক'রে ফেলুন ।

: আবার !—হাসে ভূষণ । এবার প্রকাশ্যেই ।

: হাসি নয় । মেয়েটাকে তো মানুষ করতে হবে ।

: সতীনের মেয়েকে বন্ধ করবে কিনা—বুঝব কি ক'রে ? তার চেয়ে এ ভালো । দুটো গোরুর চেয়ে শূভ গোয়াল ভালো ।

: সব মেয়েই কিছু অমানুষ নয় । আপনি আগে থেকেই ওরকম ভাবছেন কেন ? বহু জায়গায় তো ঘোরা করা করেন—সেখো পছন্দ ক'রে বিয়ে করুন ।

ভূষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে নমিতার দিকে । নমিতা কেমন যেন অন্বস্তি

বোধ করে। ভূষণ ধীরে ধীরে বলে : আমি পছন্দ করলেও সে আমাকে পছন্দ করবে কিনা তার স্থিরতা কি ? আমার চেহারাটা তো দেখেছেন—উপার্জনও এই সামান্য—লেখাপড়াও খুব কিছু একটা শিখিনি—তার উপর দোজবরে !

নমিতা জবাব দিতে পারে না। জবাব একটা দেওয়া উচিত—প্রতিবাদ করাটাই এক্ষেত্রে ভদ্রতা ; কিন্তু ভূষণের ঐ স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি আর কাটা কাটা কথায় বেচারী কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারে না কিছু। ভূষণই আবার বলে : আপনি আমাকে সাহায্য করবেন ?

: আমি ? আমি কি সাহায্য করব ?

কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হয়ে ওঠে নমিতার ! বুকের ভিতর হুম্ হুম্ করে কে যেন ঘা মারে। পঁচিশ বছরের কুমারী মেয়েটির মনে লেগেছে ঝড়ের স্পর্শ। এখুনি হয়তো ভেঙ্গে পড়বে একেবারে। মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে যায় অতিক্রান্ত যৌবনের অনাদৃত ইতিহাস। দেশে থাকতে বাবার আগ্রাণ চেষ্টা ছিল নমিতাকে পাত্রস্থ করার। অনিমেষের সঙ্গে একই দিনে বিয়ে হওয়ার কথা তার। সে বিয়ে স্থগিত রাখতে হয়েছিল পাত্র অস্থস্থ হয়ে পড়ায়। স্থস্থ হওয়ার পর পাত্রের পিতা গ্রহণ করতে রাজি হ'ন নি নমিতাকে। যার আগমন সম্ভাবনাতেই তাঁর পুত্র অস্থস্থ হয়ে পড়ে—সে মেয়ের বিষনিঃশ্বাস সহ্য হবে না তাঁর পুত্রের ! তারপর থেকে হরিপদ পণ্ডিত মাঝে মাঝে নিয়ে আসতেন অপরিচিত ভদ্রলোকদের। বিন্দুবাসিনী সাজিয়ে দিতেন মেয়েকে মনের মতো করে। এক রাজ্যের লজ্জা নিয়ে নমিতা গিয়ে বসত পরিদর্শকদের সম্মুখে। ওঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতেন, নাম জিজ্ঞাসা করতেন, হাতের লেখা দেখতে চাইতেন, হস্তরেখা দেখতেন। ওঁদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে অদ্ভুত একটা অহুভূতি জাগতো, মনে হ'ত একটি মাত্র উত্তরের উপর হয়তো নির্ভর করছে তার জীবন, যৌবন—আশা আকাঙ্ক্ষা সব ! তারপর ওঁরা চলে যেতেন। মেয়ে পছন্দ হয়নি কথাটা মোলায়েম করে জানিয়ে দিতেন চিঠি লিখে।

সেই বিশ্বতপ্রায় অহুত্বটি জেগেছে আবার। নমিতার হৃদপিণ্ডে রক্তের
তালে তালে কিরে এসেছে সেদিনের সেই শিহরণ! নমিতা,—পঁচিশ বছরের
অতিক্রান্ত-যৌবনা উদ্বাস্ত মেয়েটি!

ভূষণও একটু ইতস্তত ক'রে বলে : আপনার খোঁজে আছে নাকি ঐ
রকম কোনও মেয়ে?

প্রশ্নটা সরল রেখায় সোজা পথে না এসে—একটু তীক্ষ্ণ গতিতে আসায়
নিঃশ্বাস ফেলে নমিতা। একটু সহজ বোধ করে। হেসে বলে : দেখি খোঁজ
ক'রে। কিন্তু মিঠুকে আনার কথা ছিল যে আজ আপনার?

: আচ্ছা নিয়ে আসব এর পরের দিন।

নমিতা প্রশ্নটা বদলে নিতে চায়। জিজ্ঞাসা করে ঠাকুরদার কথা। গণ-
কল্যাণ-সমিতির কথা। ভূষণ অধুনাতম সংবাদটি জ্ঞাপন করে। ভূষণ আর
নিতাইপদ ওয়েল-ফেয়ার-অফিসারকে জানিয়েছিলেন ওঁদের সেদিনকার
মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত। তিনি সে সিদ্ধান্ত মানতে রাজি হ'ন নি। তখন ওঁরা
গিয়েছিলেন ক'লকাতায় উপরওয়ালার কাছে। সেখানে গিয়ে শুনে এসেছেন
কলোনীতে আসছেন একজন নূতন অফিসার—এ্যাডমিনিস্ট্রেটর উদয়নগর
কলোনী। তিনি এসে নূতন ক'রে সব ব্যবস্থা করবেন। এ কলোনীতে
নাকি অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হবে। সেইজন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী
এখানেই এসে থাকবেন। এখন এঁরা অপেক্ষা করছেন সে ভদ্রলোকেরই।

নমিতা অধীর আগ্রহে সব শোনে।

পরদিন সকালে আবার অনিমেবের জরটা কমে আসে। স্বাভাবিকভাবে
কথা বলে সে। দুর্বল হ'য়ে পড়েছে বটে আরও।

বলে : আজ বোধহয় জরটা ছাড়ল, নয়?

কামিনীরও মনে হয় জরটা খুব কমে গেছে। শুকনো মুখে হাসি ফুটে
ওঠে ওর।

অনিমেবে বলে : আচ্ছা এর মধ্যে কেউ আসেনি?

কামিনী চুপ ক'রে থাকে !

অনিমেষ বলে : আমি স্বপ্নেও ভাবিনি এ রকমটা হ'তে পারে। আর সকলের কথা ছেড়ে দিচ্ছি ; কিন্তু বাবলু ? সেও এল না একবার ?

কামিনী যোগ দেয় : তা ছাড়া বাবলুকেও যে গুঁরা আটকে রাখলেন—এ সংসারটা তাহ'লে কি করে চলবে সেটা গুঁরা ভেবে দেখলেন না ?

অনিমেষ বলে : আর বাবা যে ব'লে গেলেন নমিতা মাসে মাসে টাকা পাঠাবে—তাও তো পাঠাল না নমিতা।

: ঠাকুরঝি টাকা পাঠিয়েছিল—পনের টাকা।

: পাঠিয়েছিল ? নিজে আসেনি ? কে এনেছিল লতু না বাবলু ?

: না, মনি অর্ডার পিয়ন !

অনিমেষ চুপ করে শুয়ে থাকে। কেউ কোনও কথা বলে না। হঠাৎ অনিমেষই আবার বলে : উঃ ! এরপরেও বেঁচে থাকতে হবে। ছোট-বোনের এভাবে অবজায় ছুঁড়ে ফেলা ভিক্ষা অয়ে জীবন ধারণ করতে হবে ! কি করব ? আমি অম্মহ, জ্বী-পুত্রকে খেতে দেবার আমার ক্ষমতা নেই।

কামিনী বলে : সে টাকা আমি নিইনি গো। মনি অর্ডার ফেরত গেছে।

অনিমেষ চমকে ওঠে : নাওনি ? তবে সংসার চলছে কি ক'রে ?

কামিনী বলে : কই আর চলছে বল ? কিন্তু তবু টাকাটা নিতে পারিনি আমি। ছোট বোন, ছোট ভাই এদের কারও হাতে পাঠাতে পারত টাকাটা—নিজে না এসেও। মনি অর্ডার করেছেন ! কুপনে কিছু লেখা নেই ! আমি নিতে পারিনি টাকাটা !

অনিমেষ অন্তমনস্ক হ'য়ে যায়। টাকাটা ফেরত দেওয়ার সে খুশী হয়েছে কি হুঃখিত হয়েছে তা বোঝা যায় না।

সে একমনে কি ভাবতে থাকে।

কামিনী বলে : কি ভাবছ অমন করে ?

: গুঁরা কত দিন গেছেন বলতো ?

: আজ সতের দিন।

: সতের দিন!—আর কোনও কথা বলে না। চোখ বুঁজে শুয়ে থাকে।
কামিনী উঠে যায়। ঘরের কাজকর্ম করতে থাকে। গোরাকে বসিয়ে দেয়
বাপের মাথার কাছে। বলে মাথায় হাওয়া করতে। ছোট্ট গোরা একটা
হাতপাখা নিয়ে বাতাস করে অনিমেষকে।

অনিমেষের মস্তিষ্ক খুব ভালো কাজ করছে না। জ্বর ভোগ ক’রে দুর্বল
লাগলে নিজেকে। তবু সে ভাবছিল ঐ একটা কথাই। সতের দিন চলে
গেছেন ওঁরা? যতদূর মনে পড়ে ওঁরা চলে যাওয়ার সময় সংসারের অবস্থা
ছিল অত্যন্ত শোচনীয়—আর্থিক অবস্থাটা। তারপর সতের দিন চলেছে
সংসার? তিনটি প্রাণীর সংসার বিনা উপার্জনে চলতে পারে এতদিন?
নমিতা টাকা পাঠিয়েছিল—আর তা প্রত্যাখ্যান করেছে কামিনী? কিসের
জোরে সে প্রত্যাখ্যান করে এ অর্থ? অভিমান? যার স্বামী মৃত্যুশয্যায়—
শিশুসন্তান অনাহারে শুকিয়ে আসছে তার আবার অভিমান! তবে কি—?

মাথার মধ্যে কিম্, কিম্ করতে থাকে অনিমেষের। বাবা, মা, নমিতা,
লতু, বাবলু—এতগুলি লোক একবার খোঁজও নিতে এল না? বিষবৎ
পরিত্যাগ ক’রে যায় কেন সবাই? আর সবার কথা ছেড়ে দিলেও, বাবা?
তিনি কিসের ভরসায় ছেড়ে গেলেন জ্যেষ্ঠপুত্রকে, একমাত্র বংশধর নাটিকে?
যাবার দিনে কেন বলে গেলেন ‘...উপার্জনের অনেক পন্থা আছে অহু?’

গোরার হাতখানা টেনে নেয় অনিমেষ, বলে: আর হাওয়া করতে
হবে না।—পাখাখানা রেখে দেয় গোরা।

: হাঁরে গোরা। আমি যখন ঘুমাই তখন কেউ এ বাড়িতে আসে?

: না তো বাবা।

: কেউ আসেনি? এ ক’দিনের মধ্যে কেউ আসেনি?

: বিষ্টু দোকানি এসেছিল একদিন।

বিষ্টুপদ! সেই চরিত্রহীন বদমায়েসটা!

: মাকে মারছিল বাবা! আমি কৈদে ওঠার ছেড়ে দিল।

মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হ’তে থাকে অনিমেষের। এটুকুই বোধহয় বাকি

ছিল! এর চেয়ে ছোট বোনের ভিকা-অয়ে জীবনধারণ করা কি ভালো ছিল না!

দুপুরে আবার প্রবল জ্বর এল অনিমেষের।

কামিনী দিশেহারা হ'য়ে পড়ে।

ক'দিন পরে ভূষণ আবার এল। এবার মিঠুকে নিয়েই। নমিতা দেখলো অবাক হয়ে বাপের সঙ্গে চেহারার মিল নেই। ভূষণ কালো, মেয়েটি ফুট-ফুটে। বোধহয় মায়ের রূপ পেয়েছে। অল্পেই নমিতার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। নতুন জামা পেয়ে মিঠু খুব খুশী। লতু আজও পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে। হরিপদ পণ্ডিত জানতে চাইলেন গণ-কল্যাণ-সমিতির কথা। ভূষণ বলতে থাকে সব কথা বুঝিয়ে। নতুন এ্যাডমিনিস্ট্রেটর কার্খভার বুঝে নিয়েছেন। কলোনীতে এসে কাজে যোগ দিয়েছেন তিনি। নিতাই ঠাকুরদা আর ভূষণ তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে সব কথা বলতে গিয়েছিলেন। এ্যাডমিনিস্ট্রেটর ধৈর্য ধরে ওঁদের বক্তব্য বিষয় শুনেছেন বটে তবে আশাপ্রদ কোনও প্রতিশ্রুতি দেন নি। ঠাকুরদা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে বর্তমান পঞ্চায়েতের উপর কলোনিবাসীর কোনও আস্থা নেই। ওরা সাধারণ লোকের স্বার্থ বলি দিয়ে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখছে। তাই নয়া পঞ্চায়েত গঠন করতে হবে। নির্বাচন স্থির করতে হবে নতুন পঞ্চায়েতের সভ্য।

এ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাগচি সাহেব বলেছেন : আপনি যা বলছেন তাই যে কলোনিবাসী সবাই চায় তার প্রমাণ কি ?

নিতাই ঠাকুরদা মিটিঙের কথাটা উল্লেখ করেন। মিটিঙে যে সব প্রস্তাব পাশ করানো হয়েছিল সেগুলো পেশ করেন।

বাগচিসাহেব বলেন : এ কলোনীতে দশবারো হাজার লোক। মাত্র সাত-আট শো লোক একটা সভা ক'রে যদি কোনও সিদ্ধান্তে আসেন সেটাকে সমস্ত কলোনিবাসীর ইচ্ছা বলে ধরে নেওয়া যায় না।

: কিন্তু মিটিঙে যদি এর চেয়ে বেশী লোক না আসে তাহ'লে আমরা কি করতে পারি ?

: আপনারা কিছু করতে পারেন না; কিন্তু এ থেকে প্রমাণিত হয় আপনাদের আহ্বানে মাত্র সাত-আটশো লোকই সাড়া দিচ্ছে। ওতে প্রমাণ হয় আপনাদের বিবেচনামতে সংখ্যাই বেশী। তাছাড়া এ মিটিঙে আপনাদের বর্তমান পক্ষায়েতের কেউ উপস্থিত ছিল না। তাঁদের বক্তব্যও শোনেন নি আপনারা।

ভূষণ বলেছিল: আমরা তাদের ডেকেছিলাম। তাঁরা কেউ আসেন নি। সে দোষও আমাদের নয় নিশ্চয়ই।

নিতাই ঠাকুরদা বলেছিলেন: আপনি যা বলছেন তাতে আপাত যুক্তি থাকলেও সে যুক্তি অন্তঃসারশূন্য। মিটিঙ ডেকে বড় বড় রেসলুসন এতবার নেওয়া হয়েছে—যে মিটিঙের ডাকে এরা আর সাড়া দেয় না। স্তোকবাক্য আর আশ্বাস ওরা আর শুনতে চায় না। সুতরাং মিটিঙ ডেকে আমরা কলোনীর পাঁচ ছয় হাজার লোককে জোগাড় করতে পারব না—এটা সন্নিহিত স্বীকার করে নেওয়াই ভালো।

বাগচি বলেন: তা হ'লে আপনি মেনে নিচ্ছেন অধিকাংশ লোক আপনার সঙ্গে একমত নয়?

: মোটেই তা নয়। আমি বলছি অধিকাংশই আমার পক্ষে। তাই আমি প্রস্তাব করছি যে আপনি বর্তমান পক্ষায়েতকে বলুন কালোনীর সামগ্রিক ভালমন্দ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য একটা মিটিঙ ডাকতে। সেখানে আমরাও আসব। আমাদের অভাব অভিযোগ পেশ করব। নথি-পত্র-সাক্ষী প্রমাণ সব নিয়ে আসব আমরা। ওঁরা জবাবদিহি ক'রে যদি আমাদের তুষ্ট করতে পারেন তাহ'লে ভালই।

‘আর. ও.’ যতীশবাবু বলেন: না না সেসব হবে না! তাহ'লে সে সভাতেই একটা গুণ্ডাগোল হবে—মারামারি বেধে যাবে।

বাগচি বলেন: তা কেন হবে? আমরা দরকার হ'লে আগে থেকে পুলিশ এনে রাখব।

‘আর. ও.’ বলেন: প্রথমেই এটা করবেন না স্যার।

: কেন বলুন তো ?

নিতাই ঠাকুর্দা বলেন : কেন তা উনি আমাদের সামনে বলতে পারবেন না। হয়তো আমরা চলে গেলেও পারবেন না। তবে কারণটা যে কি তা উনিও জানেন আমরাও জানি। আপনি সন্তবত জানবেন দুদিন পরে—যদি জানবার চেষ্টা করেন।

অকুণ্ঠিত হয় বাগচি সাহেবের।

ঠাকুর্দা একভাবেই বলেন : আপনি রাগ করবেন না স্যার। কথাটা সত্যি। আপনিই বরং একটা মিটিঙ ডাকুন। সেখানে হাজির করুন আপনার পক্ষায়েতের মেম্বারদের। আমরাও হাজির করব আমাদের অভিযোগ। নথি-পত্র-সাক্ষী-প্রমাণ। আপনি নতুন লোক। সব হয়তো বুঝবেন না, তাই আমরা অনুরোধ করব যে সভায় আর. ও.-সাহেব যেন উপস্থিত থাকেন।

আর. ও. বলে ওঠেন : আমি তো আগেই বলেছি মিটিঙ হবে না।

ঠাকুর্দা বলেন : আপনার আমলে হয়নি সে তো জানিই স্যার। এঁর আমলে হবে কিনা তাই জানতে চেয়েছি।

বাগচি বলেন : আচ্ছা আমি দুদিন সময় নিয়ে জানাচ্ছি আপনাদের।

ঠাকুর্দা বলেন : বেশ। তাই দেখুন !

ওঁরা আগ্রহ ভরে এই নবীন পরিবেশের কথা শোনেন ভূষণের কাছ থেকে। হরিপদ পণ্ডিত, বিন্দুবাসিনী আর নমিতা। গণকল্যাণ সমিতির কাজ শুরু হয়ে গেছে। ভূষণ বলে এরপর থেকে নমিতাকেও আসতে হবে। এভাবে পালিয়ে বেড়ালে চলবে না। আলোচনা জমে ওঠে। হঠাৎ একসময় নমিতা লক্ষ্য করে কখন উঠে গেছেন ওর বাবা আর মা। মিঠুও পাশের ঘরে একা একা বসে খেলা করছে।

ভূষণ বলে : সত্যিই আপনার সেলাইয়ের হাতটা ভারী সুন্দর। আপনার কাটগুলো খুব পছন্দ করছে লোকে।

নমিতা বলে : সে কৃতিত্ব আমার নয়। কাটগুলোর আবিষ্কার তো

আমি করিনি—কোনও একজন ঐ রকম প্রথম চালু করেছেন। আমি দেখে
অনুকরণ করেছি মাত্র।

: ও ভাবে বয়ে তো সব কিছু সবকিছুই যুক্তি দেখানো যায়। অমুক ভালো
গান গায় বলে আমরা ধরে নিই না যে সে নিজে গানটা গিখেছে বা স্বর
দিয়েছে। কারও দেওয়া স্বর নকলই করতে হবে গান গাইতে গেলে।

: আপনি বুঝি গান বাজনা খুব ভালোবাসেন।

: বাসতাম এককালে।

: অর্থাৎ এখন আর বাসেন না।

: এখনও হয়তো বাসি;—কিন্তু সময় আর সুযোগ তো নেই—তাই
ভালোবাসাটা গানবাজনা থেকে অন্ত কিছু উপর এসে পড়েছে।

নমিতা একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে: তা হ'লে বলব আপনি
কোনও দিনই গান বাজনা ভালোবাসতেন না।

: কেন?

: সত্যিকালের ভালোবাসলে কখনও সেটা ফুরিয়ে যেত না।

ভূষণও একটু চুপ ক'রে থাকে। তারপর বলে: আপনি যে কথা বলছেন
ওটা মেয়েদের তরফের কথা। পুরুষমানুষ ও কথা কোনও দিন স্বীকার
করে না।

নমিতা কি একটা কথা বলতে গিয়েও থেমে যায়।

ভূষণ বলে: আমি জানি আপনি কি ভাবছেন। আমার প্রথম পক্ষের
জীবন কথা তো?

নমিতা চমকে উঠে। আশ্চর্য! ঠিক ঐ কথাই সে ভাবছিল।

ভূষণ হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

নমিতা অবাক হয়ে বলে: হাসছেন কেন?

ভূষণ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়, তারপর শূন্যের দিকে চেয়ে বলতে থাকে:

আমার প্রথম পক্ষের জীবন যখন মারা যায় তখন ভেবেছিলাম জীবনটা
বুঝি ফুরিয়ে গেল! রোজ সন্ধ্যাবেলায় একটা ক'রে ধূপকাঠি জ্বলো দিতাম

শর কটোয় পাশে। কবে যে সেটা অভ্যাসে পরিণত হ'য়ে গেছে জানি না। এখনও যন্ত্রচালিতের মতো একটি ক'রে ধূপকাঠি জ্বলে বাই—কিন্তু দিনান্তে একবারও তার কথা মনে পড়ে না। আপনি হয়তো ভাবছেন আমি কত নীচ, কিন্তু এটাই বোধহয় জীবনের ধর্ম!

নমিতা বলে : না, এর জন্তে আপনাকে দোষ দেব কেন? আমি তো সেদিন নিজেই বললাম আপনার আবার বিয়ে করা উচিত।

ভূষণ যোগ করে : হ্যাঁ আর সেই সঙ্গে বলেছিলেন যে আমার জন্তে পাত্রীর খোঁজ করবেন।

নমিতা হেসে বলে : করছিই তো।

: এখনও খুঁজে পাননি কাউকে।

: কই আর পাচ্ছি বলুন।

: তবে আর খুঁজে কাজ নেই।

: কেন?

ভূষণ বলে,—কেন তাও কি বলে দিতে হবে? আচ্ছা বলছি। খোঁজের দরকার নেই কারণ সে রকম একটি মেয়ের খোঁজ আমি নিজেই পেয়েছি।

নমিতা মুখ তোলে। চোখাচোখী হয় ভূষণের সঙ্গে। ভূষণের ওষ্ঠে হাসির রেখা। মুখ নীচু করে নমিতা।

: শুধু আমার মতো দোজবরে ছেলেকে তার পছন্দ হবে কিনা এটাই জানা হয়নি।

নমিতা চুপ ক'রে থাকে। হঠাৎ খুব নীচু স্বরে ভূষণ প্রশ্ন করে—

: তুমি একটু খোঁজ নিয়ে জানাবে?

নমিতা ধরা গলায় বলে : আমি? বারে, আমি কি ক'রে জানব কার কথা বলছেন আপনি?

: আচ্ছা তবে থাক। আমি নিজেই না হয় জিজ্ঞাসা করব। করব?

নমিতার সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ বহে যায়। জবাব দিতে পারে না। ও ঘর থেকে মিঠু চিংকার করে ওঠে : মাছি আমার ভয় করে।

নমিতা স্বয়ংসেবায় সচিব্যবহার করে। তাড়াতাড়ি উঠে যায় ওঘরে।
তেলাপোকাটাকে তাড়িয়ে দিয়ে মিঠুকে কোলে তুলে নেয়। ছ'হাতের
আলিঙ্গনে বুকের মাঝে পিষতে থাকে মিঠুকে।

মিঠু হাঁপিয়ে ওঠে, বলে : ছেলে দাও !

: না দেব না। আগে আমাকে 'মা' বল।

: বলব না। তুমি তো মাছি !

: না, মা ! বল পিগ্গির, নইলে—

চুমায় চুমায় অস্থির ক'রে তোলে মিঠুকে।

ওঘর থেকে ভূষণ ডাকে—আয় মিঠু বাড়ি যাই।

মিঠু ওঘর থেকে বলে : ছালে না যে।

বিন্দুবাসিনী একবাটি চা দিয়ে আসেন ভূষণকে। নমিতা নামিয়ে দেয়
মিঠুকে। সে ওঘরে ছুটে যায়। নমিতা আর কিছুতেই ওর সামনে যেতে
পারে না। রাজ্যের লক্ষ্য এসে ওর পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে।

কিছুক্ষণ পর ভূষণ চলে যায় মিঠুকে নিয়ে।

আজ লভু সমস্তক্ষণই অল্পপস্থিত।

লালু ডাক্তারের ডিম্পেন্সারীট। পোস্ট অফিসের উন্টে দিকেই। সবাই
চেনে সেটা। সকাল থেকেই লালুবাবুর ডিম্পেন্সারীতে রোগীর ভীড়। আর
যে কোনও জিনিস দুপ্রাপ্য হোক রোগ আর রোগীর অভাব নেই কলোনীতে।
লালু ডাক্তারের দুঃখ এইটুকুই—রোগীদের যদি সেই অল্পপাতে 'কি' দেবার
ক্ষমতা থাকতো ! দু বেলায় মিলিয়ে অন্তত পঞ্চাশটা রোগী দেখেন তিনি।
সবাই আসে ওর ডিম্পেন্সারীতেই। বুড়ো মানুষ, বয়স হ'য়েছে। বাড়ি গিয়ে
রোগী দেখা ছেড়েই দিয়েছেন আজকাল। রোজগার হয় সত্যিকারের ওষুধ
বিক্রি থেকেই। তিথিট দেবার ক্ষমতা আর কটা লোকের আছে ? উদয়াস্ত
পরিক্রম করেন বটে কিন্তু রোজগার কই ? কোনও ছোট শহরে যদি গিয়ে
বসতেন আর এর চার ভাগের একভাগ পশার হ'ত তাহ'লেও সঙ্কলভাবে

সংসার চলে যেত তাঁর। এক একবার মনে হয়—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাবেন; কিন্তু হয়ে ওঠে না।

ধর্মভীরু লোক লালু ডাক্তার। কালীসাধক তিনি। এ্যালোপাথ। সাত সকালে স্নানাহিক সেরে গরদখানা প'রেই এসে বসেন ডাক্তারখানায়। সাত জাতকে ছুঁতে হয়। গরদ প'রে থাকলে সুবিধা আছে। তেঁটা পেলে গজাজলটুকু অন্তত খাওয়া চলে। ডাক্তারখানায় একটা ডিস্টিল্ড ওয়াটারের বোতলে গজাজল রাখা আছে আলাদা ক'রে।

ভোরবেলা থেকেই রোগী আসতে শুরু করে। রুগী, রুগী আর রুগী। অবস্থা অপেক্ষা করতে হয় তাদের। লালুবাবু গলায় চাদর দিয়ে যুক্তকরে দেওয়ালে প্রলম্বিত পটের ছবিগুলির তলায় মাথা ঠোকেন আর বিড়বিড় ক'রে মন্তোচ্চারণ করেন। বাইরে রোগীরা কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু উপায় কি? ঘরের ভিতরে দেওয়ালের দেবতারাও যে কিউ দিয়ে আছেন। কোন দেবতাকেই চর্চাবার সাহস নেই ধর্মভীরু লালু ডাক্তারের।

কথাবার্তা হচ্ছিল বাইরের অপেক্ষমান জনতার মধ্যে। নিতাই বৈরাগী জনার্দন যুগীকে জিজ্ঞাসা করে : আজকাল করতাছোড়া কি ?

: করবাম ফিরাবার কি ? বইয়াই আছি !

: ব্যাপারীর ব্যবসাটা ?

মাথা নাড়ে জনার্দন। তার মানে হতে পারে ভালো চলছে না। অথবা ছেড়ে দিয়েছে। সকলেরই এই অবস্থা। কর্মসংস্থানের যে কটা পথ ওরা দেখতে পেয়েছিল কলোনীতে এসে তার মধ্যে ব্যাপারীর ব্যবসাটাতেই লোক ঝুঁকেছিল বেশী। কালনা-ঘাট অথবা নবদ্বীপ থেকে চালের বস্তা কিনে সাইকেলের পিছনে বেঁধে নিয়ে এসে এ পারে বিক্রি করা। ছ' মনি বস্তা অনায়াসে ভারসাম্য রক্ষা ক'রে নিয়ে আসতো ওরা কেরিঘারে বেঁধে। জ্যোৎস্না রাতে সার দিয়ে চলতো সাইকেলের ক্যারিভান—একদলে ত্রিশ-চাল্লিশটা সাইকেল। জেলার সীমান্ত-রেখার এপার ওপার। মাইল সাত-আট পথ। পিচঢালা পরিষ্কার পথ। মনকরা চার আনা তো বটেই—কেজ

বিশেষে আট-দশ আনাও লাভ থাকে। দিনে চার-পাঁচ কেপ মারতে পারলেই হ'ল। অবশ্য সীমান্তের ছু পারেই খরচ আছে। তা থাক—খরচখরচা বাদেও ওতে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাটা হ'য়ে যেত। তারপর দুর্ভাগ্যক্রমে কণ্ট্রোলার ব্যবস্থাটা গেল উঠে! ব্যবসাটাও উঠে গেল ফলে।

এ ছাড়া আর একদল করতো তরকারীর ব্যবসা। গ্রাম থেকে সস্তা দামে সব্জি কিনে এনে কলোনীর বাজারে বেচা। কিন্তু দুটি কারণে এ ব্যবসাটাও উঠে যেতে বসেছে। প্রথমত কলোনীতে ক্রেতার অভাব আর দ্বিতীয়ত বহু লোক চুকে পড়লো এ কাজে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় বেশী এ ব্যবসায়। নামমাত্র একটা বাজার টিমটিম করছে কলোনীতে। কিছু লোক জনমজুর খাটতে যায় সদর শহরে অথবা জংসনে। ওরা যায় সকাল সাতটার লোকালে। ফেরার ঠিক নেই। যে কোন ট্রেনে ফিরলেই হ'ল। সব ট্রেনই উদয়-নগরে থামতে বাধ্য। টাইম-টেবিলে যাই লেখা থাক না কেন—সবাই জানে সব গাড়ীকেই দাঁড়াতে হবে উদয়-নগরে। সে মেলই হ'ক আর এক্সপ্রেসই হ'ক। কামরায় কামরায় শেকল আছে না? রূপবাপ ক'রে নেমে পড়ে ওরা। প্রথম প্রথম মেলট্রেনের ড্রাইভার অথবা গার্ড অপরাধীকে ধরার চেষ্টা করত—ক্রমশ তারাও এটা মেনে নিয়েছে স্বতঃসিদ্ধভাবে। একদল আছে হকার। হাজারো রকম সওদা নিয়ে ট্রেনে ট্রেনে ফিরি ক'রে ফেরে। ভিক্ষাজীবীও যথেষ্ট।

সবচেয়ে মুশকিল হ'য়েছে শিক্ষিত লোকদের। উদয়-নগর মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর কলোনী। অমজীবী সংখ্যালঘিষ্ঠ। শিক্ষিত বেকার ~~খুব~~ হ'য়েছে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা। না পারে তারা গায়ে খাটতে, না পার চাকরি, না পারে হাত পাততে। চেষ্টার ক্রটি নেই ওদের। নৈতিক বালাই বাদেও অল্প তাদের মধ্যে কিছু লোক একটা ভালো ব্যবসা কামলো। রাজনীতির ব্যবসা! মিটিং ক'রে, বক্তৃতা ক'রে, কাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে প্রেশেন করলো তারা। গড়ে উঠলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল। এসব দলের দলপতিদের যা হোক একটা ব্যবস্থা হ'য়ে যায়। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লোন পাইয়ে দেবে বলে এরা সাধারণ

মাছবের মুকুন্নি সাজে। ট্রেডলোনই বল', ল্যাটিন লোনই বল' আর ম্যারেজ-
 গ্রাণ্টই বল'—কোনরকম সরকারী সাহায্য পেতে হ'লে নাকি খরচ করতে
 হয়। এ কথাটা সাধারণ কলোনীবাসি লোকমুখে শুনে শুনে ক্রম সত্য বলে
 বুঝে নিয়েছে। কিন্তু খরচটা কিভাবে করতে হয় অনেকে জানে না।
 আন্দাজ করে হয়তো, তবে সাহস পায় না অনেক ক্ষেত্রে। তারা তখন মুকুন্নি
 খোঁজে। এরা সাহায্য চায় এমন লোকের যে গটগট করে ঢুকে যেতে পারে
 আর ও সাহেবের অফিস ঘরে স্লিপ না দিয়েই! সরকারী অফিসার হঠাৎ
 জীপ থামিয়ে যাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলেন : অমলবাবু—আপনাদের
 রকের সেই টি বি রুগীটির একটা বেড পাওয়া গেছে। আপনি একবার দেখা
 করবেন আমার সঙ্গে অফিসে।

এই জাতীয় অমলবাবু, শিশিরবাবু প্রভৃতি জননেতার স্মরণাপন্ন হয়
 কলোনীবাসী। যারা এ জাতীয় জননেতা হয়ে উঠতে পারেনি তাদের মধ্যেও
 অনেক শিক্ষিত যুবক রোজগার করত শুধু দরখাস্ত লিখে দিয়ে। ফুলস্বাপ
 কাগজে লিখে দিত তারা আবেদন-পত্র। পত্র পিছু মজুরী ছ'-আনা!

ঘরের ভিতরে লালুবাবুর সামনে বসে ছিলেন জংসনের ডাক্তার সেন।
 সেন শহরের ডাক্তার। নাম ডাক আছে। ক্লিনিক খুলেছেন একটা।
 ডাক্তার সেন বলছিলেন : আপনি কিন্তু আমার দিকটা একেবারেই দেখছেন
 না ভাঃ দত্ত। এ মাসেই অসুস্থ ছবার কন্সালটেসানে ডেকেছি আপনাকে
 আমি।

ডাক্তার দত্ত এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট ড্রয়ার থেকে বার ক'রে এগিয়ে
 দেন সেনের দিকে। বলেন : ধরান। আমিই কি তা অস্বীকার করছি
 মশাই! কিন্তু কী করব বলুন। সে রকম কেস আমি পাই কই?

: এটা কি বিশ্বাস করতে বলেন? কলোনীতে এত রুগী—আপনার
 চেয়ারে এত ভীড়—আর ক্লিনিকাল কেস পান না আপনি? কলোনীতে
 টি. বি. কেসও হয় না?

: আরে হবে না কেন ? প্রতি তিনখানা বাড়ি অন্তর একটা লোক ধুকছে। ক্রিনিকাল কেস অন্তত দুশ' পাঠাতে পারি আমি আজই। সকলেরই পরীক্ষা করানো দরকার। কিন্তু কেটে কেললেও এক বেটার কাছ থেকে সিকিটা আদায় করতে পারবেন না। নামেই রাজরোগ, হয় যত বেটা হাড়-হাভাতের ! লোন পাবার জন্য টাকা খরচ করছিস—কার্ডের লোকসংখ্যা বাড়াবার জন্যে খরচ করছিস—আর শুধু ডাক্তারকে ফি দেবার সময়ই 'বড় গরীব স্ত্রার, মাপ করন লাগবো' ?

ডাক্তার সেন চুপ ক'রে থাকেন। কি বলবেন তিনি ?

শেষে বলেন : আচ্ছা, আজ আসি।

লালুবাবু বলেন : আরে বসুন, বসুন চা আনতে দিয়েছি।

ডাক্তার সেন একটা সিগারেট ধরান। লালুবাবুর দেওয়া কাচি নর—রেড এ্যাণ্ড হোয়াইট। নিজের পকেট থেকেই বার ক'রে ধরান। একরাশ ধোঁয়া ছাড়েন মুখ দিয়ে।

বাইরে থেকে নকুল নিবেদন করে : ওদের আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না স্ত্রার।

: আচ্ছা একে একে পাঠাও স্লিপ দিয়ে।

ডাক্তার সেন হাসেন : বেশ আছেন মশাই আপনি। কিউ দিয়ে কঙ্গী দাঁড়িয়েছে। আধুলি ক'রে দিলেও তো টাকা দশেক হ'য়ে যাবে এ বেলাতেই।

ডাক্তার দত্ত বলেন : ছুখ তো তাই। তবল পয়সা হিসাবেও দেবে না বেটারা ; আধুলি তো দূরের কথা। উল্টে ওষুধ চেয়ে বসে ধারে। আর এখানে আমার প্রেক্ষাগৃহে শুধু ধারেই কাটে—যানে আমার গলা পর্যন্ত !

একে একে কঙ্গী প্রবেশ করে। নকুল, ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার শুধা সহকারী। রোগীর নাম ধাম রেজিস্ট্রিতে তুলে স্লিপ দিয়ে তিতরে বাবার ছাড়পত্র দেয়। পরীক্ষা চলে। ওষুধ লেখা হয়। ওদিকের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যার ওরা।

বাইরে একটা গুগুগোল ওঠে।

লালুবাবু বিরক্ত হ'য়ে বলেন : কি হ'চ্ছে কি ওখানে, নকুল ? এত গুণগোল কিসের ?

: এই দেখুন না স্তার । স্লিপ না নিয়েই জোর করে ঢুকতে চার । সত্যিই জোর ক'রে ঢুকে পড়ে কামিনী ডাক্তারের ঘরে । লালুবাবু একটা প্রচণ্ড ধমক দিতে গিয়ে থেকে যান । কুকেশা, খলিতবাসা, ঢাকাই বেনারসী পরা মেয়েটিকে দেখে সামলে নেন নিজেকে । নকুলকে বলেন : তুমি বাইরে যাও ।

: ও স্তার স্লিপ নেরনি ।

: সে তো গুনলাম । এখন তুমি বাইরে যাও ।

হতাশ নকুল হাত দুটো উন্টে দেয় । অর্থাৎ কর্তার মজি বোঝা ভার । বাইরে যেতে হয় তাকে । লালুবাবু চায়ের পাথর বাটিতে একটা চুমুক দিয়ে মেয়েটিকে অপাঙ্গে একবার দেখে নেন আপাদমস্তক ।

: এখানে জোর করে ঢুকলে কেন তুমি ?

কামিনী একেবারে মরিয়া হ'য়েই এসেছিল । আবেদন, অশ্রুস্রব, ভিক্ষা তো অনেক হ'ল । এবার সে দাবী জানাতে এসেছে । পথের মধ্যে একটা মানুষ আছাড় খেয়ে পড়লে আর পাঁচজনে তাকে ধরে তোলে । পথচলতি মানুষের এ একটা অলিখিত ধর্ম । জীবনের পথেই বা এ আইনটা প্রযোজ্য নয় কেন ? মানব সভ্যতা প্রতিবেশীর কাছে এটুকু দাবী করতে পারে । সভ্যজগত এ দাবী মেনে নিতে বাধ্য । বলে : আমার স্বামী অত্যন্ত অসুস্থ । বাড়িতে দ্বিতীয় প্রাণী নেই । আপনি চিকিৎসক, তাই আপনাকে জানাতে এসেছি ।

ডাক্তারবাবুর উত্তর দিতে একটু দেরী হয় । তিনি একদৃষ্টে দেখছিলেন ওকে । মেয়েটির মস্তিষ্কবিকৃতি নেই তো ? চোখদুটো টকটকে লাল, মাথার চুলগুলো কক—হয় বহুদিন তেল মেখে ঘান করে না অথবা সাবান দিয়ে মাখা ঘবেছে । পরিধানে একখানা ঢাকাই বেনারসী । মাঝে মাঝে কেসে গেছে । ড্রেস ক'রে পরেনি কিছু । সাধারণ করেই পরেছে ।

লালুবাৰু বলেন : এটা দাতব্য চিকিৎসালয় নহ। ডাক্তারবাবুৰ প্রাপ্য না দিয়ে তুমি জোর করে চুকলে কেন তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

: আপনার প্রাপ্য দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

: কিন্তু আমি তো দানছত্র খুলিনি। এটাই আমার জীবিকা। তোমরা যদি আমাকে আমার প্রাপ্য না দাও—

: দেব না কে বল ? দেব। তবে এখন আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। ডাক্তারবাবু একটু অবাক হন। মেয়েটির কণ্ঠস্বরে করুণা ভিষ্কার কোনও আভাস নেই। যেন বিনা পারিশ্রমিকে রুগী দেখাই লালু ডাক্তারের কর্তব্য— সে কথাটাই সে স্বরণ করিয়ে দিচ্ছে তাঁকে।

: ধারে কারবার করি না আমি। তুমি যেতে পার।

হঠাৎ কামিনীর সব উৎসাহ ফুরিয়ে যায়। মুখরার মতো এতক্ষণ এতগুলো কথা এক নিঃশ্বাসে বলতে পেরেছে এটাই আশ্চর্য ওর মত ঘরের বধূর পক্ষে। ঐ একটি মাত্র কথায় বেচারী একেবারে নিভে যায়। বেদনার্ত হ'য়ে ওঠে ওর কণ্ঠস্বর। অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে : ডাক্তারবাবু, আমরা বড় গরীব।

এটা চেনাস্বর লালু ডাক্তারের কাছে। এতক্ষণে বাধাগতে ফিরে এসেছে কথোপকথন—ভাবেন লালু ডাক্তার।

: আমি আপনার কেনা হয়ে থাকব। আপনি আমার স্বামীকে ভালো ক'রে দিন। আমি আপনার বাড়িতে ঝিয়ের কাজ ক'রে শোধ দেব।

লালুবাৰু বলেন : রোজ বিশপঁচিশটা মুম্বু'রোগী দেখি আমি। তারা সবাই গরীব। তারা সকলেই বলে ঝিয়ের কাজ ক'রে শোধ দেব আপনার ঋণ। ত্রিশটা ঝি তো লাগবে না আমার বাড়িতে।

কামিনী বসে পড়ে ওঁর পায়ের কাছে। লজ্জাশরম ত্যাগ করে হাত বাড়ায় ওঁর ফিতে বাধা জুতোর দিকে।

: আহ্! এ মেয়েটাতো জালালে দেখছি! লাক দিয়ে সরে যান ডাক্তারবাবু।

হঠাৎ আত্মসম্মান ফিরে আসে কামিনীর। ভড়িৎপৃষ্ঠের মতো উঠে দাঁড়ায় সে।

ডাক্তার সেন হেসে বলেন : অবনশাস! হাউ ভেয়ার সি এক্সিবিট হারসেল্ফ ইন সচ্ এ ট্রান্সপারেন্ট ট্রেসিং ক্লথ? শায়াও নেই হায়াও নেই!

কামিনী বুঝতে পারে না ওর ইংরাজি রসিকতা; কিন্তু শেষ কথাটায় আন্দাজ করতে পারে অশ্লীল ইঙ্গিতটা। জলে ওঠে ওর চোখ। বলে : কী! কী বলেন?

জবাব দেন লালুবাবুই : কি করবে বল? কৌরব সভায় দ্রৌপদী নারায়ণকেই স্মরণ করেছিলেন। ডাকো, ভগবানকে ডাকো। পারলে তিনিই ভালো করে দেবেন তোমার স্বামীকে। না হয় নিয়ে এসো তাকে একটা অমুখ দেব অখন দেখে শুনে। এবার যাও দেখি!

: যাচ্ছি, যাচ্ছি, নারায়ণকেই ডাকব আমি! মনে ভাববেন না আমার সে ডাক ব্যর্থ হবে। ভগবান না করুন বিনা চিকিৎসায় যদি আমার স্বামীর কিছু হয় তখন দেখবেন এ দ্রৌপদীর অভিশাপও ফলবে। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করেন আপনারা! ভুলে যাবেন না কৌরবকুল নির্বংশ হ'য়েছিল ঐ দ্রৌপদীর অপমানেই!

এক ফোঁটা জল নেই আর কামিনীর চোখে। কাঁপতে কাঁপতে সে বেরিয়ে আসে। লাল বেনারসী শাড়ি পরা নববধূর সজ্জায় সেজেছে সে। মনে হ'চ্ছে ওর সারা দেহে যেন আগুন ধরে গেছে। সে আগুনের শিখায় জলে উঠেছে ওর দেহ-মন-অস্ত্রাঙ্গা!

বাড়িতে ফিরে এসে দেখে অনিমেষ তখনও আচ্ছন্নের মত পড়ে। গোরু বসে আছে ওর বাপের মাথার কাছে! বেলা বেশ বেড়ে উঠেছে। রোজ কড়া হয়েছে। কামিনী ঘরে ঢুকে গোরাকে প্রশ্ন করে : হারে, তোর বাবা উঠেছিল এর মধ্যে?

: হাঁ মা, একবার আমাকে বলে 'কোথা থেকে টাকা পাচ্ছিস'? আমি তো মা টাকার কথা জানি না কিছু।

: ও কিছু নয় বাবা !

: বড় ক্রিদে পেয়েছে মা—পেঁপে আর আছে ?

কামিনী ইতস্তত করে। ঘরে গিয়ে এটা ওটা নাড়াচাড়া করে। বিক্রয় করার মত, বাঁধা দেওয়ার মত কিছুই নজরে পড়ে না। তাছাড়া সে ব্যবসাই বা করবে কে ? তারপর হঠাৎ মনে পড়ে বেনারসী শাড়ির জরিও বিক্রয় হয়। হোক পুরানো শাড়ি—তবু ওর জরিগুলোর কিছু একটা দাম হবেই। কাপড়টা ছেড়ে—শাড়িখানা হাতে নিয়ে ইতস্তত করে। পুরানো কাপড়খানাই আবার পরেছে। এটা পরে, আর যাই হ'ক পথে বার হওয়া যায় না।

: হারে গোরা, তুই মেয়েগুলোর হেডমিস্ট্রেসের বাড়ী চিনিস ?

গোরা জানায় সে চেনে।

কামিনী হাঁক ছেড়ে বাঁচে : একবার যা তো তাঁর কাছে।

শাড়িখানা একটা কাগজে জড়িয়ে দেয়। গোরার হাতে দিয়ে বলে—এখানা নিয়ে যা। একখানা চিঠি লিখে দেয় সে হেডমিস্ট্রেস্, সুরেখা দেবীকে। লেখে তার স্বামীর অবস্থার কথা, অর্থহীনতার কথা। পরিশেষে লেখে 'এখানা আমার বিয়ের বেনারসী। পুরানো হ'য়ে এসেছে যদিও, তবু জরি দাম একটা কিছু হ'বেই। এটা রেখে আপনি যদি গোটা পাঁচেক টাকা ছেলেটির হাতে পাঠান তাহ'লে ওকে কিছু কিনে খেতে দিতে পারি।'

গোরা বলে : কিছু নেই ? একটা কিছু খেয়ে গেলে হ'ত ?

কামিনী ওর মাথায় গালে হাত বুলিয়ে বলে : এই চিঠিখানা নিয়ে হেডমিস্ট্রেসের কাছে গেলে উনি পাঁচটা টাকা দেবেন। তখন ফেরার পথে বরং চার আনার সন্দেশ কিনে খাস্। দেখিস্, হারাস না যেন টাকাটা।

ছোট্ট গোরা ঘাড় নাড়ে। হারাবে কেন ? ঐ তো হেডমিস্ট্রেসের বাড়ি—ফুটবল খেলার মাঠের পাশে। আর খাবারের দোকান তো গলির মুখেই। ঠিক পারবে সে।

গোরা চলে গেলে কামিনী স্বামীর মাথায় কাছে গিয়ে বসে।

: কোথায় গিয়েছিলে সাত সকালে ?

কামিনী চম্কে ওঠে। অনিমেষ যে ভেগে আছে বুঝতে পারেনি সে।

বলে : ডাক্তারবাবু কাছে ?

: সত্যি বলছ ?

: মিথ্যে বলব কেন ?—অবাক হয় কামিনী।

গভীর হ'য়ে যায় অনিশেষ। চোখ দুটি বুজে আসে।

দরজার কড়াটা নড়ে ওঠে।

কামিনী এসে খুলে দেয়।

লালু ডাক্তার !

: তোমার স্বামীকে একবার দেখতে এলাম। কোথায় সে ?

কামিনী বিস্মিত হওয়াও ভুলে গেছে। যন্ত্রচালিতের মত অনিমেষকে দেখিয়ে দেয়। লালুবাবু এসে অনিমেষের নাড়ি দেখেন। চোখ বুঁজে আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে সে। স্টেথো দিয়ে বুক দেখেন। পরীক্ষা শেষ ক'রে জানতে চান কতদিনের অস্থ—অস্ত্রাস্ত্র বিবরণ। মোহগ্রস্তের মতো জবাব দিয়ে যায় কামিনী। ডাক্তারবাবু জানতে চান—বাড়িতে আর কে আছে। কামিনী জানায় সে একাকী।

: কি বুঝলেন আমায় বলুন। অনেক সঙ্কট করেছি ডাক্তারবাবু—সব খুলে বলুন—আমি সঙ্কট করতে পারব। লুকোবেন না কিছু।

লালুবাবু খম্খম্ ক'রে একটা প্রেসক্লিপসান লিখে দেন : দিনে তিনবার খাবে এটা।

: কি হ'য়েছে ওঁর ?

: হয়েছে অনেক কিছুই। রোগীর অবস্থা ভালো নয়। তবে যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করালে না বেঁচে ওঠার কোনও কারণ নেই।

: ডাক্তারবাবু আমি আপনার কেনা হ'য়ে থাকব—

ডাক্তারবাবু যন্ত্রপাতিগুলি গুছিয়ে তোলেন নীরবে।

: প্রেসক্লিপসান লিখে দিলেন—কিনব কি করে আমি ? আমার হাতে কি একটা পয়সা আছে ?

: তার আমি কি করতে পারি বল ? আমি চিকিৎসক—পরামর্শ ই নিতে পারি শুধু।

কামিনী চটে যায় : ওষুধ কেনার কষ্টতা যে আমার নেই একথা তো জানতেন আপনি। তা হ'লে এলেন কেন ?

লালুবাবু বলেন : এক শিশি ওষুধ খাওয়ালেই তো চিকিৎসা শেষ হবে না। তা যদি হ'ত না হয় নিজের পকেট থেকেই ওষুধের খরচটা দিতাম আমি। এ রোগীর সমস্ত চিকিৎসার তার তো আমি নিতে পারব না।

: তবে কি বিনা চিকিৎসায় লোকটা শেষ হ'য়ে যাবে ?—তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করে কামিনী।

লালুবাবু চুপ ক'রে থাকেন। কি বলতে পারেন তিনি। ওর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ-স্বরে চোখ মেলে তাকায় অনিমেব। ঘোলাটে-লাল দুটো চোখ। কেউ খেয়াল করে না।

কামিনী কি যে করবে ভেবে পায় না। তারপর যেন সমস্ত বিশ্ব-জগতের উপর তার নিরুদ্ধ আক্রোশ ভেঙ্গে পড়ে লালুবাবুর উপর।

: চিকিৎসা করলে লোকটা বাঁচতে পারে—তবু তাকে দেখবে না কেউ ? বাপ-মা দেখবে না—ভাই-বোন দেখবে না ! তারা সবাই টাকা চিনেছে ! লোকটা বেকার ! আপনিও ওকে বাঁচিয়ে তুলবেন না ! ও যে বেকার আজ ! বেশ মরুক তবে ও ! কিন্তু দেখবেন আপনি—এতে কখনও ভালো হবে না আপনাদের !—কৈদে ফেলে সে।

লালুবাবু ঘাবড়ানো ভাবে প্রস্তুত হয়েছিলেন। খুঁজে দাঁড়িয়ে বলেন : তুমি অভিশাপ দিও না মা।

: দেব না ? কেন দেব না ?—উন্মাদিনীর মত চীৎকার করে ওঠে কামিনী !

ধীর কণ্ঠে লালুবাবু বলেন : বেশ দাঁও ! আর আমার ভয় নেই। একটা কথা বলি মা—কিছু মনে কর না। আমি তোমার বাপের বয়সী ! এখন যে শাড়িখানা পরে আছ তাতে তোমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছি

না। আমার ডাক্তারখানার গিরেছিলে দেখলাম পাতলা একখানা ঢাকাই বেনারসী পরে—চৌকির নিচে ধুলোর লোটাচ্ছে দেখছি একখানা পাট-না-ভাঙ্গা আনুকোরা নতুন তাঁতের শাড়ি! অথচ তোমার হাতে শুধু কেনার টাকা নেই বলছ; এ থেকে যদি কেউ...থাক মা! ঘরে অচৈতন্য স্বামী ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই—মনে হ'চ্ছে ভদ্রঘরের বধু ছিলে একদিন। এভাবে কি বাচিয়ে তুলতে পারবে তোমার স্বামীকে?

কামিনীর হু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। এতক্ষণে সচেতন হয় সে নিজ দেহসজ্জার দিকে। সঙ্কোচে মরমে মরে যায়। বলে: বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু—

লালুবাবু হাত ছুটি জোড় ক'রে বলেন: থাক মা ও কথা। তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আনিনি আমি। মনে ভেবেছিলাম—হয়তো ঘরে দ্বিতীয় বস্ত্র নেই—ভদ্রঘরের কোন সতী মেয়ের অভিশাপ লাগবে আমার। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি আমি। সে ভুল আমার ভেঙে গেছে। সারা গা ঢাকার মত নতুন শাড়ি মেজ্জেতে লুটাচ্ছে তবু যে মেয়ে—থাক ও কথা! ডাক্তারবাবুর কর্তব্য আমি ক'রে গেলাম। আর আমাকে ডাকতে যেও না যেন।

কোনদিকে না তাকিয়ে গটগট করে বেরিয়ে যান ডাক্তার লালমোহন দত্ত। কামিনী মাটির উপর আছাড় খেয়ে পড়ে। হু হু ক'রে কঁদে ওঠে। এত লোক এতবার তাকে অপমান করেছে—রুঢ় ভাষার সে প্রতিবাদ করে এসেছে এতদিন। এবার ধীর স্থির কণ্ঠে যে লজ্জাকর কথাগুলি বলে গেলেন ডাক্তারবাবু তার প্রতিবাদ করার ভাষা জোগালো না ওর মুখে। কোনও জবাব দিতে পারলে না। মনে হল সবই বুঝি ফুরিয়ে গেল। স্বামীকেও বাচাতে পারলো না—সতীত্বের অভিমানও হ'ল ভুলুষ্ঠিত। হঠাৎ খাটের নীচে থেকে নতুন তাঁতের শাড়িটা টেনে বার করল। এটাকে এখনই পুড়িয়ে ফেলতে হবে। শাড়িটা এ বাড়িতে এখনও রয়েছে বলেই অপদেবতার স্পর্শ লেগে রয়েছে এর রঙে রঙে। ঐ শাড়িটা দিয়েছিল একটা নারীমাংসলোলুপ কামুক জানোয়ার।

স্বপ্ন দিবেছিল সে—একটা নারীদেহের প্রতি অগ্রিম দাবী জানিয়ে। এটার সমাপ্তি করতে হবে এখনই।

হঠাৎ ওর হাত চেপে ধরে অনিমেষ। উন্মাদের মতো চেহারা হ'য়েছে তার। কামিনী এতক্ষণ খেয়াল করেনি—অনিমেষ কতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছে ওকে। কঠোর কণ্ঠে অনিমেষ বলে : এ শাড়ি কোথেকে এল ?

কামিনী ভয় পেয়ে যায়, বলে,—ছাড়ো।

: ছাড়বো ? কক্ষণও ছাড়ব না। বল্ হারামজাদি—এ শাড়ি কোথায় পেলি তুই ?

কাঠের পুতুলের মত কামিনী বসে থাকে। একটা কথাও বলতে পারে না। ঠাস করে একটা চড় মেরে বসে অনিমেষ।

: লজ্জা করে না তোর ! এতদূর অধঃপতন হয়েছে ! আমি মরতে বসেছি—আর তুই...? ওঃ !

আবার ওয়ে পড়ে অনিমেষ। চোখ দুটো বুঁজে যায়। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে। কামিনীর সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে গেছে। কোনও উৎসাহ নেই তার। আর সে বাঁচতে চায় না। বাঁচাতে চায় না অনিমেষকে ! ওর শেষ সম্বলটুকুও যখন রইল না তখন কি হবে আর যুদ্ধ ক'রে। অনিমেষের মুখে চোখে বোধ হয় এখন ওর জলের ঝাঁপটা দেওয়া উচিত ! দেখবে চেষ্টা করে জ্ঞান ফেরানো যায় কিনা ? কি লাভ ? জ্ঞান ফিরে এলেই ব্যতিচারিণী জীব কথটা মনে পড়ে যাবে। নিকর আক্রোশে আরও কষ্ট পাবে বেচারী। প্রাণেই যখন বাঁচবে না তখন যে কটা মুহূর্ত বেঁচে আছে থাকনা অজ্ঞান অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে।

ধীরে ধীরে উঠে আসে কামিনী। জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণই যেন নেই আর। চূপ ক'রে বসে থাকে। দৃষ্টি গিয়ে পৌছায় পথের উপর। বেলা অনেক হ'য়েছে। গুমট গরম। একটা ধুলোর ঝড় উঠল। দমকা বাতাসে ধুলোর একটা ঘূর্ণি উঠে গেল আকাশের দিকে। আগুন-ঝরা আকাশে উচুতে—বহু উচুতে ভেসে চলেছে ছোটো চিল। তীব্র চীৎকার করে উঠল একটা। কামিনী বসে বসে

তাই দেখছিল। হাতে তার কোনও কাজ নেই। কাজ আছে অনেক, কিন্তু কাজ করবার মতো মনের অবস্থা নেই। উৎসাহ নেই। সে বুঝি ফুরিয়ে গেছে। ঘলে ডোবা মাহুর নাকি এক মুহূর্তে জীবনের আদি-অন্তটা একসঙ্গে দেখতে পায়। কামিনীর মনে হ'ল ফেলে আসা দীর্ঘজীবনের দৃশ্যগুলো মনের পটে তেমনি একসঙ্গেই ভেসে উঠল বুঝিবা। ছেলেবেলার বাপের খুব আছরে মেয়ে ছিল। অল্পকিছু হ'লেই অভিমানে ঠোট ছুটি তার ফুলে উঠত। মা বলতেন—মেয়েমাহুরের অন্ত আদিখ্যেতা। ভাল নয়। বাবা হাসতেন। আছরে মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন—পাগলি! আজকের এ ঘটনার সঙ্গে সে দৃশ্যের কোনও সামঞ্জস্য নেই। তবু ওর মনে পড়ে গেল সেই ছেলেবেলার কথা। কৈশোরে ছুটাছুটি করেছে যেসব বান্ধবীদের সঙ্গে তাদের ঘেন স্পষ্ট দেখতে পেল কামিনী এই অকাজের ছপূর বেলায়। তারপর ওর বিয়ের সম্বন্ধ হ'ল। নিজের সংসার! বর! সেসব স্বপ্নের কথা আজ কেন মনে পড়ছে ওর? মাহুর আত্মহত্যা করবার আগে কি এমনভাবে ফেলে আসা দিনগুলোর পাতা উল্টে নেয়? কামিনী কি আত্মহত্যা করবে? এ বিড়ম্বিত জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণ আর নেই তার—সে কথা সত্য। কিন্তু তাই বলে সরে দাঁড়াবে সে? লোকে বলবে—পাপের এই পরিণাম! সে পরাজয়—সে গ্লানি কেন নিয়ে যাবে সে মাথায় ক'রে। মৃত্যু নাকি মহান! কিন্তু এ মৃত্যুতে যে মহিমার কণামাত্রও নেই। তাছাড়া গোরা! সেই অনশনক্লিষ্ট এক ফোঁটা ছেলেটা? সে কি অপরাধ করল? তাকে কেন ছেড়ে রেখে যাবে এই ছুনিয়ার অরণ্যে একেবারে নিঃসহায় করে?

: বাড়িতে কে আছেন?

উঠে দাঁড়ায় কামিনী। অপরিচিত কণ্ঠস্বর। নিজ দেহের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায় দ্বারের ওপাশে। আড়াল থেকে বলে : ভিতরে আছেন।

দ্বার খুলে ভিতরে আসেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা। খালি গায়ে মলিন একখানা এণ্ডির চাদর। তলা দিয়ে উপবীতটা দেখা যায়। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অনেকদিন কামানো হয়নি। খালি

পা। বরের এদিক ওদিক দেখে বৃদ্ধ বসে পড়েন অনিমেবের মাথার কাছে।
অরতাপ দেখেন। নাড়ি পরীক্ষা করেন। তারপর বলেন : কামিনী কার
নাম ?

আড়াল থেকে কামিনী বলে : আমি। বলুন কি বলছেন।

: আমি তোমার স্বামীকে দেখতে এসেছি। আমাকে লজ্জা ক'র না
দিদি। বাইরে এস! অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। এস এদিকে।

তবু বা'র হ'তে পারে না কামিনী। লালু ডাক্তারের কথাগুলো মস্তকের
রক্তে রক্তে তখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। বলে : আপনি ওখান থেকেই বলুন।
আমি শুনতে পাচ্ছি।

: কিন্তু তা তো হবে না দিদি। আমি নিতাই ঠাকুর্দা। আমার সঙ্গে
কলোনীর সব মেয়েরই ঠাকুর্দা নাতনী স্ববাদ। কলোনীর সব মেয়েরই আমার
সামনে বের হয়। এস তুমি এ ঘরে।

ভদ্রলোক নিজেই এগিয়ে আসেন। নিতাই কবিরাজ! ঠাকুর্দা! কোথা
থেকে এলেন উনি? কামিনী জানতো উনি কলোনীতে নেই। গণ-কল্যাণ
সমিতির কাজে দরবার করছেন অকল্যাণে। কবে ফিরে এসেছেন তিনি?
তার স্বামীর সংবাদই বা পেলেন কি ক'রে? নিতাই কবিরাজ কি সত্যই
অন্তর্যামী?

ঘরের কাছ পর্যন্ত এসে ভিতরে উকি দিয়েই উনি ফিরে যান : ও! তা
বলতে হয়। ঠাকুর্দার কাছে আবার লজ্জা কিরে পাগলি? নে এটা গায়ে
জড়িয়ে আয় এ ঘরে।

গায়ে এগির চাদরটা ছুঁড়ে দেন তিনি কামিনীর উদ্দেশ্যে। সেটা গায়ে
জড়িয়ে কামিনী এঘরে আসে। ভক্তিতরে প্রণাম করে নিতাই কবিরাজকে।
তৈলবিহীন কুম্ভ চুলের গোছায় ঢেকে যায় ঠাকুর্দার ধূলিমলিন চরণ বুগল।

ঠাকুর্দা বলেন : তোমার চিঠি নিয়ে একটি ছোট ছেলে যখন হেডমিস্ট্রিসের
বাড়ি গেল—আমি তখন সেখানে। স্বপ্নে বাড়ি ছিলেন। চিঠিখানা
আমাকে তিনি দেখতে দিলেন। আমি তাই নিজেই চলে এলাম।

গোরা কই ?

: গোরা কে ?

: ওই ছোট ছেলোট।

: তোমার ছেলে বুঝি ? গোরা ! তাকে স্নেহে বসিয়ে থাওয়াচ্ছে ।

কামিনীর বুকের পাষাণভার নেমে যায় ।

ঠাকুর্দা বলেন : এর তো রীতিমত চিকিৎসার দরকার । বাড়িতে আর কে আছে ?

কামিনী জানায় আর কেউ নেই ।

: তবে তোমাকেই খুলে বলি । রোগ কঠিন । রীতিমত যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করালে ভালো হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে । তোমার এখানে থেকে তো তা হবে না । আমি এখনি একে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাই । জংসনের হাসপাতালে । তুমি যদি সঙ্গে যেতে চাও—তবে যা হ'ক ছুটি ভাতে ভাত খেয়ে নাও ।

: হাসপাতাল ! সেখানে শুনেছি—

: ভুল শুনেছ । পাড়ারগৈয়ে ভূত ! বাঁচলে ঐ হাসপাতালেই বাঁচবে—
তোমার আঁচলের তলায় নয় ।

: না, আমি শুনেছিলাম সেখানে সীট পাওয়া যায় না । বিশেষত কলোনীর রোগী হ'লে—

: ঠিকই শুনেছ তুমি—যেত না ! কিন্তু তার পরেকার খবরটা তুমি শোন নি । এখন থেকে পাওয়া যাবে । অন্তত নিতাই কবিরাজ যে কেস নিয়ে যাবে তার একটা ব্যবস্থা হবেই । তুমি বোধহয় জানো না তোমাদের ঠাকুর্দা একটা কেটে বিটু হ'য়ে উঠেছেন সম্প্রতি এ অঞ্চলটার । তুমি তৈরী হ'য়ে নাও !

: আমি তৈরীই ।

: থাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে ?

: আপনি রওনা দেবার ব্যবস্থা করুন ।

ঠাকুর্দা একবার ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে উঠে যান।
রায়াবরের শিকল খুলে একবার ভিতরে উকি মারেন। কিরে এসে হাত-
খানা রাখেন কামিনীর পিঠে : কতদিন জালিস না উনান ? হাঁয়ে ?

কামিনী জবাব দেয় না।

ঠাকুর্দা বেরিয়ে যান। কিরে আসেন একটু পরেই। তাঁর হাতে এক
ঠোঙা খাবার। ওর হাতে দিয়ে বলেন : খা ! খেয়ে জল খেয়ে নে। আমি
একটা রিকশা ডাকি। একটা চম্পিশের ট্রেনটা ধরতে পারব বোধহয়। গোয়া
ও বাড়িতেই থাক। যাবার সময় সুরেখাকে বলে যাব অখন।

কামিনী বলে : খেতে আমি পারবনা ঠাকুর্দা। আপনি রিকশা ডাকুন।

ঠাকুর্দা রওনা দিয়েছিলেন। হঠাৎ ধমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। খুঁজে দাঁড়ান।
বলেন : ঠাখ, একটা কথা তোকে বলে রাখি। আমার কথা বিনা প্রতিবাদে
যে শোনে না তার সঙ্গে আমার কোন স্ববাদ নেই। আজ একাদশী। এভাবে
নিরম্ম উপোস ক'রে মরণাপন্ন স্বামী নিয়ে হাসপাতাল যেতে আমি দেব না
তোকে। রিকশা ডেকে আনছি আমি। কিন্তু এসে যদি দেখি একটা
টুকরোও পড়ে আছে পাতে তাহলে ঐ রিকশা চেপেই একা ফিরে যাবো
আমি। মনে থাকে যেন !

ঠাকুর্দা বেরিয়ে যান। চোখ ছাপিয়ে জল আসে কামিনীর। এত স্নেহের
কথা কেউ বলে না তাকে। বাবার কথা মনে পড়ে গেল। তিনিও
এমনি ক'রে স্নেহের ধমক দিতেন। এ কী ঈশ্বরদত্ত আশীর্বাদ পেল সে ?
কামিনী এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে বসে পড়ে। খাবারের ঠোঙাটা
টেনে নেয়।

হঠাৎ নজরে পড়ে খাটের নিচে উবুড় হ'য়ে পড়ে আছে একখানা বাধান
ছবি। আজ অনেকদিন হ'য়ে গেল—ওটা ওভাবেই রয়েছে। কামিনী হাতটা
ধুয়ে ফটোখানা তুলে নেয়। আঁচল দিয়ে কাঁচের ধুলোটা মোছে। টাঙ্গিয়ে
দেয় সেটাকে স্বস্থানে। তারপর ছবির নীচে গলার আঁচল দিয়ে প্রণাম করতে
গিয়ে হু হু ক'রে কেঁদে ফেলে !

ঠাকুরদার বাড়ি থেকে ফিরছিল ভূষণ আর নমিতা। কথা ছিল গণ-কল্যাণ সমিতির কয়েকটা বিষয়ে জরুরী আলোচনা হবে ঠাকুরদার ঘরে বিকালে। সমিতির এখনও তিনজনই মাত্র সভ্য। এ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাগচি সাহেব ওদের আনিয়েছেন যে সেদিনকার দাবী তিনি মেনে নিয়েছেন। নূতন পঞ্চায়েত গঠন করা হবে। এতে পাঁচটা ব্লকের পাঁচজন সভ্য নির্বাচিত করতে হবে। রীতিমত গণ-ভোট! অবশ্য ভোটের অধিকার থাকবে শুধু পরিবার পিছু একজনেরই। যার নামে প্রট। একদল আপত্তি করেছিল। তাদের মতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরই ভোট থাকা উচিত। যোগেন, ভূষণ প্রভৃতি ব্যাপহীরাও এই মতের স্বপক্ষে ছিল। ঠাকুরদা কিন্তু এটা মেনে নেন নি। তিনি বলেন—জিনিসটা অতবেলী ব্যাপক করলে গণগোল বাড়বে। চোরাই ভোট দেবার চেষ্টা হবে। হিসাবও বড় হয়ে পড়বে। প্রট হোল্ডারের সংখ্যা জানা আছে—তাদের পাকা লিস্ট আছে। অস্তুত এবারের মতো তাদের ভোট নিয়েই পঞ্চায়েত গঠন করা হ'ক। বাগচি সাহেব ঠাকুরদার মতই মেনে নিয়েছেন। যোগেন, কানাই অথবা ভূষণও আর আপত্তি করেনি।

সেই ভোটের-তালিকা প্রণয়ন করছেন অফিসের তরফ থেকে বাগচি সাহেব। এই সংক্রান্ত ব্যাপারে ঠাকুরদা সকলের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবেন বলে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কোন্ ব্লকে কাকে প্রতিনিধি হিসাবে গণ-কল্যাণ সমিতি নমিনেশান দেবে। শুধু নমিতা আর ভূষণ নয়—এজন্য কানাই, যোগেন, জীবেন প্রভৃতি আরও সাত আটজনকেও তিনি ডেকেছিলেন। ওরা এসে বসে রইল। অথচ ঠাকুরদাই অস্থগ্ন। শেষে কে একজন এসে বলে ঠাকুরদাকে ছপুয়ের ট্রেনে কলকাতাগামী একটা গাড়িতে উঠতে দেখেছে। আর একজন বলে একটি অস্থগ্ন লোকও নাকি ছিল তাঁর সঙ্গে। ব্যাপারটা বোকা গেল না। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে ওরা ফিরে এল।

যোগেন স্পষ্টই বিরক্ত হয়েছে। বলে : ভূষণদা, এসব কাজ ও বুড়ো

মানুষ দিবে হবেনা। আপনি আসুন। আমরা সবাই মিলে আপনাকে সভাপতি করি।

দেখা গেল আরও কয়েকজনের সমর্থন আছে এ প্রস্তাবে।

ভূষণ বলে : কিন্তু ঐ বুড়ো মানুষটাকে মেনে চলে সবাই। আমার কথাও হয়তো সবাই শুনবে—কিন্তু সেটা ভয়ে। ঠাঁর কথা শুনবে ভালোবেসে, প্রকার।

: কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন। ঠাকুরদার কোন কাণ্ডজান মেই। এতগুলো লোককে নিমন্ত্রণ করেছেন জরুরী মিটিংএ। নমিনেশন মিটিঙ। আর নিজেই চলে গেছেন কলকাতায়।

নমিতা বলে : কিন্তু ঐ অসুস্থ লোকটাকে হয়তো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। হঠাৎ কঠিন অসুস্থের কোনও রোগী দেখতে গিয়ে এটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে বোধ হয়।

ভূষণ প্রতিবাদ করে : হতে পারে। সেটা অল্প কারও উপর ভার দিতে পারতেন। কাউকে বলতে পারতেন একে হাসপাতালে পৌছে দাও। উনি যে কাজটা করতে গেছেন সেটা দলপতির কাজ নয়—যে-কোন খেচ্ছাসেবকের কাজ। আর যে কাজটা না ক'রে চলে গেছেন সেটা একমাত্র দলপতিরই কাজ।

নমিতা জবাব দেয় না।

ধীরে ধীরে ওরা বেরিয়ে আসে। যে দার বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

যোগেনও আসছিল ওদের দুজনের সঙ্গে। বলে : অনেক ঘাটের জল তো খাওয়া হ'ল ভূষণদা—এবার পাকাপাকি ভাবে যাতে এখানে মানুষের মতো বাঁচতে পারি সে চেষ্টা দেখুন। সব ক'টি শক্তিকে এক ঝাণ্ডার তলায় না আনতে পারলে চলবে না। এর মধ্যে রাজনীতিকে আমরা আনতে দেব না। কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই আমরা সম্পর্ক রাখব না। বাইরের নেতৃত্ব চাই না আমরা। আমাদের দাবী শুধু পুনর্বাসন। কাজ ক'রে মানুষের মতো বাঁচতে চাওয়ার দাবী। এটাকে সকল করতেই হবে।

ভূষণ বলে : বাগচি সাহেব লোক ভালোই হবেন মনে হ'চ্ছে। কিন্তু ঠাকুরদাকে দিবে কি চলবে এ কাজ ?

: আমিও তো তাই বলছি। ওঁর রক্ত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। বুড়ো হ'য়ে গেছেন। তাছাড়া দলপতি হবার যোগ্যতা বোধ হয় ওঁর কোনও দিনই ছিল না। অত ভালো মানুষ হ'লে পলিটিক্স হয়? একদিকে পাঞ্জি-পুঁথি তিথি-নক্স—আর অন্যদিকে সব মানুষের দেহেই ৮ নারায়ণ আছেন এই থিয়োরি! যতীশবাবু প্যাচ কষছেন তিনিও নারায়ণ আর বেটো হারামজাদ বদমাইসি ক'রে বেড়াচ্ছেন তিনিও নারায়ণ!

নমিত্তা বলে: কিন্তু ঐ বুড়ো-হাবড়া মাঝখানে আছেন বলেই আপনাদের মধ্যে এখনও দলাদলি বাধেনি। উনি স'রে গেলে ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য নেতা দেখা দেবে কলোনীতে—এও দেখে নেবেন!

ভূষণের ক্র কুঞ্চিত হয়। বলে: রাজা মারা গেলেও রাজ্য চলে নমিত্তা দেবী।

: অরাজকতাও চলে অনেক সময়ে। আমি বলছিলাম গণকল্যাণ সমিতির হাতে এখন লক্ষ কাজ। কত বিষয় চিন্তা করবার আছে, কাজ করবার আছে। আপনারা কিন্তু দেখছি একটি মাত্র চিন্তাতেই বিভোর—কি ক'রে দলপতিকে গদ্যচ্যুত করা যায়।

যোগেন রাগ ক'রে বলে: আপনি ভুল করছেন নমিত্তাদি।

: ভুল বলেই যেন বুঝতে পারি ভাই এটাকে। আমিই তাহ'লে খুলী হব সবচেয়ে বেশি। সত্যিই আমি ভাবতে পারছি না যে—সমিতি ভালো ভাবে গড়ে ওঠার আগেই তার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে গবেষণা করতে বসে যাবে দারা-মুজা-ওরফজের আর মুরাদ!

যোগেন হেসে বলে: এটা আপনার হিস্টি টীচারের মত কথা হ'ল নমিত্তাদি!

নমিত্তাও হেসে বলে: আমি তো টিচারই। দুঃখতো সেখানেই যোগেন ভাই! ইতিহাস আমরা পড়ি আর পড়াই। সাল তারিখ মুখস্থ করি। ইতিহাসের শিক্ষা কি আমরা গ্রহণ করি জীবনে? তাজমহল না গড়ে উঠতেই বুড়ো সাজাহানটাকে আগ্রা কোর্টে বন্দী করবার মতলবে আছি আমরা।

ভূষণ একটা কথাও বলে না। সে অবাধ হ'য়ে তার নমিতার পরিবর্তন দেখে। দশটা দিন আগে যেহেঁটা চোখ তুলে কথা বলতে পারতো না। মিটিঙে ওর নাম প্রস্তাব করলেন হেডমিস্ট্রিস—উঠে দাঁড়িয়ে কি বলতে গেল—কথা ফুটল না তার মুখে। সেই মুক যেহেঁটা এ কয়দিনেই কেমন মুখর হ'য়ে উঠেছে। যোগেন নায়েকের বয়স বছর কুড়ি বাইশ হবে। অনায়াসে তার দিদি হ'য়ে উঠেছে। ইতিহাসের শিক্ষা দিচ্ছে! ভূষণ বুঝতে পারে যোগেনকে বলেও আসলে নমিতা আঘাত করতে চাইছে ভূষণকেই। নমিতা বোধ হয় ভাবে নিতাইপদর আসনের প্রতি মোহ আছে ভূষণের। কলোনীর অবিসংবাদিত নেতা হওয়াটা গৌরবের সন্ধেই নেই—কিন্তু মোহের বশে ভূষণ তা পেতে চাইছে না। সে নিজেকে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হ'তে চায় না। সে চায় একজন দৃঢ়চেতা জননায়ক! সমস্ত কলোনীর ভালোমন্দ দেখবার ক্ষমতা যে রাখে। লোকগুলো শ্রোতের মুখে তৃণধণ্ডের মত ভেসে ভেসে বেড়িয়েছে আজ ছয় সাত বছর। ট্রানসিট ক্যাম্প, পি. এল ক্যাম্প, শেরালদা স্টেশান, হাওড়া ময়দান, স্ট্রাও রোড, এমন কি বিহার মধ্যপ্রদেশের অনেক ঘাটের জল খেয়ে এসেছে ওরা। যেখানে গিয়েছে উইপোকার মত ছোট ছোট টিপি গড়ে তুলেছে। মাথার উপর এক টুকরা ছাদ! ভেঙ্গে দিয়েছে কে বেন! আবার আশ্রয়হীন হ'য়ে পড়েছে ওরা। এতদিনে এসে পৌঁচেছে এই উদয়নগর কলোনীতে। এইবারই বোধ হয় ওদের শেষ চেষ্টা। এখানে যদি মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার পায় তবেই লোকগুলো আবার সামাজিক জীব হ'য়ে উঠবে—না হ'লে আর আশা নেই। এই দশ পনের হাজার লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার মত ক্ষমতালালী নেতা নন নিতাইপদ এটা বিশ্বাস করে ভূষণ। কিন্তু তাঁর বদলে দ্বিতীয় কোনও নেতার সম্ভান সে পায়নি আজও। কলোনীর দাবী দৃঢ়কণ্ঠে জানাতে হবে কর্তৃপক্ষের কাছে—সে দাবীর পিছনে শুধু যুক্তি আর জোর থাকলেই চলবে না—থাকা চাই খানিকটা ঔদ্ধত্য! অনশন ধর্মঘটের হুমকি দিতে হবে। প্রেসেশন ক'রে বিধানসভায় গিয়ে পিকেটিং করবার ভয় দেখাতে হবে—না হ'লে

জন্মের দাবী যেমন নেবে না কেউ। সে সব কাজ ঠাকুরাকে দিয়ে
হবে না।

ভূষণ কিন্তু কোনও কথা বলে না।

নমিতাও বলে না কোন কথা।

সেও ভাবছিল ঐ একই কথা—তবে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। নিতাইপদকে
সে ইতিমধ্যে ভালোবেসে ফেলেছে। ঐ নরগাত্র শুভ্রকেশ অমায়িক বৃদ্ধটির
মধ্যে সে দেখেছে একজন ~~অত্যন্ত~~ দরদী মানুষকে। সে বুঝেছে যে এই
লোকটিকে নেতৃত্বপদে রাখতে পারলে সামগ্রিক উন্নতি হ'তে পারে
কলোনীর। নিতাইপদ সত্যই দেখছেন তাজমহলের স্বপ্ন—সে স্বপ্নও প্রেমের-
মন্দির। মানব-প্রেমের। এ কলোনীর সাম্রাজ্যের মাঝখানে ঐ একক বৃদ্ধকে
মনে মনে এরা কেউ চাইছে না। নমিতা আজকাল বড় বড় কথা ভাবতে
শিখেছে।

পায়ে পায়ে ওরা যখন বাড়িতে এসে পৌঁছায় তখন নমিতা লক্ষ্য করে
কখন অলক্ষ্য যোগেন চলে গেছে নিজের পথে। নমিতা আর ভূষণ বাড়ি
তুকতেই লভু এসে ভূষণকে বলে : আপনি তো বেশ লোক, মিঠুকে
কানাইদার বাড়িতে একলা রেখে দিয়ে কোথায় কোথায় আড্ডা মেরে
বেড়াচ্ছেন।

ভূষণ হেসে বলে : একলা রেখে যাব কেন ? ঠান্ডির চার্জে রেখে
গেলুম তো ওখানে।

: ও! ঠান্ডি আপনার মাইনে-করা বাদী কিনা। দায় পড়েছে
আমায়।

লভুর কোলে খুমন্ত মিঠুরা।

নমিতা রীতিমত বিস্মিত হয়। ভূষণকে বলে : লভুর সঙ্গে তো বেশ
ভাব হ'য়ে গেছে দেখছি আপনার।

ভূষণও বিস্মিত হয় : কেন আপনি জানতেন না ? ঠান্ডি তো প্রায়ই
যায় আমাদের বাড়ি। মিঠু ওকে ছেড়ে থাকতেই চায় না! পিসীমার সঙ্গেও

লতুর খুব-ভাব হ'য়ে গেছে। আপনিই যান না বলে অস্থবোধ করছিলেন তিনি। কই আপনি তো একদিনও গেলেন না।

নমিতা অস্তমন্য হ'য়ে পড়ে। লতু ভূষণবাবুদের বাড়ি প্রায়ই যায়। পিসীমার সঙ্গেও লতুর আলাপ হ'য়ে গেছে? কই এসব কথা তো ঘূণাকরেও জানায়নি লতু? কেন জানায়নি। এটা গোপন করার কারখানা কি হ'তে পারে?

ভূষণ লতুর দিকে ফিরে বলে : ঠান্ডি, তোমার অর্ডারি জিনিস এসে গেছে—দেওয়া হ'য়ে ওঠেনি—তুমি কাল যাওনি বলে।

ভূষণ পকেটের ভিতর হাত ঢালায়।

লতু তাড়াতাড়ি বলে : আচ্ছা সে হবে এখন।

চলে যায় সে পাশের ঘরে—মিঠুকে কোলে নিয়ে।

লতু লক্ষ্য করেছে নমিতার ভাবান্তর। ও যে ভূষণবাবুদের বাড়ি গিয়ে আলাপ ক'রে এসেছে এটা না জানানোতে দিদি অবশ্য রাগ করতেই পারে। দুই বোনের মধ্যে লুকোচুরির স্থান নেই। কিন্তু কি জানি কেন এ সত্যটা স্বীকার করতে লতু সঙ্কোচ বোধ করেছে প্রতিবারই। অনেকবার বলতে চেয়েছে—কিন্তু দিদি হাসবে মনে হওয়ায় বলা হ'য়ে ওঠেনি। এখন দিদির চুপ ক'রে বসে থাকার ভঙ্গিটার সেজন্ত অস্থবোধনা হয়। লতু মনে মনে হির করল ভূষণদা চলে গেলেই দিদির গলাটা জড়িয়ে ধরে বলবে : দিদি রাগ করেছিল?

দিদি বলবে : রাগ করব কেন? রাগ করিনি।

: নিশ্চয়ই করেছি। তোকে না বলে ভূষণদাদের বাড়ি গেছি বলে?

: গেছি তো বেশ করেছি।

: ঐ তো রাগের কথা। রাগ করিনি তো হাস দিকিন।

দিদি হেসে ফেলবে তখনই। এটুকু বিশ্বাস লতুর আজও আছে—দিদির উপর। ঘরের পাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে সে ভূষণের গ্রন্থানের অপেক্ষায়।

ভূষণ এক জোড়া গাউটিকের চুড়ি বার করে পকেট থেকে। রেখে

দেয় টেবিলের উপর। নমিতা এতক্ষণে কথা বলে : এটা কিন্তু আপনার
অস্তায়।

: কোনটা?

: এভাবে ওকে উপহার দেওয়া।

: কি বলছ নমিতা! লতু এখনও ছেলেমানুষ।

: ছেলেমানুষ যে নয়—সেটা আমিও বুঝি, আপনারও না বুঝবার কোনও
কারণ নেই।

ভূষণ একটু অবাক হ'য়ে যায়। এ কথার মানে? একটু অপমানিতও বোধ
করে নিজেকে। তবু হেসে জিনিসটা লগু করে। বলে : একবার যখন
দিয়ে ফেলেছি তখন আর আপত্তি নাই করলে। তাছাড়া ওর সঙ্গে দুদিন
পরেই তো একটা নিকট এবং মধুর সম্বন্ধ হ'তে যাচ্ছে—সুতরাং এটা
এমন কিছু অপরাধ নয় নিশ্চয়ই।

নমিতা উঠে দাঁড়ায়। যাবার সময় বলে যায় : আপনি ভুল করছেন
ভূষণবাবু। যে নিকট এবং মধুর সম্পর্কের ইঙ্গিত করছেন আপনি তা হ'বার
নয়। আমি রাজি নই! তবে যে উপহার ও নিজমুখে চেয়েছে—আর যা
আপনি মনে করে কিনে এনে বাড়ি বয়ে দিয়ে গেলেন তা ফেরত নিয়ে যেতেও
বলছি না আমি।

নমিতা দ্রুতপদে চলে যায় ওঘরে।

স্তব্ধ বিন্ময়ে মূক হ'য়ে বসে থাকে ভূষণ। মুখটা স্নান হ'য়ে আসে ওর।
সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢোকে লতু। ছম ক'রে নামিয়ে দেয় মিঠুকে। আর
টেবিল থেকে স্নাস্টিকের চুড়ি ছুটো তুলে ছ'হাতের চাপে ভেঙ্গে ফেলল সেটা।
কোন কথাই না বলে বের হ'য়ে গেল ফের।

ভূষণ মিঠুয়াকে কোলে নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

সি-ব্লকে সুরেখা দেবীর বাড়িটিই বোধহয় কলোনির সব চেয়ে সুসজ্জিত
বাড়ি। দামী আসবাবে তার আতিজাত্য নয়। স্বরচিত্র পরিচয়েই সেটি

সুশোভিত। ঘরজা জানালার পর্দা টাঙানো। কয়েকটি স্মিথের সঙ্গে লাগানো কুঁচি দেওয়া হালকা নীল পর্দা। শরনকক্ষ একটি মাত্র। বসার ঘরও এটাই। তার একদিকে একটি চৌকি পাতা। সাদা ধবধবে একটা পাটভাঙা চাদর টানটান করে বিছানো। ঘরের এককোণে একটি মাটির কলসি। আর কাঁচের গ্লাস। কয়েকটি শাস্ত্রনিকেতনী মোড়া। সূচের কাজ করা নক্সা কাটা ঢাকনি। এক কোণে আপাদমস্তক নীল কাপড়ে ঢাকা একটা সেতার। টেবিলের উপর ফুলদানিতে কয়েকগুচ্ছ রজনীগন্ধা। ফুল সুরেখা দেবীর বাগানেই হয়। ফুলদানির পাশে ক্রেমেবাঁধানো একখানা ফটো। বছর বাইশেক বয়সের একজন যুবক।

যে ঘরে সুরেখা দেবীর প্রাকবিবাহ জীবনের বেশীর ভাগ কেটেছে তার ভুলনায় যদিও এ গৃহশয্যা অকিঞ্চিৎকর—তবু কলোনীর ছন্নছাড়া জীবনে এটাকেই হঠাৎ মরুভূমির মাঝখানে মরুজ্ঞানের মতো মনে হয়। কক্ষির বেড়া দিয়ে বাড়ির চারদিক ঘেরা। সন্ধ্যামালতী আর অপরাজিতার গাছ লাগানো হয়েছে—যদিও বাড়িতে পায়নি সেগুলি যথেষ্ট। আগামী বর্ষার পর হয়তো ছেয়ে ফেলবে ওরা কক্ষির বেড়াকে। সুরেখা দেবী শুধু সম্পন্ন ঘরের মেয়ে নন—রীতিমত ধনীর কন্যা তিনি। বিবাহও হ'য়েছিল ধনীর ছুলালের সঙ্গে। ভাগ্যবিপর্যয়ে তিনি পিতৃগৃহ-স্বামীগৃহ দুইই ত্যাগ ক'রে এসে কর্মসংস্থান করছেন উদয়নগর কলোনীতে। যারা বলে তাঁর সখের চাকরি—তাঁরা ওর জীবনের সব কথা জানে না বলেই ঐ ভুল কথাটা বলে।

জানালা দিয়ে হেডমিস্ট্রেস দেখতে পেলেন—নমিতা কক্ষির গেট খুলে ভিতরে আসছে। নমিতা মেয়েটিকে তিনি স্নেহ করেন। স্কুলের অন্ত্যান্ত শিক্ষয়িত্রীর এ নিয়মে একটা গোপন অভিযোগ ছিল। আর সেটা অজানাও ছিল না তাঁর।

: এসো নমিতা—কি খবর?

: আপনি আমাকে এ কী ক্যাসাদে ফেললেন বলুন দেখি। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় কলোনীর মেয়েরা আমার কাছে আসতে শুরু করেছে। কারও ক্রি

র্যাশন বন্ধ হ'য়েছে—তাতে আপত্তি। কেউ পি.এল ক্যাম্পে যেতে চায় তার আর্জি, কেউ চায় কাজ। বত বুঝিয়ে বলি এসব বিষয়ে কোনও ক্ষমতা নেই আমার—ওরা বোঝে না।

ওর ছেলেমাছুষি আর আবদার করার ভঙ্গিতে সুরেখা দেবী কৌতুক বোধ করেন। বরসে বোধ হয় ছুজনে প্রায় সমবয়সী। কিন্তু শিক্ষা ও পদমর্যাদার তিনি অনেক উঁচু মঞ্চ থেকে বড়বোনের মতই ওকে উপদেশ দিলেন—প্রথম প্রথম এ সব অসুবিধা একটু হবেই। ওদের অভিযোগগুলো আপাতত শুনে যাও। নোট বইতে লিখে রাখ। নিতাইবাবুর গণকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে কলোনীতে শীঘ্রই নানারকম কাজ শুরু হবে। তুমি তখন সত্যিই পারবে এদের নানাভাবে সাহায্য করতে।

নমিতা বলে : ও, আপনি জানেন না বুঝি। আমাদের গণকল্যাণ সমিতি কর্তৃপক্ষের 'এ্যাক্শন' পেয়েছে। প্রত্যেক ব্লকের প্রতিনিধি গণভোট নিয়ে নির্বাচন করা হ'বে। তাদের দিয়েই নতুন পঞ্চায়েত গড়া হবে। আগের পঞ্চায়েত বাতিল হয়ে গেছে।

সুরেখা দেবী বলেন : গেছে নয় বল যাবে। নতুন কমিটি কার্যভার নিলে পুরান পঞ্চায়েত তখনই বাতিল হবে।

: না! ওটা বাতিল হয়েই গেছে। এখন আমাদের এ্যাক্শন কমিটিই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

: অর্থাৎ তুমি আর ভূষণবাবু?

: আর নিতাই ঠাকুরদা।

: তিনি তো বড়ো মানুষ। তোমাদের ছুজনকেই সামলাতে পারছেন না—সারা কলোনীর এতগুলি লোককে তিনি ঠেকাবেন কি ক'রে?

: মানে?—বিস্মিত হয় নমিতা।

সুরেখা দেবী মিটি মিটি হাসেন।

: যাক। তা কি বলতে এসেছ বল?

নমিতা একটু ইতস্তত করে তারপর বলে : আমি কিছু এ কমিটিতে থাকব না। আপনি অন্ত কাউকে এ তার দিন।

: সেকি, কেন বলত ?

: ঐ যে বলায়—সারাদিন আমার বিরক্ত করে।

: জনকল্যাণের কাজ করবে—আর তোমার কাছে কেউ কিছু বলতে এলে বিরক্ত বোধ করবে, এতো হয় না নমিতা। হবেও বা—আমিই হয়তো ভুল করেছি। সত্যিই যদি বিরক্ত বোধ করে থাক তবে পদত্যাগ করাই উচিত তোমার। তবে সে কথা আমাকে বলতে আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। নিতাইবাবুকে বল।

: বাবে ! আপনিই তো আমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন।

: ভুল করেছিলাম নমিতা। আমি তোমাকে অন্ত জাতের মানুষ ভেবেছিলাম !

দুজনেই চুপ। স্বরেখা দেবী জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছেন। নমিতা নখ দিয়ে টেবিলক্ৰখটা খুঁটতে খুঁটতে বলে : আপনি রাগ করেছেন।

: রাগ ঠিক করিনি। তবে দুঃখ পেয়েছি। মানে আমি সত্যি ঠিক আশা করিনি এটা। তোমার আসল আপত্তিটা কি বলত ?

নমিতা তখনও ইতস্তত করে। তারপর হঠাৎ বলে ফেলে : এ কমিটির সঙ্গে আমার কাজ করা পোষাবে না।

: কেন বলত ? তোমাদের নিতাই ঠাকুরদা শুনেছি খুবই ভালোমানুষ। ভূষণবাবুর সঙ্গেও তো তোমার যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা।

: অন্তরঙ্গতা ? মানে ?

: ও এতক্ষণে বুঝেছি ! মান অভিমানের পালা চলছে বুঝি ?

নমিতা রীতিমত বিব্রত হ'য়ে পড়ে : না, না ! মানে এসব কি বলছেন আপনি ?

স্বরেখা দেবী কৌতুক বোধ করেন, স্মিতহাস্তে বলেন : কিছু কিছু আমি অবশ্য শুনেছিলাম—শোভনা দেবীর কাছে। স্কুলের সাধনে কয়েকদিন

ভয়লোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আমার সন্দেহ হয়—তারপর জানতে পারি উনি তোমার খোঁজেই আসেন। কি একটা যৌথ ব্যবসা নাকি চালাচ্ছ তোমরা। তখনও এতটা বুঝিনি।

নমিতা চূপ ক'রে থাকে। প্রতিবাদ করাটা উচিত মনে হয়; কিন্তু কি ভাবে প্রতিবাদ করলে জিনিসটা অস্বীকার করা যায় বুঝে উঠতে পারে না।

হেডমিস্ট্রেসই বলেন : উনি তোমাদের কমিটিতে থাকাই কি তোমার আপত্তির কারণ ?

: সেও একটা কারণ বটে ; তাছাড়াও মানে—

: অর্থাৎ তা ছাড়াও কোন কারণ উদ্ভাবন করতে পারো তুমি। আচ্ছা তা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু প্রথম কারণটাই বিস্তারিত শুনি আগে।

নমিতা মরিয়া হ'য়ে বলে ফেলে : ভূষণবাবুর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না আমি। সেলাইয়ের কারবারও বন্ধ করে দিচ্ছি। অন্য সূত্রেও কোন যোগাযোগ রাখতে চাই না।

সুরেখা দেবী গভীর হ'য়ে বলেন : এতদূর ? যদি আপত্তি না থাকে তবে গভীরতর কারণটা ব্যক্ত করতে পারো তুমি। অবশ্য তোমাকে বলতে বাধ্য করছি না আমি। ব্যবসাটা বন্ধ করার কারণ অর্থনৈতিক নাকি ?

: না না, টাকা পয়সার ব্যাপারে উনি খুব পার্টিকুলার।

: ভূষণবাবু চরিত্রবান সং প্রকৃতির লোক বলেই মনে হয়েছে আমার—

: আমিই কি তা অস্বীকার করছি ?

: তবে কারণটা অর্থনৈতিক নয় আধিভৌতিকও নয়—সুতরাং ধরে নিতে পারি কারণটা হৃদয়ঘটিত।

নমিতা রীতিমত লাল হ'য়ে ওঠে : এভাবে জেবা করলে আমি জবাবই দেব না।

প্রাণ খুলে হাসেন সুরেখা দেবী : কেনেছ ; আমার কি এটুকুও রসবোধ নেই। হৃদয়ঘটিত ব্যাপার শোনার পরেও জেরা করব আমি ? কিন্তু

গুসব হ'চ্ছে শরতের মেঘ! গুর ভগ্নে 'মেজর' কোনও 'ডিসিসন' নিতে নেই।

নমিতা তবু ডর্ক করে : কিন্তু আপনিই তো এখুনি বলছিলেন ওঁকে আমার পিছনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আপনারই সন্দেহ হ'য়েছিল—এবং খবর নিয়ে জেনেছেন যে একটা অর্থ নৈতিক কারণেই আমরা মেলামেশা করি। সাধারণ লোকে তো এটাকে অন্য চোখেও দেখতে পারে। আমার একটা বদনামও হয়ে যেতে পারে।

: অন্য লোক কেন আমিই তো ওটা অন্য চোখে দেখেছি। কে বলে আমি বিশ্বাস করেছি তোমাদের মেলামেশাটার আসল কারণ ব্যবসা ঘটিত ?

নমিতা ক্যালক্যুল করে তাকিয়ে থাকে।

: বোকার মত দেখছ কি ? বেশ তো, বদনাম যদি খুব বেশী হ'য়েই পড়ে তখন একটা ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে। ভূষণবাবুকে বল্লই সে এক ফোটা সিঁচুর দিয়ে সকলের মুখ বন্ধ করে দেবে। তা সে পারবে। তুমিই বলে দেখো না।

ঐ এক ফোটা সিঁচুরই বুঝি ছড়িয়ে পড়ে নমিতার সারা মুখে।

আর কিছু বলতে পারেনা।

নমিতা বাড়ি ফিরে এলো হাল্কা মন নিয়ে। অনেকদিন পরে আবাস গুন্‌গুন্ করে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার। সুরেখাদি লোকটি কিন্তু ভারী অসভ্য। এমন মিটি মিটি হেসে কথা বলেন যে প্রতিবাদ করবারও অবস্থা থাকে না। বাড়ি এনে পৌছাতে লতু ওঁকে একগাদা ছিট এনে দিল। বল্ল : একটি ছোট ছেলে এগুলো দিয়ে গেছে। বলেছে এই মাপে জামাগুলো বানিয়ে রাখতে। পরের সপ্তাহে এসে নিয়ে যাবে।

: ছোট ছেলে ? কে রে ?

: কি জানি, চিনি না।

নমিতা হতাশ হয়। সে ভেবেছিল অন্তত সপ্তাহান্তে ভূষণ একবার আসবে। আজ শনিবার। ভূষণের আসার কথা। এ কয় সপ্তাহ অবশ্য সে

সুখাফের মাঝেও এসেছে। আজ শনিবারে জামা দেবার অহিনার ভূষণ একবার এ বাড়ি আসবে এটা অল্পমান করেছিল নমিতা। মনে মনে ওর আগমনের যে প্রতীক্ষা করছিল সেটা টের পেল আশাতদের পর। তবে ভূষণকেও দোষ দেওয়া যায় না। সেদিন ওকে যে রকম কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে তাতে ওর অভিমান হওয়াই স্বাভাবিক। কেমন যেন লজ্জা বোধ করে নমিতা। সেদিন হঠাৎ ওরকম রুঢ় ব্যবহার করার সত্যিই কি কোনও কারণ ছিল? ভূষণ তো কোনও অশ্রায় করেনি। লতুই বা অশ্রায়টা করল কোথায়? লতু যদি কিছু বুঝতে পেরে থাকে? কিন্তু বুঝবারই বা কি আছে এতে? নিজেকেই নমিতা ধমক দেয়। লতুর সঙ্গে ভূষণের যদি ঘনিষ্ঠ আলাপ হ'য়ে থাকে, অথবা ভূষণ যদি লতুর সঙ্গে মনে করে একজোড়া প্লাস্টিকের চুড়ি কিনে আনে তাতে নমিতার কষ্ট হবার তো কোনও কারণ নেই! লতুকে এ নিয়ে হিংসা বা ঈর্ষা করবে কেন নমিতা? ঈর্ষা! কথাটা মনে হতেই ঠাস করে একটা চড় মারে নমিতা মনের গালে! কী পাগলের মত ভাবছে সে? লতুকে ডাকে : লতু শোন।

লতু এসে চুপটি করে দাঁড়ায়।

: ইয়ারে, সেদিন বকেছিলাম বলে রাগ করেছিস? তুই কেন বলিস নি আমাকে যে ভূষণীকাকের সঙ্গে তোর ভাব হ'য়ে গেছে? কেন বলি না যে ওদের বাড়িতে তুই যাতায়াত করিস?

লতু জবাব দেয় না।

: কী? এখনও অভিমান গেল না? তুই কী রে? নিজেকে দোষ করলি আর আমার উপর রাগ করেছিস? আমি কি বারণ করেছি ওদের বাড়ি যেতে?

লতু গম্ভীর হ'য়ে বলে : ও কথা যাক দিদি! আমি তো আর বাই না।

: কেন? যাস না কেন? আমি বারণ করেছি? তোর যদি ভালো লাগে যাস যত খুশী ভূষণীকাকের বাসায়।

: থাক দিদি। ও রসিকতা আমার ভাল লাগে না।

লতু ধীরে ধীরে চলে যায়। নমিতা ভেবেছিল লতুকে পাঠিয়ে ভূষণকে

ভেকে পাঠাবে। সেলাইয়ের 'কাট' সংক্রান্ত কথাবার্তা শুরু ক'রে সেদিনের
ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবে। কিন্তু লতুর ভাবগতিক দেখে ও একটু অবাক হয়।
লতুর এতটা গম্ভীর ভাব তো স্বাভাবিক নয়। ব্যাপার কি! সেদিন বাইরের
লোকের সামনে ও কথা বলায় বোধ হয় অপমানিত বোধ করেছে খুব। ছুখ
হয় নমিতার। আবার ডাকে : লতু শোন!

আবার এসে দাঁড়ায় লতু।

: তোর কি হয়েছে বলতো? কথাই বলছিস না ভাল ক'রে?

লতু একবার তাকায় দিদির দিকে। চোখাচোখি হয়। তৎক্ষণাৎ সে চোখ
নিচু করে। অশ্রুটে বলে : কিছু হয়নি। আর কিছু হ'য়ে থাকলে তা তুমিও
জানো, আমিও জানি।

বলেই বেরিয়ে যায়।

নমিতা রীতিমত অবাক হয়ে যায়। আর কিছু বলে না।

রাত্রে আহালাদির পর নমিতা সেলাই নিয়ে বসেছিল। আজই কয়েকটা
জামা কেটে রাখতে হবে। লতু ঘুমিয়েছে পাশেই। নমিতা আর লতু এক
বিছানাতেই শোয়। - বিদুবাসিনী এসে বলেন : নমু, তোর বাবা একবার
ডাকছে তোকে।

হাতের কাজটা গুছিয়ে রেখে নমিতা এসে বসে বাপের পাশে।

বৃদ্ধ একটু ইতস্তত করে বলেন : ইয়ারে অল্পর কোনও খবর
পেয়েছিস?

: না বাবা।

: খবর নেবার চেষ্টা করেছিলি?

: না। মনি-অর্ডার ফেরত আসার পর আমি আর চেষ্টা করিনি।

বৃদ্ধ মাথা নাড়েন : মনি-অর্ডার যে ফেরত আসবে এটা আমি জানতাম।
সে বড় অভিমানিনীয়ে।

বিন্দুবাসিনী স্বাভাৱে সন্দেহ বুলেন : তুমি আৰ আধিক্যতা ক'বনা। টাকা
কেৱলত দেওৱা হ'ল। বাবলুকে আটকে ৰাখা হ'ল। তিনি হ'লেন অভিমানিনী !
আমাৰ ৰোগা ছেলেটো কেমন আছে বাবলুকে পাঠিয়ে তা একটা খবৰও দিতে
পারল না এতিয়া ? আৰ সে ছেলেটাই বা কেমন ? মা-বাপেৰ কথা মনেও
পড়ে না ?

নমিতা বলে : সে নিশ্চয়ই আসতে চায়—বৌদি আসতে দেয় না।

হৰিপদ বলেন : সে যাই হোক। তোমাকে আৰ একটা কথা বলব বলে
ছেকেছি। ভূষণেৰ কথা !

নমিতা বুঝতে পারে প্রশ্নটো কি। হেডমিষ্ট্রেস যেটা অত সহজেই বুঝতে
পেৰেছেন—সেটা যে বাবা-মাৰ চোখ এড়াবেনা এটা বোঝা সহজ। হঠাৎ এ
প্রশ্নটোৰ সে লজ্জায় জড়সড় হ'য়ে পড়ে। বাপেৰ স্নেহমাখা কণ্ঠস্বৰে নমিতাৰ
শরীর অবশ হ'য়ে আসে। মনে পড়ে যায় তাৰ অতীত যৌবনেৰ ইতিহাস।
ওকে পাত্ৰস্থ কৰাৰ কৌশল আছিল বৃদ্ধেৰ। তাঁৰ নমিতা মায়েৰ কদৰ
কেউ বুঝল না—এ অভিযোগ তাঁৰ বৰাবৰই ছিল দুনিয়াৰ উপৰ। শেষ দিকে
নমিতা যখন জানিয়েছিল যে সে বিয়ে কৰবেনা তাৰ পৰ থেকে বৃদ্ধ কখনও এ
প্রসঙ্গ তোলেন নি। আজ দীৰ্ঘদিন পৰে উঠে পড়েছে সেই আলোচনা। পঁচিশ
বছৰেৰ উদ্বাস্ত মেয়েটি ইতস্তত কৰে। কি কৰে সে স্বীকাৰ কৰবে যে ঐ মা-
হাৰা মেয়েটিৰ বাপকে সে ভালবেসে ফেলেছে। তাৰ আজীবন কুমাৰী
ধাৰাৰ প্রতিজ্ঞাটো ভাসিয়ে দিয়েছে ঐ বলিষ্ঠ গঠন যুবকটি এক নিমেষে !
অনিবার্য প্রশ্নটোৰ প্রত্যাশায় উদ্বেল-হৃদয়ে প্রতীক্ষা কৰে নমিতা।

বৃদ্ধ বলেন : ভূষণ কি বিবাহেৰ কোনও প্রস্তাব এনেছিল ?

নমিতা চুপ কৰে থাকে।

ক্লক স্বৰে বৃদ্ধ বলেন : আৰ তুই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কৰেছিল ?

নমিতা এবাৰও নীৰব। বাপেৰ ক্লক স্বৰে প্রথমটা সে চমুকে উঠেছিল
বটে কিন্তু পৰমুহূৰ্তেই তাৰ অন্তৰ্নিহিত কাৰণটো মনে পড়ে যাওয়ায় আৰ ৰাগ
থাকে না। ৰাগ বাবা-মা কৰতে পাৰেন বটে। মেয়েকে সম্পাত্তে দান কৰতে

কে না চায়—তাছাড়া তাকে পাজর করতে কী অপরিণীম চেষ্টা করেছেন বৃদ্ধ পণ্ডিত। সেই বাহ্যিক অতিথিটি আজ নিজেকে খেকে ঘারে এসে উপস্থিত আর নমিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ কথা জানবার পর রাগ করতে পারেন বটে ওঁরা। কিন্তু নমিতা কি ক'রে বলবে যে ক্ষণিক মনোবিকলনে সে হঠাৎ প্রত্যাখ্যান ক'রে বসেছে বটে তবু ওর সমস্ত অন্তঃকরণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে বসে আছে তার ফিরে ডাকার প্রতীক্ষায়? কবে এসে সে তাকে বলবে—‘তোমার প্রত্যাখ্যান আমি মানি না। তুমি আমার। আমি জোর ক'রে তোমাকে নিয়ে যাবো আমার বাড়ি! আমার ভালবাসাকে আমি ব্যর্থ হ'তে দেবনা তোমার খামখেয়ালির জন্তে।’

বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে বলেন : এটা তুমি ভালো করনি নমিতা!

নমিতা একটু চমকে ওঠে ওর কণ্ঠস্বরে। হঠাৎ ‘তুমি’ সম্বোধন এবং ‘নমিতা’ ডাকটা কানে বাজে ওর। বলে : কেন বাবা?

: তোমার উচিত ছিল আমাকে জিজ্ঞাসা করা। তোমার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করা।

নমিতা জবাব দেয় না। বৃদ্ধ বাপের অভিমানের একটা অর্থ খুঁজে পায় সে। ও হাসে মনে মনে। মনে পড়ে সুরেখা দেবীর কথাগুলি : ও সব হ'চ্ছে শরতের মেঘ।

: নিজের সম্বন্ধে তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো। তোমার উপার্জনে বেঁচে আছি আমরা। তুমি নিজেকে বিয়ে করতে চাওনি—আমি বাধা দিইনি। কিন্তু লতুর বিবাহ সম্বন্ধে কোনও অভিমত জানানোর আগে তোমার উচিত ছিল বাপের সঙ্গে পরামর্শ করা—তা হ'ক সে বাপ অন্ধ, পঙ্গু!

: কি বলছ বাবা?

: ঠিকই বলছি নমিতা! আজ সন্ধ্যাবেলা ভূষণের পিসীমা এসেছিলেন তোমার মায়ের কাছে। তিনি বললেন ভূষণ নাকি লতুর সঙ্গে বিবাহের একটা প্রস্তাব এনেছিল—আর তুমি তা প্রত্যাখ্যান করেছ। কারণটা তিনি জানতে এসেছিলেন তোমার মায়ের কাছে।

নমিতা আশ্চর্য হ'রে বলে : ভূষণবাবু লতুর সঙ্গে বিয়ের একটা প্রস্তাব এনেছিলেন ?—আর আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি ? একথা বললেন তাঁর পিসীমা ।

: তাই তো বললেন ।

: তিনি তা জানলেন কি ক'রে ?

বিন্দুবাসিনী এতক্ষণে কথা বললেন : আমি তা জানতে চাইনি । সম্ভবত ভাইপো নিজেই জানিয়েছে তাঁকে । আমি বলেছি আমাদের আমলে ছেলে-মেয়ের বাপ-মায়েই কথাবার্তা চালিয়ে এসেছে । আপনার ছেলে যখন বাপ-মার বদলে পাত্রীর দিদির কাছেই প্রস্তাব তুলেছে—তখন সেই দিদির কাছ থেকেই জবাবটা শুনবেন । উপার্জনকম ছেলেমেয়ের গলগ্রহ বই তো নই ?

নমিতা বলে : কি ক'রে এ কথা রটেছে জানি না । রাগ অভিমান তোমরা করছ কর, বারবার উপার্জনকম বলে আঘাত দিচ্ছ দাও—তবে একটা কথা জেনে রাগ ক'র । ভূষণবাবু ওরকম কোন প্রস্তাব আমার কাছে করেন নি, আর আমিও তা প্রত্যাখ্যান করিনি তোমাদের না জানিয়ে । গালাগাল দিচ্ছ দাও, তবে পরের মুখে মিথ্যা কথা শুনে না দিয়ে—নিজের কানে সত্যি কথাটা শুনে তারপর গাল দাও !

: আর নিজের কানে যদি মিথ্যা শুনি দিদি ?

চমকে যুরে দাঁড়ায় নমিতা ।

লতু উঠে এসেছে শয্যা ছেড়ে । দাঁড়িয়ে আছে ঘরের পাশে ।
নমিতার মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে ? বলে : কী ? কি বলি ?

: বলছি যে নিজের কানে যদি মিথ্যা শুনি তখনও কি চূপ করে থাকব ?
আমি যে নিজের কানে শুনেছি দিদি ! উনি বললেন—লতুর সঙ্গে তো আমার একটা নিকট আর মধুর সম্পর্ক হ'তে চলেছে, আর তুমি ঈর্ষায় জলে উঠে বলে—‘সে নিকট সম্পর্ক হবার নয়—আপনি ভুল করছেন ভূষণবাবু—আমি রাজি নই !’

ঝড় স্বরে হরিপদ পণ্ডিত গর্জন করে ওঠেন : নমিতা ! কোনটা সত্যি ?
একথা তুমি বলেছিলে ?

হরিপদ পণ্ডিতের এ কণ্ঠস্বরকে চিরকাল শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে চক্রবর্তী-
পরিবার ! শুধু নমিতা নয়, পরিবারের প্রত্যেকটি লোকই । কামিনীকে ত্যাগ
করে আসার দিনও নমিতা উপার্জন-সম্বন্ধে কি একটা বাক্য ইঙ্গিত করার
অমনি গর্জন করে উঠেছিলেন পণ্ডিত । সেদিন সে কণ্ঠস্বরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে
গিয়েছিল নমিতা । আজ কিন্তু নমিতা একটুও বিচলিত হল না ও স্বরে ।
সেটা লক্ষ্য করেছিলেন বিন্দুবাসিনী । এই দৃঢ় কণ্ঠস্বরের পরিণাম তিনি অন্তত
ভাল করেই জানেন । দীর্ঘ চল্লিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে এ স্বর তিনি
শুনেছেন মাত্র কয়েকবারই । সে কয়বারই লক্ষ্য করেছেন তিনি জীবনে
এসেছে একটা বড় রকমের পরিবর্তন । আজ নমিতা এ কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলনা
দেখে অবাক হয়ে গেলেন বিন্দুবাসিনী । নমিতা কি এতদূর বদলে গেছে ?
রোজগার করছে বলে ? চাকরি পেয়েছে বলে ? গণকল্যাণ না কি সমিতির
নেতা হ'য়েছে বলে ? নইলে কেন সে এ আছানে মাটির সাথে মিশিয়ে
গেল না ?

আসল কারণটা তিনি আন্দাজই করতে পারেন নি । নমিতার কানে
গর্জনটা প্রবেশই করেনি । লতুর একটা ছোট্ট কথা তপ্ত লৌহ শলাকার মতো
তার কর্ণপটাহ বিদীর্ণ ক'রে মর্মস্থল পর্যন্ত দখল ক'রে দিয়েছিল । আর কিছু সে
শুনতে পারনি ।

আর্তস্বরে নমিতা লতুকেই প্রশ্ন করল : কি বলি ? ঈর্ষায় ?

: না তো কি ? ছোট বোনের বিয়ের সম্বন্ধ আসছে, অথচ বড়—

: বাস্ চুপ !—গর্জন ক'রে ওঠে নমিতা !

লতুর নীচ অন্তঃকরণের ক্রোদাক্ত পরিচয় পেয়ে শিউরে উঠেছে সে । একটা
কথা বলবার স্পৃহা হয়না তার । কী লজ্জা ! লতুর মনে এই ছিল ?
মাতালের মত টলুতে টলুতে গিয়ে সে শুয়ে পড়ে নিজের বিছানায় ।

একটু দূরেই শুয়ে আছে লতু । প্রাণ খুলে সে কাঁদতেও পারে না । কি

জানি যদি সবাই ভাবে এ কারাও উপেক্ষিতা, অনাদৃত্য, বিগত-যৌবনা নারীর ! এ কারা যে কতবড় দুঃখের কারা তা তো কেউ জানতেও পারবে না ।

বৃদ্ধ হরিপদও যেন ফুরিয়ে গেছেন । তাঁর ঐ রুঢ় গর্জনের সামনে চক্রবর্তী পরিবার চিরদিনই মাথা নত ক'রে এসেছে । এটি ছিল তার ব্রহ্মান্দ । আজ তাও ব্যর্থ হয়ে গেল । লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে তাঁর শেষ অস্ত্র ! এখন কি করবেন তিনি ? বঙ্গবিভাগটা আগাগোড়া ভুল জেনেও যেমন নীরবে মেনে নিয়েছিলেন—তেমনি ক'রেই কি মেনে নেবেন যে এ পরিবারের অভিভাবকের গদি থেকে চ্যুত হ'য়েছেন তিনি ? আতঁকঠে তিনি ডেকে ওঠেন : নমু, লতু !

কেউ সারা দিল না ।

বিন্দুবাসিনী বৃদ্ধকে শুইয়ে দিলেন ।

ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন তিনি ।

ওদিকে সারারাত ছটফট করছে নমিতা । ঘুম হয়নি তার একরত্তি । এ কী কাণ্ড ! লতু ধরে নিয়েছে ভূষণ তার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব এনেছিল—আর তার দিদি ঈর্ষান্বিতা হ'য়ে প্রত্যাখ্যান করেছে সে প্রস্তাব ? যে লতুর জন্মে তার ভালবাসার অন্ত নেই, চিন্তার বিরাম নেই,—যার সুখ-সাম্রাজ্যের জন্মে উদয়াস্ত পরিভ্রম করেছে সে এতদিন তার কাছ থেকেই রুতনের মতো এই অভিযোগ আসায় ওর বেদনার পরিসীমা ছিল না ! লতু, ছোট লতু—প্রায় মায়ের মত মানুষ করেছে যাকে ? ওর চেয়ে দশবছরের ছোট ছিল লতু । তুল মানুষ মাতেরই হয়—লতুর পক্ষেও তুল হওয়া অস্বাভাবিক নয় । কিশোরী মেয়েটির পক্ষেও ভূষণের আবরণ সম্বন্ধে তুল ধারণা করা অসম্ভব নয় । নাটক-নভেল প'ড়ে প'ড়ে, আর পাড়ার যত অকালপক বকাটে মেয়েদের সঙ্গে মিশে ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে । তাই তার ধারণা হয়েছে ভূষণ তার আকর্ষণেই আসে এ বাড়ি । সব মেনে নেওয়া যায়—কিন্তু লতু কি ক'রে ভাবতে পারল যে নমিতা ঈর্ষান্বিতা হয়ে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছে ? দিদিকে এত ছোট ক'রে ভাবল কি ক'রে সে ? আর সে কথা বাব'-মার

সামনে প্রকাশে বলতেও সঙ্কোচ হ'লনা তার ? রাগে ছুখে অভিমানে সারারাত শুধু এপাশ ওপাশ করল। এক কোঁটা ঘুম এল না।

মাঝে মাঝে অনুভব করলে যে পাশেই লতু জেগে রয়েছে। কান্দছে সেও। বালিশে মুখ গুঁজে দিয়ে কারা চাপবার চেষ্টা করছে। বাইরে তার প্রকাশ নেই; কিন্তু ঠিক পাশে যে শুয়ে আছে সেও কি তা বুঝতে পারবেনা? নমিতা সবই টের পায় কিন্তু কী করতে পারে সে? লতু বিছানায় শুয়ে কান্দছে জেনেও তাকে সাহসনার কথা বলতে পারলেনা। জীবনে এই বোধহয় প্রথম। অনেক দুঃখ রক্তনীর অতিক্রম করেছে ওরা। বিনিত্র নয়নে। পাশাপাশি শয্যায়। লতুর কারা দেখলে সে কোনদিনই স্থির থাকতে পারে না। নিজের চোখ মুছে গিয়ে বসে ওর মাথার কাছে। মাথায় হাত বুলিয়ে মিষ্টি কথা বলে শান্ত করে এই ছরস্তু বোনটিকে।

আজ কিন্তু একতিল উৎসাহও অবশিষ্ট ছিলনা।

কী লজ্জা! নমিতা ভাবে, একই পুরুষকে ভালবেসেছে ওরা। আজ থেকে ওরা আর সহোদরা নয়—একই পুরুষের প্রণয়াকাজী প্রতিদ্বন্দী নারী!

কথাটা মনে হ'তেই একটা ছিছিকারে ভরে যায় সারা মন!

পরদিন সকালে উঠতে নমিতার বেশ দেরি হ'ল। সারারাত্রি জেগে—ভোর রাত্রে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠে দেখে বেশ বেলা হয়ে গেছে। আজ রবিবার—স্কুলে যাবার তাগাদা নেই। রবিবারটা ভালোই লাগে ওর। সপ্তাহান্তে একটি দিন ছুটি। তাছাড়া এই দিনে প্রায়ই ভূষণও আসে সপ্তাহান্তের হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে দিতে। আজ কিন্তু রবিবার হওয়ার বিত্রতই বোধ করল সে। স্কুলে বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। সারাদিন বাড়িতেই থাকতে হ'বে সবার চোখের সামনে। লতু কখন উঠে বেরিয়ে গেছে। মা উত্থানে আগুন দিয়েছেন।

নমিতা দৈনন্দিন কাজে আত্মনিয়োগ করে। মশারিটা টেনে নামায়। সেধ করে কাচবে সেটা আজ। প্রয়োজন ছিলনা। অর্থাৎ প্রয়োজনটা মশারির ছিলনা, ছিল নমিতার। কাজের মধ্যে ডুবে থেকে দিনটা কাটিয়ে

দিতে চায়। হরিপদ বসেছিলেন বাইরের দাওয়ায়। বিদ্যুৎবাসিনী বালতিটা
তুলে নিয়ে জল আনতে বেরিয়ে যান।

বৃদ্ধ থাকেন : নমু, এদিকে শোন।

নমিতা হাতের কাজ রেখে এসে দাঁড়ায়।

: লতু কোথায় রে ?

: জানিনা বাবা। সকালেই কোথায় বেরিয়েছে।

: আর তোর মা ?

: জল আনতে গেছেন।

: ও। তুই ব'স এখানে। তোর সঙ্গে কথা আছে।

আবার সেই কালকের মানিকর আলোচনা হবে। বিরক্ত বোধ করে
নমিতা। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

: কই এখানে এসে বস। রাগ করে আছি নাকি রে আমার
উপর ?

নমিতা ধীরে ধীরে বাপের পাশে এসে বসে।

: রাগ করিস না মা। তুই রাগ করলে আমি দাঁড়াই কোথা ? অন্ধ
বুড়ো মানুষ না হয় রাগের মাথায় ছোটো কড়া কথাই বলে ফেলেছি।

নমিতা কথা বলে না। উদগত অশ্রু গোপন ক'রে নতমুখে বসে থাকে।
বৃদ্ধ বলতে থাকেন : কাল তুই রাগ করলি কেন বলত ? আমি তো অন্তায়
কিছু বলিনি। যখন দেশে ঘরে ছিলাম তোকে পাত্রস্থ করবার কম চেষ্টা
করিনি। ওরা মুখ ঘুরিয়ে চলে যেত আর আমি ভগবানকে অভিশাপ দিতাম।
এখন মনে হয়—ভগবান বোধহয় ভালোর জন্তেই এ ব্যবস্থা করেছিলেন।
যদি সে সময়ে তোর বিয়ে হ'য়ে যেত—তাহলে আজ আমাদের না খেয়ে
মরতে হ'ত। বোমার অতকাণ্ডের পর—

: জানি বাবা।

: তুই তো সবই জানিস মা ! আমি অন্ধ হ'য়ে পড়ার পরেও যশোরের
রায় বাড়ি থেকে তোর সবকিছু আসে—তখন তুই বলেছিলি 'বাবা আমি বিয়ে

করব না—আমি স্বত্তরবাড়ি চলে গেলে তোমাকে কে দেখবে ?’ তখন রাগ করেছিলাম।

নমিতা বুঝতে পারে ভুল বলছেন হরিপদ পণ্ডিত। সে সময় ওর বাবাও অন্ধ হননি—সেও আপত্তি জানাননি। কিন্তু প্রতিবাদ করেনা। হয়তো ঝুলিয়ে ফেলেছেন বুড়ো মানুষ—না হয়তো মনকে ঐ রকমই একটা প্রবোধ দিতে দিতে সেটাই সত্য বলে ধরে নিয়েছেন তিনি। বৃদ্ধ বলেই চলেন

: পরে ভেবে দেখেছি—মা তো আমার ঠিক কথাই বলেছে। সে যদি বিয়ে না করতে চায় নাই করল। কত মেয়েই তো লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরি করছে। তারপর থেকে আর ও কথা আমি বলিনি। কিন্তু লতুর কথা তো অন্য রকম। ওটাকে পার করতে পারলে তো তোর দায়িত্বই হাল্কা হয়। ভূষণ যখন নিজেকে থেকে ওকে বিয়ে করতে চায়—

: ভুল করছ বাবা, ভূষণবাবু লতুকে বিয়ে করতে চাননি।

: কিন্তু ঐ যে লতু বঙ্গ কাল রাত্রে ?

: আমি মিছে কথা বলিনা বাবা।

বৃদ্ধ চুপ কবে যান। ঘটনার সূত্র বোধহয় হারিয়ে যায় বৃদ্ধের কাছে। কোথায় কি যেন একটা ভুল হ’চ্ছে। নমিতা জেনে শুনে মিথ্যা কথা বলবে না। অন্তত তার বাপের কাছে নয়। এদিকে লতু স্পষ্টই মুখের উপর বলে গেল যে সে নিজের কানে শুনেছে। ভূষণের পিসীমাও শুনেছেন ভূষণের কাছে। তাহ’লে ব্যাপারটা কি ? হরিপদ পণ্ডিত অন্তরিক থেকে শুরু করেন : আচ্ছা বেশ, তোর কথাই মেনে নিলাম। ভূষণ প্রস্তাব করেনি এখনও। কিন্তু সে যে লতুকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক এটা তো মিছে কথা নয় ? ওদের দুজনের মধ্যে যখন একটা অসুযোগ সঞ্চারিত হয়েছে তখন প্রস্তাবটা আমরাও ভুলতে পারি।

: ওদের দুজনের মধ্যে যে অসুযোগ সঞ্চারিত হ’য়েছে এটা তুমি জানলে কি ক’রে ? প্রস্তাব করলে ভূষণবাবুই যে পিছিয়ে যাবেন না তাই বা তুমি ধরে নিচ্ছ কেন ?

: আমি অন্ধ হ’লেও কিছু কিছু বুঝতে পারি মা। কাল দুপুরে যখন

ভূষণ এল তখন তোর মা খুশুচ্ছে। আমিও চুপ করে শুয়ে আছি। তুই তখনও ইন্সুল থেকে ফিরিস নি। লতুর সঙ্গে ও ঘরে ভূষণ অনেকক্ষণ ধরে ফিস্ ফিস্ ক'রে আলাপ করল। মাঝে মাঝে ওদের চাপা হাসিও কানে এল আমার। ওরা মনে করেছে আমিও বুঝি ঘুমাচ্ছি।

নমিতা বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন ক'রে : কাল ভূষণবাবু এসেছিলেন? ঠিক জানো তুমি?

: জানিনা? আমি শুনলাম ভূষণ লতুকে বলে 'তোমার দিদিকে বল একটা ছোট ছেলে এসে জামা কাপড়গুলো দিয়ে গেছে। আমি এসেছিলাম তা বলবে না কিন্তু।' লতু জবাবে বলল 'অতই বোকা কিনা আমি।'

নমিতার ইচ্ছা হচ্ছিল ছুটে গিয়ে ধরে আনে ভূষণকে। চিৎকার ক'রে তাকে ডিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছিল—কেন সে এভাবে খেলা করছে ওদের দুজনকে নিয়ে। কী সে চায়? ওদের সুখের সংসারে এভাবে ভাঙন ধরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যটা কি? মেয়েমানুষ হ'য়ে জন্মেছে বলে কি এভাবে পুতুল খেলা করবে তাদের নিয়ে ভূষণ? বাপ আজ মেয়েকে বিশ্বাস করেনা—বোন দিদির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

বৃদ্ধ আর্ন্ত কণ্ঠে ডাকেন : নমু?

: আমারই হয়তো ভুল হয়েছিল বাবা। বেশ তো লতুর বিয়ের জোগাড় দেখ। আমি এতসব কথা জানতাম না।

: সে তো আমি জানিই। তুই ইন্সুলে বেরিয়ে যাবার পর লতুও বেরিয়ে যায় ওদের বাড়ি। কখনও ভূষণ আসে এ বাড়ি।

নমিতা চুপ করে থাকে।

: তাহ'লে আজ ও বেলা তোর মাকে নিয়ে ভূষণদের বাড়ি যাস। ওর পিসীমার সঙ্গে কথা বলে আসিস। আর ঐ সঙ্গে অম্বর ওখানেও একবার যাস। ওরা ওদের কর্তব্য না করলেও আমাদের তো খোজ নেওয়া উচিত। বোনের বিয়ে। অম্বকে তো এ সময় আলাদা সরিয়ে রাখতে পারি না।

নমিতা কোন কথাই বলে না। তাই সে করবে। ঘোবনসীমান্তবর্তিনী

মেয়েটির কোণ নেই আর। শুধু একবার ভূষণকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে :—এই যদি তোমার মনে ছিল তা হ'লে আমাকে নিয়ে ও নিষ্ঠুর খেলা কেন খেললে তুমি? মিথ্যা স্বপ্নজাল কেন বোনালে আমাকে দিয়ে?

নিতাই কবিরাজ সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছেন ওঁদের দাবী। পুরানো পঞ্চায়েতের বদলে নতুন এ্যাড-হক কমিটির তত্ত্বাবধানে নির্বাচন ব্যবস্থা চলছে। বিষ্টপদ, গোকুল, নবীন পতিতত্ত্ব প্রভৃতি পুরানো পঞ্চায়েতের যারা সভ্য তারা প্রতিবাদ করতে আসেনি। কালের গতি-কে মেনে নিয়েছে তারা। আসলে ওরা প্রতিবাদ করবার ভরসা পায়নি। পুরানো কাণ্ডি যে তাদের ঘাঁটতে হ'লনা এটাই যথেষ্ট। অভিযোগের ফিরিস্তিটা তারাও জেনেছিল। সেগুলোর যে জবাবদিহি করতে হ'লনা এই নগদ লাভ। জনসেবা করার মোহও ঘুচে এসেছিল ওঁদের। ডোলের ব্যবস্থা থাকলেও ডামাডোলের বাজার আর নেই। লোকগুলোও সচেতন হ'য়েছে। আর নূতন সব অফিসার যারা আসতে শুরু করেছেন তাঁরা এক একটি চীজ! কোথা থেকে যে এইসব অপোগণ্ডুলোকে আমদানী করা হ'চ্ছে ওরা ভেবে পায়না। নয়া এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর বাগচিই একটি উদাহরণ। ইনি সন্দেহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পুরানো ইতিহাসগুলি খুঁটিয়ে দেখছেন। কী যে উদ্দেশ্য তা তিনিই জানেন। দলিল পত্র থেকে কতকটা কি উদ্ধার করেছেন বুঝবার উপায় নেই। তবে পুরানো দিনের অনেক ইতিহাসই যে ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছেন এটা বোঝা যায়। কলে ইদানিং সামলে চলতে শুরু করেছে বিষ্ট গোকুলেরাও।

যতীশবাবু অফিসের একজন পুরানো ঘাঘী। বিষ্টপদকে ডেকে আড়ালে একদিন বলেন : আপনারা তো বাঁচলেন মশায়। জালা হ'য়েছে আমাদের! ঐ হারামজাদা নিতাই ঠাকুরদা হ'য়েছে ওঁর পরামর্শদাতা। সর্বদাই গুজ্ গুজ্ ফুস্ফুস্ লেগেই আছে।

বিষ্টবলে : আরে রয়েন। পেরথম ক'দিন ফৌস ফৌস করবই। তারপর ঠিক পোষ মানব। রাধেকিষ্টো বুলি পড়ব। কত ঠাখলাম, কত ঠাখবাম্।

যতীশবাবু বলেন : আরে না মশাই সে জাঁতের লোক নয়। অতি বদমায়েস। ও কোনকালেই পোষ মানবে না।

নামোল্লেক না করলেও হুজনেই বোঝেন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর বাগচি সাহেবের কথাই আলোচনা হচ্ছে।

বিষ্টপদ বলে : এ্যাদিন আছিল কোই ? ডেপুটি ?

: ছাই ! ডেপুটি হ'তে হ'লে লেখাপড়া করতে হয়। এঁর কোয়ালি-কিকেসন জেল খেটেছেন ! আরে বাবা খদ্দের টুপি পড়লেই যদি এ্যাড-মিনিষ্ট্রেসন চালান যেত তাহ'লে ভাবনা ছিল না।

বিষ্টপদ বলে : তা তো বটেই !

: কাল আমায় ডেকে কি বল্লেন জানেন ? বল্লেন—‘ই ব্রকের শ্রীনিবাসকে কুমিরের ছানা ক'রে আর কতদিন রাখবেন যতীশবাবু ? ওটাকে এবার সত্যিই পি. এল. ক্যাম্প পাঠান।

বিষ্টপদের চোখ বড় হয়ে যায় ; বলে : হেই কথাডা কইলেন ! কুমিরের পোলা ? আপনে কি কইলেন ?

: আমি আর কি বলব ? চূপ করে রইলাম। কতটা জানে আর কতটা জানেনা—তাই কি বুঝতে পারি ? আমি স্রেফ চেপে গেলাম।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার ই-ব্রকের শ্রীনিবাসের রোজগারটা ছিল একটু বিচিত্র ধরনের। অভিনয় করেই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়ে যেত তার। রক্তমঞ্চের অভিনয় নয়, জীবন-নাট্যমঞ্চের তাকে নিখুঁত অভিনয় ক'রে যেতে হ'ত বিভিন্ন ভূমিকা। ডিরেক্টর বার কয়েক রিহাসাল দিইয়ে নিতেন আড়ালে। ছবছ নকল করত সে। মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ত কর্তৃপক্ষের সামনে। কখনও কলকাতায়, কখনও কলোনীর অফিসেই। দাঁড়াতে হ'ত তাকে সরকারী উচ্চপদস্থ অফিসারের সামনে যুক্তকরে। বিকলাঙ্গ তার দেহ। ছুটো চোখই অন্ধ। ডান হাতখানা কুয়ুই থেকে কাটা। মুখের একটা দিকে পুড়ে বীভৎস হয়ে গেছে। মিলে কাজ করত সে নান্নায়গগণে না ঢাকায়। কারখানাতেই পা ফস্কে যায়—অগ্নিগর্ভ বয়লারটার

আঁচে ঝলসে যায় চোখমুখ। হাতটাও পরে কেটে বাদ দিতে হয়েছিল
পচনক্রিয়া শুরু হ'য়েছিল যা শুকাবার সময়। করুণার পাত্র শ্রীনিবাস।
মেক আপের দরকার হ'তনা তার।

পরিদর্শনকারী উপরওয়ালা অফিসার প্রশ্ন করেন : তোমার নাম হরেকৃষ্ণ
দেবনাথ ?

শ্রীনিবাস নন্দী বলে : আইজ্ঞা ই়া হজুর।

: পরিবারে আর কে আছে ?

: কেউ নাই হজুর! বউবেটা কেউ নাই। এখন হজুর না দেখলি
মরুম্। নিচ্ছই মরুম্।

কৈদে হুলো হাত বাড়িয়ে হজুরের ফিতে বাঁধা জুতোটা জড়িয়ে ধরে।
বিত্রত হন কলকাতার অফিসর ভদ্রলোক। করুণা হয়। হওয়াই স্বাভাবিক :
বলেন : ওঠ, ওঠ আচ্ছা স্টারভেমান ডোল পাবে তুমি। জি র্যাশানের কার্ড
দেওয়া হবে তোমার নামে। সপ্তাহে সপ্তাহে ক্যাস ডোল আর চাল-ডাল নিয়ে
যাবে অফিস থেকে। বুঝেছ ?

ঘাড় নেড়ে শ্রীনিবাস জানায় বুঝেছে। চোখ মুছতে মুছতে উঠে যায়।
ওকে হাত ধরে ই-রকে পৌছে দিয়ে আসে ষতীশবাবুর কর্মচারী। বাড়ি
পৌছানোর পর তার হাতে গুঁজে দেয় একটা ছটাকার নোট। তাই দিয়ে
সংসার চালায় শ্রীনিবাস। এছাড়া স্টেশনে ভিক্ষাও করে। সেটাই তার
প্রধান উপজীবিকা। অভিনেতা হিসাবে বেটা পার় সেটা উপরি যোজগার।
একা মানুষ। চলে যায় ভালোই। আবার একদিন হয়তো ডাক পড়ে।
আবার এসে দাঁড়ায় ক্যাম্প অফিসে। অপর একজন অফিসর প্রশ্ন করেন :
তোমার নাম জীবন পর্বত ?

হু হু ক'রে কৈদে ওঠে শ্রীনিবাস : আইজ্ঞা না হজুর। জীবন আমার
নাম নয় !

চম্কে ওঠেন ষতীশবাবু! বেটা আজ বলে কি ? এত রিহার্সাল বার্থ
হয়ে গেল ?

শ্রীনিবাস কিন্তু ভুল করেনি। ডিরেক্টরের উপর টেকা দিয়ে একহাত মৌলিক অভিনয় দেখিয়ে নেয়। সংলাপও তার নিজস্ব : জীবন আমার নাম নয় হজুর! আমার নাম মরণ; মরণ! বাপে নাম দিছিল জীবন! জীবন মইর্যা গ্যাছে গা! তখন আমি মরণ। হায় ঠাকুর, মরণও হয় না আমার!

মেজের উপর বিকৃত মুখখানা ঠুকতে থাকে ও।

অফিসর যতীশবাবুর দিকে ফিরে বলেন : ইটস্ এ পিটি জাট য় ডিড্‌নট রেকমেণ্ড হিস্ কেস আলিয়ার। পি. এল. ক্যাম্প গেলে দেখি যত জোয়ান মর্দ বসে বসে পার্মানেন্ট লায়াবেলিটি হ'য়ে ভোল খাচ্ছে—আর এদিকে সত্যি-কারের সাফারার পড়ে আছে কলোনীতে। আপনাদের ইনেক্সিসিয়েন্সির জন্তু গোটা ডিপার্টমেন্টের বদনাম হয়।

যতীশবাবু মুখটা কাচুমাচু করেন। এ কেসটা ইতিপূর্বে কেন পাঠান হয়নি তার কারণ দেখাতে বলেন : ও স্তার নতুন এসেছে কলোনীতে।

: আইসাঁ! কতদিন হ'ল এসেছো তুমি এখানে?

শ্রীনিবাস চুপ ক'রে থাকে। সে নিজে এসেছে বছর পাঁচেক; কিন্তু এখন সে জীবন পর্বত। জীবনের নাম কবে থেকে কলোনীভূক্ত করা হয়েছে জানা নেই তার। বলে : খেয়াল নাই হজুর।

যতীশবাবু বলেন : মাস দুই হবে?

চতুর শ্রীনিবাস সামলে নেয় : হ কর্তা। তা হইব। ইটা তো অগ্রাণ? পূজার সময় আইছি আজ্ঞা।

: আচ্ছা যাও তুমি। ফ্রি ডোলের বন্দোবস্ত হবে তোমার।

ফিরে যায় শ্রীনিবাস। জীবন পর্বতের অভিনয় করে কাদতে কাদতে সে বাড়ি ফেরে।

সেই শ্রীনিবাস!

বাগচি সাহেব একেই বলেছেন 'কুমিরের ছানা'। যতীশবাবুর ঘাবড়ে যাওয়া অকারণ নয়।

এমনি কত তুচ্ছ ইতিহাস!

বাগচি সাহেবের অল্প বয়স। অক্লান্তদার। সারাদিন অফিস ক'রে যখন বাড়ি যান তখন একগাদা কাইলপত্র সঙ্গে নিয়ে যায় আদালি। পুরানো দলিল। সব উন্টেপাণ্টে দেখছেন তিনি। যতীশবাবুর দল শঙ্কিত হয়। খাতাপত্র অবশ্য ঠিকই আছে। তবে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে কোথায় সাপ বেরিয়ে পড়ে তার ঠিক কি? সন্ধ্যার পর বাগচি সাহেব নিজেই টাইপ করতে বসেন। সকাল বেলা অফিসে এসে ডাকেন ডেসপ্যাচ ক্লার্ক মিহিরকে

: ইস্ রেজিস্ট্রারখানা নিয়ে আসুন তো।

ইস্ রেজিস্ট্রারে পাঁচ-সাতখানা মেমো নম্বর নিজের হাতেই বসান। 'সবজেক্ট'এর ঘরে লিখে দেন 'কন্ফিডেন্সিয়াল!' পিয়ন শীল মোহর করে ওরই সামনে। খামগুলোর উপর ডেসপ্যাচ ক্লার্ক কম্পিত হস্তে টিকিট আঁটে।

যতীশবাবু নিম্নকণ্ঠে বলেন : যাচ্ছে কোথায়? মিহির?

: অকল্যাণ্ড।

: সব কথানাই?

: ই্যা!

: শাল!

এ জাতীয় কথোপকথন প্রায়ই আজকাল হয় অফিসে। কাঁটা হয়ে আছে সবাই। মাঝে মাঝে আসতে শুরু করল বদলির অর্ডার। পুরানো অনেকেই চলে গেল। এলো অচেনা ছেলের দল। এরা ডেপুটেশান দেয়। ফল হয়না।

মিহির বলে : ব্যাপার কি যতীশদা? খোল-নল্চে সবই কি বদলে যাবে নাকি।

: বদলাবে না? না হ'লে নিজেদের ভাইপো ভায়েগুলো চাকরি পাবে কি ক'রে? নিজেই বুঝবেন। সব পুরানো স্টাফ চলে গেলে 'গন্ড আন্ডি-সাইডেড' কেসগুলো কি করে মেটান আমিও দেখব।

: কেন সে তো আপনিই আছেন?

: আমি? আমি কি বলব? কে কোথায় কি ক'রে রেখে গেছে তার সব জবাবদিহি করব আমি? দায় পড়েছে আমার।

: তা দার আপনার বইকি। আপনিই তো অকিসের ওভার-অল ইনচার্জ ছিলেন।

যতীশবাবু চীৎকার করে ওঠেন : তাই বলে কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি ? এই যে উনি আজ দিন সাতেক ধরে সি. আই. সীটের ফাইলটা আটকে রেখেছেন বাড়িতে—রেজিস্ট্রারখানাও নিয়ে গেছেন—আমি কি বুঝিনা কি করছেন তিনি ? যখন বল্লাম শীতলকে বদলি করবেন না—তখন তো শুনলেন না—সে থাকলে সেই ঝকি পোয়াত। ধর যদি হিসাবে এখন কম-বেশী হয় কোথাও তবে কে জবাব দিহি করবে ?

মৃণাল বলে : বেশী হ'লে আমাকে দায়ী করবেন দাদা ! কম হ'লে অবশ্য মুশকিল। কি বলিস মিহির ?

দৃষ্টি বিনিময় হয় মৃণাল আর মিহিরের। বন্ধু ওরা দুজন। পাপের কারবারে ছিলনা কোনদিন। শীতল ছিল স্টোরের চার্জ। যতীশবাবুর প্রিয়পাত্র। বদলি হয়ে গেছে সে। নতুন যে ছোকরা এসেছে—সে প্রভিন্সনালি চার্জ নিয়েছে। চাবি আছে যতীশবাবুর কাছে। মাল গুন্তি করে সে দায়িত্ব নেবে।

মিহির বলে : শীতল বদলি হয়ে যাওয়াতে দাদার বড় অস্ববিধা হয়ে গেল, না দাদা ?

যতীশবাবু চটে ওঠেন : মেলা বক্বক্ক করনা দিকিনি। যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বলনা। যা করছ তাই কর। তোমার আর কি ? বসে বসে খামের উপর টিকিট সাঁটো ! বউকে চিঠি লিখতে গিয়ে যদি সার্ভিস-স্ট্যাম্প কিছু সরিয়ে থাক তাহ'লে সেই হিসাবটা মিলিয়ে রাখ বরং।

মৃণাল বলে : দাদা ভীষণ চটেছেন মনে হচ্ছে ?

ওম্ মেরে বসে থাকেন যতীশবাবু।

মিহির বলে : টিকিটের হিসাব ঠিক মিলিয়ে দেব দাদা। কিছু ভাববেন না আপনি। করোগেড টিনের হিসাবটাও যদি না মেলে তবে আপনার ঘাবড়াবার কি আছে ? কেউ তো বলতে পারবেনা ব্যারাকপুরের

বাড়িখানা আপনি এই টিন দিয়ে তুলেছেন—অথবা টিন বিক্রি ক'রে কিছু নগদ কারবার করেছেন আপনি।

লাফিয়ে ওঠেন ষড়ীশবাবু : বলি কাজ কর্ম করতে দেবে—না ভ্যানর ভ্যানরই করবে সারাদিন ? অফিসটা আড্ডাখানা নয় বুঝলে ? এখানে মুখটি বুঁজে কাজ করতে হয়।

বলে মুখব্যাদান ক'রে এক গোছা পান পুরে দেন গালে ! ঘস্‌ঘস্‌ করে কলম টানেন তিনি নোট শীটে।

আবার দৃষ্টি বিনিময় হয় মৃণাল আর মিহিরের। কোতুকদীপ্ত সহাস্ত-দৃষ্টি।

জংসনের হাসপাতালে আজকাল একাই আসতে পারে কামিনী। নিতাই ঠাকুরদা ভর্তি ক'রে দিয়ে যাবার দিন সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে আসেন অবশ্য তিনি। খোঁজ খবর নিয়ে যান। নিতাই ঠাকুরদার বন্দোবস্তে একটা ফ্রি রেশনের ব্যবস্থাও হ'য়েছে আজকাল। নিতাইপদর স্বেচ্ছা-সেবকের দলের কয়েকটি ছেলে মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিয়ে যায়। গোরাকে নিয়ে কামিনীর দিন কেটে যায় কোন রকমে। ঘরে রোগী নেই। অর্ধেক কাজ কমে গেছে। ক্রমশঃ সেরে উঠছে অনিমেষ। ছু তিন দিন বাদে গোরাকে নিয়ে কামিনী দেখা করতে যায়। কখনও যোগেন নায়েক, কখনও অন্য কোন ছেলে থাকে সঙ্গে।

বিষ্টপদ কামিনী-কাঞ্চনের লোভ একেবারেই ত্যাগ করেছে। অনিমেষ হাসপাতালে যাওয়ার খবরটা সে জানতো না। অনেকদিনই অপেক্ষা করেছিল সে—তার দেওয়া শাড়িখানিতে তলুদেহ ঢেকে কামিনী এসে দাঁড়াবে তার দোকানে। সে এল না। কোতুহল হ'ল বিষ্টপদর। ব্যাপারটা কি ? অনিমেষ কি ভালো হ'য়ে উঠল ? কিন্তু ওদের সংসারটা চলে কি ক'রে ? উপযাচক হ'য়ে যাওয়া ভালো হবে কিনা বুঝে উঠতে পারে না। তারপর একদিন লক্ষ্য করল ছোট ছেলেটির হাত ধরে কামিনী তার দোকানের সামনে দিবে দিবি গটগট ক'রে চলে গেল। সঙ্গে রয়েছে বাচ্ছু পাল। ঠাকুরদার

এক চ্যালাচামুণ্ডা। বিষ্টুপদ তাই আর দোকান থেকে নেমে এল না; কিন্তু অবাক হ'য়ে সে দেখলো মেয়েটার পরনে একখানা নতুন শাড়ি। তার দেওয়াখানা নয়—অন্য একটা। মুখ-চোখ দেখে অনশনক্লিষ্টা বলেও মনে হ'ল না। অবাক হ'ল বিষ্টুপদ। তার অবর্তমানে তাহ'লে বাচ্ছু পাল এসে অধিকার করেছে মেয়েটাকে? বাচ্ছু পাল? ছেলেটাকে তো সে ভালো বলেই জানতো। আর মেয়েটাই বা কি। অসুস্থ স্বামীকে বাড়িতে একলা ফেলে পরপুরুষের সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে! অসুতাপ হয় বিষ্টুপদর। কেন বোকার মত দূরে স'রে রইল সে?

ছুদিন পর বিষ্টুপদ আবার দেখল মেয়েটি বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছে—ছেলের হাত ধরে। এবার সঙ্গী বাচ্ছু পাল নয়—যোগেন নায়েক। বিষ্টুপদ নিজের মনেই বলে : বা। এ তো দেখি একেবারে পঞ্চপাণ্ডবকেই গোঁথে ফেলেছে!

আর অপেক্ষা করা সম্ভব হয় না বিষ্টুপদর পক্ষে। পরদিন সন্ধ্যায় সে ঘুরঘুর করছিল কামিনীর বাড়ির আশেপাশে। ঘরের ঝাঁপ ভিতর থেকে বন্ধ। খাঁজা দিতে সাহস হ'ল না ওর—কি জানি কোন পাণ্ডব আছেন ভিতরে কে জানে? ওপাশে স'রে গিয়ে জানালা দিয়ে উকি দেবার চেষ্টা করলে। চেষ্টা ফলবান হয় না। হঠাৎ ঘাড়ের উপর পড়ল একখানা লৌহকঠিন হাত। বিষ্টুপদ ঘুরে দেখে স্বয়ং মধ্যম পাণ্ডব যোগেন নায়েক। ঠাকুরদার স্বেচ্ছাসেবক দলের একটা গুণ্ডা।

যোগেন বলে : এ বাড়িতে একজন মহিলা একা থাকেন।

: হ জানি। কামিনী। তা হইছে কি?

: হয়েছে এই যে তিনি আপনার রক্ষিতাও নন, অরক্ষিতাও নন। কেবল যদি কোনদিন এই জানালা দিয়ে মুণ্ড গলাতে দেখি তবে মুণ্ডখানা রেখে সেদিন বাড়ি যেতে হবে। বুঝেছেন?—যান!

: কী কও! এত বড় আশ্পর্ধা! জান আমি লোকটা কে? আমি বিষ্টুপদ মজুমদার!

: জানি আপনি বিষ্টপদ হারামজাদ ! কনোনাডে আপনাকে না চেনে কে ? কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না সেই অনামধস্ত বিষ্টপদ হারামজাদের মুখখানি এককিলে চেপ্টে দেবার জন্যে কলোনীর শতখানেক ছেলের হাতের মুঠো নিস্পিস্ করছে—শুধু ঠাকুরদার হুকুম পাইনি বলে পারছি না। আর কি বলার আছে বলুন ?

বিষ্টপদ জোয়ান যোগেন নায়েকের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। জনশূন্য পথটার দিকে একবার দেখল। ওর কথাটা যে মিথ্যা নয় এটা আর যেই জাহুক না জাহুক স্বয়ং বিষ্টপদ হাড়ে হাড়ে জানে। এসব ছেলের অসাধ্য কাজ নেই। মিনমিনে গলায় বলে : আমারে অপমান কর তুমি ?

: অপমান ? অপমান করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই আমার। আমার ইচ্ছা কীচক বধ করার। কিন্তু কী করব বলুন—ঠাকুরদার হুকুম পাইনি। তবে আর একটি কথা বললে বিনা হুকুমেই কীচকবধ খতম করব। বিশ্বাস না হয় তবে আর একটা কথা বলে দেখুন।

বিষ্টপদ সম্ভবত বিশ্বাস করে। মধ্যম পাণ্ডবের পক্ষে কীচকবধটা আর অসম্ভব কি ? দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না ক'রে স'রে পড়ে। প্রাণখুলে হাসতে থাকে যোগেন নায়েক।

কামিনী এতকথা জানতো না। সে শুধু দেখেছে বিষ্টপদ আর তার ছায়া মাড়ায় না। স্বৈচ্ছাসেবক দলের অনেকগুলি ছেলেই আসে ওর কাছে। রাখাল, কানাই, যোগেন, বাচ্চু। কলোনীরই সব ছেলে। ছোট ভাইয়ের মত এসে আবদার করে। গল্প করে। কোনদিন হয়তো একগাদা কাঁচা চিনে বাদাম এনে বলে : বৌদি, ভেজে রেখে দেবেন। আমরা মাঝে মাঝে এসে খাব।

কখনও লাউটা বেগুনটা এনে দেয়। বলে : ওবেলা এসে একটু তরকারি খেয়ে যাবো বৌদি।

হয়তো আসে। হয়তো আসে না।

ওদের ভালবাসার দান গ্রহণ করতে বাধে না কামিনীর। সপ্তাহান্তে

র্যাশানটাও ওরাই দিয়ে যায়। ঠাকুর্দা একখানা শাড়িও পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিজের টাকায় নয়। সরকারী সাহায্যই এসে পৌছায় ওর ঘরে। এরা শুধু চিনির বলদ। কামিনী ভাবে এদেরও তো অভাব অনটনের সংসার। এরা তো চুরি করে না আগের ওদের মত? আবার শ্রদ্ধা বাড়ে মানুষের উপর। মানুষ মাত্রেই তাহ'লে পশু নয়। স্বার্থ ইঁ সবার মূলমন্ত্র নয় তা হ'লে। ভালো খারাপের মেশানো এ দুনিয়া। ভাবে কামিনী। এখানে বিষ্টপদও থাকে যোগেন নায়েকও থাকে, এখানে লালু ডাক্তারও প্র্যাক্টিশ করে, নিতাই কবিরাজও রোগী দেখেন, এ দুনিয়ায় যতীশবাবুরাও সরকারী কাজ করেন, বাগচি সাহেবের মত সরকারী অফিসারও আছে।

নমিতাকে একলাই আসতে হয় ভূষণের বাড়ি। লতুর বিয়ের সম্বন্ধ করতে। বাড়ি থেকে অবশ্য বিন্দুবাসিনীকে নিয়েই বেরিয়েছিল; কিন্তু তিনি ফিরে গেলেন মাঝপথ থেকে। বস্তুত তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে একাই এল নমিতা।

বিন্দুবাসিনীকে ফিরতে হ'ল অবশ্য অন্য কারণে।

ওঁরা ভূষণের বাড়ি যাবেন বলেই বেরিয়েছিলেন। পথে তিনি প্রস্তাব করলেন অল্পকে দেখে যাবেন। নমিতা প্রথমে রাজি হয়নি। কিন্তু বিন্দুবাসিনী অনেকদিন পর পথে বেরিয়ে মনটা বদলে ফেলেছেন। লতুর বিয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্ছেন। দুদিন পরেই হবে লতুর বিয়ে। বড় ছেলেকে তো তখন সরিয়ে রাখতে পারবেন না। খবরটা নিয়ে যাওয়াই ভালো। তাছাড়া অনিমেষের দোষটা কি? বাবলুকে পাঠিয়ে খবরটা দেয়নি বলে কিছু ত্যাজ্য-পুত্র করতে হবে না তাকে। নমিতা কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখে—সে বাড়ির ভিতরে যাবে না। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। বিন্দুবাসিনী প্রতিবাদ করেননি। তিনিও স্থির করেছিলেন কামিনীর সঙ্গে কথাও বলবেন না। অনিমেষকে দেখে, তার সঙ্গে কথা বলে চলে আসবেন। বউকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার সম্পর্কটা শুধু পুত্রবধুর সঙ্গেই ছিন্ন হ'য়ে গেছে। পুত্রের সঙ্গে নয়।

গলির মোড়টা ঘুরেই ওঁদের খেমে পড়তে হ'ল।

কামিনী সদর দরজায় তাল লাগিয়ে গোরার হাত ধরে কোথায় চলেছে। ওর সঙ্গে রয়েছে একজন ছেলে। বছর বিশেক বয়স। সুন্দর সুগঠিত চেহারা। নমিতা অনেকবার দেখেছে ওকে ঠাকুরদার ওখানে—নামটা জানা নেই। কলোনীরই ছেলে। কামিনীর মুখচোখ পরিষ্কার। একটু এসাধন করেছে বলে মনে হয়। পরিধানে একটা আনকোরা নতুন শাড়ী। খালি পা—আলতা পরেছে। কপালে একটা সিঁহুরের টিপ। ড্রেস ক'রে কাপড় পরেনি যদিও—কিন্তু বাইরে যাবার জন্য কুঁচি দিয়েই সাধারণ করে পরেছে শাড়িখানা। ব্লাউসটাও নতুন—নইলে নমিতা চিনতে পারত।

কামিনী গোরার এক হাত ধরেছে—ছেলেটি ধরেছে আর এক হাত। তার ও হাতে একটা গাঁদা ফুলের তোড়া। গায়ে টুইলের হাকসার্ট—পরিষ্কার ধূতি—পায়ে স্ট্রাওল।

নমিতারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কামিনী দেখতে পায়নি ওঁদের। বেশ সপ্রতিভ ভাবে নমিতার নাম-না-জানা যুবকটির সঙ্গে গল্প করতে করতে ওরা এগিয়ে গেল। নমিতা হঠাৎ লক্ষ্য করল ছেলেটি গোরাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল পানের দোকানের দিকে। দু'খিলি পান কিনে এনে একটা নিজের মুখে পুরে দিল—আর একটা দিল কামিনীকে। কি একটা কথা বলল সে। অনেক দূর থেকে বলে শোনা গেল না। দুজনেই হেসে উঠল কথাটার। এটা বোঝা গেল।

ওরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়েই রইল। ব্যাপার কি?

নমিতা বলে : বাড়িতে তাল দিয়ে ও কোথায় গেল? দাদা তাহ'লে কোথায়?

বিন্দুবাসিনী জবাব দিলেন না। নিঃসন্দেহে অনিমেষ ভালো হয়ে গেছে। আলতা-পর সিঁহুর-মাথা পুত্রবধু যখন বাড়িতে তাল মেয়ে বৈকালিক ভ্রমণে বার হচ্ছেন তখন অনিমেষ যে ভাল হ'য়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে এটা বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু কামিনীর এতদূর অধঃপতন হবে? ছেলের

হাত ধরে প্রকাশ দিবালোকে সাক্ষাৎসঙ্গী বের হচ্ছে সে পরপুরুষের সঙ্গে ?

: আরে নমু যে ! কই ঘাও ?

এগিয়ে আসে বিষ্টুপদ ।

: দাদা বৌদিরা কোথায় ?

: তোমাগো বউদি ? এই তো বাহির হইয়া গেল গা । দেখ নাই ?

: ই, দেখলাম । সঙ্গে ওটি কে বলুন তো ?

: অরে চিন না ? রাখাল । রাখাল দেবনাথ । মহা হারামজাদ ছুক্রা !

: কোথায় গেল বলুনতো ওরা ।

হাসে বিষ্টুপদ । ফৌগলা দাঁতের মধ্য থেকে জিবটা বার হ'য়ে আসে ।
বলে : তোমায়ে আর কি কম, কও নমু । নিত্যি হুতন ছুক্রা আসতেছে !
সব কথা তো কওন যায় না । তোমাগো ভালবাসি—তাই না কই ।

বিন্দুবাসিনী বিষ্টুপদের সঙ্গে কথা বলতেন না । এ সময়ে কিন্তু তিনি আব
সঙ্কোচ না ক'রে প্রশ্ন ক'রে বসলেন : কিন্তু অহু কোথায় ? ঘরে তালা মারা
কেন ?

বিষ্টুপদও লক্ষ্য করে ঝাঁপের দরজায় তার দিয়ে একটা রিং বানিয়ে তাতে
তালা লাগানো আছে । অনিমেষ কোথায় আছে, কেমন আছে বিষ্টুপদ
জানতো না । অনেকদিন এ পথ মাড়াইনি সে । নিজের মতো দোকানে এসে
কাজকর্ম ক'রে গেছে । এখন সে মনগড়া একটা জবাব দেয় ।

: কই গেছে গা । অনিমেষভার যদি লক্ষ্য থাকতো তাহ'লে কি বোড়ার
এ দশা হয় ।

বিন্দুবাসিনী আর আলোচনা বাড়তে দেননি । নমিতাকে বলছিলেন :
চল্ বাড়ি চল্ ।

: সে কি ; ওখানে যাবে না ?

: না আমার শরীরটা ভালো লাগছে না । আজ থাক ।

নমিতা বাড়ি পৌছে দিয়ে এসেছিল বিন্দুবাসিনীকে । ব্যাপারটার

বিন্দুবাসিনী যতটা আহত হয়েছিলেন নমিতা ততটা হয়নি। বরং এর চেয়ে অনেক বেশী আঘাত পেয়েছিল যেদিন সে ভোররাত্রে খিড়কির দরজার কামিনীকে কার সঙ্গে টাকাকড়ি সঞ্চকে কি যেন কথা বলতে শোনে। এ তো তার জানা দৃশ্য। এ দৃশ্য তার চর্মচর্মে এতদিন পড়েনি কারণ সে এ পথে আসে না। মনশ্চক্ষে এ দৃশ্য তার অজানা নয়। যা বোধ হয় মনে মনে বিশ্বাস করতে পারেন নি। রাগারাগি করে জেদের বশে পৃথক হ'তে চেয়েছিলেন। আজ ঠঠাং এ সংবাদে তাই বেশী কাতর হ'য়ে পড়েছেন।

নমিতা বলেছিল : তুমি তাহ'লে বাড়িতে থাক। আমি একাই যাই ?

বিন্দুবাসিনী বলেন : আজ থাক না নমু। যাত্রাটা আজ শুভ নয়।

: তুমিও যে ঠাকুরদার মতো স্ক্রু করলে ! না আমি একাই যাই। অন্তত প্রাথমিক কথাটা পেড়ে আসি। ভুল বোঝাবুঝি যখন হয়েছে তখন যতশীঘ্র সম্ভব সেটা মিটিয়ে ফেলা দরকার। নাহ'লে পিসীমা অস্ত্র অগ্রসর হ'তে পারেন।

কথাটা ঠিক। বিন্দুবাসিনী রাজি হয়ে যান।

নমিতার অন্ত গরজ ছিল আসলে। তার ভীষণ কোড়ুহল হচ্ছিল জানতে কি ক'রে পিসীমা জানতে পারলেন ভূষণ প্রস্তাব করেছিল নমিতার কাছে।

ভূষণ বাস করে এ ব্লকে ৭২৪ নং প্লটে। কলোনীর আর পাঁচখানা বাড়ির সঙ্গে এ বাড়ির এমন কিছু প্রভেদ নেই। টিনের চালা। দরমার বেড়া। ঝাঁপের জানালা-দরজা। বাড়ি তৈরীর লোনের অনেক টাকাই ভূষণ বিনিয়োগ করেছে তার ব্যবসায়ে। তাই পাকা দেওয়াল তোলা সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে। সে হিসাবে কলোনীর সাধারণ বাড়ির অল্পপাতে ভূষণের বাড়িটা কিছু নিকটই। তবু এ বাড়িতে ঢুকবার সময় নমিতার মনে হয়—এই সেই গৃহ যেটাতে বধুবশে আসবার স্বপ্ন দেখেছে সে এতদিন। এটা তার কল্পলোকের স্বপ্নরবাড়ি। কিন্তু না, ও চিন্তা আর নয়। মনকে সে শাসন করে।

ঘরে ঢুকে লক্ষ্য করে চারদিক। সাধারণ গৃহস্থ বাড়ি। দেওয়ালে খানকর ছবি। ক্যালেন্ডারের প্রাচুর্য। অনেকগুলি গতবৎসরের। 'এক কোণে

বিছানাটা গোটান রয়েছে। গোটা দুই তোরঙ্গ। একপাশে একটা ডাঙা হারমনিয়াম—হয়তো এককালে ডুগুন বাজাতো কিংবা তার স্ত্রী। ও কোণে একটা ছোট জলচৌকি। দেওয়ালের গায়ে লাগানো। তার উপর লক্ষীর আসন পাতা। পটের ঠাকুর। সিঁহুরের প্রলেপে মুখখানা ঢাকা পড়েছে। পা দুটিও চন্দন মাখানো ফুলে ঢাকা। একটা ছোট পিতলের গেলাসে জল আর একটা রেকাবিতে বাতাস। কালো ভেঁয়ে পিপড়ের ছেকে ধরেছে বাতাসটাকে। ঘরে লোক নেই।

ঘর পার হ'য়ে ভিতরের বারন্দায় আসতেই দেখা হ'য়ে গেল এক প্রোটা বিধবার সঙ্গে। প্রদীপের সলতে পাকাচ্ছিলেন তিনি। নমিতা এসে প্রণাম করে : আপনি তো পিসীমা? আমি নমিতা।

: ও, তাই বল। মুখখানা দেখেই চেনা চেনা লাগছে। তোমাদের দুই বোনের চেহারায় বেশ মিল আছে। এস মা বস।

একটা আসন এগিয়ে দেন তিনি। নমিতা সেটা সরিয়ে দেয়—মাটিতেই বসে পড়ে। বলে : মিঠুকে দেখছি না। গেল কোথায়?

: ও মা, মিঠুকে এই মাত্র এসে নিয়ে গেল যে লতু।

: লতু এসেছিল বুঝি বিকালে?

: ই্যা ওতো মিঠুকে না দেখে একদিনও থাকতে পারে না। রোজ আসে। এত ভালবাসে মিঠুকে। আর মেয়েটাও ওকে পেলে যেন আব কিছু চায় না। কখন লতুমাসী আসবে তাই খালি জিজ্ঞাসা করে।

নমিতা বলে : ই্যা, ছেলেপিলে বরাবরই খুব ভালোবাসে লতু।

একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে আসেন পিসীমা : তাই দেখলাম। সেই জন্তাই সেদিন গিয়েছিলাম আমি তোমার মায়ের কাছে। তুমি তখন বাড়ি ছিলে না। তা দাও না তোমার বোনকে ঐ মা-মরা মেয়েটাকে মানুষ করার ভার।

নমিতার হাতদুটি চেপে ধরেন পিসীমা। নমিতা ব্যস্ত হ'য়ে বলে : সে তো আমাদের সৌভাগ্য পিসীমা। আমরাই কল্লাপক্ষ, কোথায় আমরাই খোশামোদ করব আপনাকে—

: না, তাই বলছিলাম। শুনলাম তুমি নাকি আপত্তি করেছে, তাই ভাবলাম—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে নমিতা বলে : আচ্ছা এই কথাটা রটলো কি ক'রে বলুন তো ? মাও তাই বলছিলেন সেদিন। আমি তো আপত্তি করিনি। আমি শুধু ভাবছিলাম ওদের বয়সের তফাৎটা।

: তা হ'ক। ওরা দুজনেই যখন দুজনকে পছন্দ করেছে.....

: তা হ'লে তো কোন কথাই নেই। কিছু মনে করবেন না, আমার ভয় ছিল লতুকেই। দ্বিতীয়পক্ষের বর যদি ওর মনে না ধরে—

পিসীমা যেন আকাশ থেকে পড়েন।—দ্বিতীয় পক্ষ ! কি বলছ তুমি ? কে দোজবরে ?

: কেন, ভূষণবাবু ?

হাসেন এবার পিসীমা : কে বললো তোমায় ? বাজে কথা।

: বাজে কথা ! মিঠুয়া তবে কে ?

: আমার নাতনি—

: আর সূবালী ?

: আমার ভাই ঝি। মিঠুয়া হ'তে গিয়েই সূবালী মারা যায়। মিঠুয়ার বাবা আবার বিয়ে করেছে। তা করবে না কেন বল ? মিঠুয়া আমার হাতেই মানুষ হচ্ছে ; কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ আর সামলাতে পারি না। ভূষণকে বলি একটা বিয়ে করে বউ আনতে—তা ছেলে কানেই তোলে না—

নমিতার কানেই যাচ্ছিল না কথাগুলো। সে ভাবছিল কেন তবে মিথ্যা কথা বললো ভূষণ ? সত্যকথা বলা কি ওর ধাতে নেই ? প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে শুধু প্রতারণা করাই তার পেশা ?

পিসীমা তখন এক নাগাড়ে বলেই চলেছেন নিজের কথা।

লতু মেয়েটির যাতায়াত বরাবরই ছিল এ বাড়ি। ভূষণের সঙ্গে প্রথমটা খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া হ'ত। লতুর ছেলেমানুষি নিয়ে ভূষণ তাকে ক্যাপাতো। ভাকতো 'ঠান্দি' বলে। লতুও ছেড়ে কথা বলতো না। এসে নালিশ করতো

পিসীমার কাছে : তোমার ঐ ভূষণীকাক ভাইপোকে বারণ করে দিও
পিসীমা—যেন আমার পিছনে না লাগে ।

পিসীমা শুধু হাসতেন ।

তারপর তিনি লক্ষ্য করলেন মা-হারা মিঠুয়া ঐ মেয়েটার একান্ত বাধ্য
হ'য়ে উঠেছে । লতুও মিঠুকে নিজের বুকের পাঞ্জরের মতো ভালবাসতে
শুরু করেছে । একদিন মিঠুয়াকে না দেখতে পেলে সে অস্থির হয়—মিঠুয়াও
কান্নাকাটি শুরু ক'রে দেয় । তখন পিসীমার মনে হ'ল ঐ মেয়েটাকেই যদি
ভার দেওয়া যায় মিঠুয়াকে মানুষ করার । সুবাল। যখন মারা যায় তখন মিঠুয়া
এতটুকু । পিসীমা ভূষণকে বিয়ে করতে বলেছিলেন ; কিন্তু ভূষণ হিসাবী
লোক । ব্যবসাটা ভালো ভাবে না চলতে শুরু করলে সে সংসারে ভাগীদার
বাড়াতে চায় না । বলে বলে হার মেনেছেন পিসীমা । ইতিমধ্যে তিনি
আরও অশক্ত হ'য়ে পড়েছেন । ওপারের ডাক এসে পড়েছে তাঁর । ভূষণকে
তিনি সংসারি দেখে যেতে চান । তাছাড়া মিঠুয়ার একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা
না ক'রে গেলে ওপারে গিয়ে ভাই-বোয়ের কাছে কৈফিয়ৎ দেবেন কি ?
এদিকে ছরস্তু মিঠুয়াকে সামলানোও দায় হ'য়ে উঠেছে আজকাল । এমন সময়ে
দৈবপ্রেরিত জাগকর্ত্রীর মতো এল লতু । পিসীমা রোজই ভাবেন ভূষণের
কাছে কথাটা পাড়বেন, রোজই ইতস্তত করেন ।

এত আকাজক্ষার জিনিসটা যদি প্রত্যাখ্যাত হয় সেই ভয়েই বলা হয়ে
ওঠে না । একদিন লতু বলে : পিসীমা, মিঠুয়াকে নিয়ে যাই আমাদের বাড়ি ?

: ওমা এখন যে ও স্নান-খাওয়া করবে ।

: দিদি স্থলে চলে গেছে । আমিই স্নান করিয়ে খাইয়ে দেবো । তারপর
দিদি ফিরে আসবার আগেই আবার দিয়ে যাবো ওকে ।

পিসীমা হেসে বলেন : এতই যদি দরদ মিঠুয়ার ওপর—তবে নে না
মেয়েটাকে একেবারে । তুইই মানুষ করবি ওকে ।

লতু চোখ তুলে তাকায় পিসীমার দিকে । তারপর চোখ নামিয়ে নেয় ।

: আসবি আমার ঘরে ? নিবি মিঠুয়াকে তুই ?

আনন্ড নয়নে লতু বলে : সে হবার নয় পিসীমা ।

: হবার নয় ? কেন ?

লতু চুপ করে থাকে । পিসীমা কিন্তু চুপ ক'রে থাকার পাত্রী নন । লতুকে বসিয়ে জেরার পর জেরা করতে থাকেন তিনি । প্রথমটা গোপন করবার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত সব কথাই লতুকে স্বীকার করতে হয় । লতু জানায় যে সে নিজের কানে শুনেছে দিদি বলেছে 'লতুর সঙ্গে কোন নিকট এবং মধুর সম্পর্কের যে প্রস্তাব আপনি করেছেন তাতে আমি রাজি নই ।' লতু আরও বলেছিল—সে যে এ বাড়ি আসে তা দিদি জানে না । সে লুকিয়ে আসে ।

খবরটা শুনে দুঃখিত হওয়া দূরে থাক পিসীমা উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন । তা হ'লে তো আসল বাধাটাই কেটে গেছে । ভূষণ নিজে থেকেই প্রস্তাব করেছে । ভূষণ রাজি ! ব্যাস্ আর ভাবনা নেই । নমিতা বা তার বাপ মাকে রাজি করানোর দায়িত্ব তিনি নিজেই নিতে পারবেন । ভূষণ আর লতু দুজনে যদি পরস্পরকে বরণ করতে চায়—তবে কে ঠেকাবে সেই মিলন ? সেইদিনই তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে ।

সমস্ত ঘটনা শুনে গেল নমিতা স্তম্ভিত হৃদয়ে । তারপর ধীরে ধীরে বললে : আমার আর কোন আপত্তি ছিল না । আমি ভাবছিলাম লতুর কথাই । ও নেহাৎ ছেলেমানুষ তো । ভূষণবাবুর সঙ্গে বয়সের তফাৎটা একটু—

: তা হ'ক । আমার মা চোদ্দ বছরের ছোট ছিলেন বাবার চেয়ে । কই অসুখী তো হন নি তাঁরা ।

: তা হ'লেই হ'ল । ভূষণবাবু রাজি থাকলে আর আপত্তি কি ?

: ভূষণ তো রাজি আছেই । বিয়ের কথাটা পেড়েছিলাম তার কাছেও । দেখলাম সেও রাজি আছে । লজ্জায় মুখ ফুটে স্বীকার করলে না অবশ্য । বলে একটু ঘুরিয়ে—বেশ তো একা হাতে তোমার যদি কষ্ট হয় একটা ব্যবস্থা করতে হবে বইকি ।

নমিতা স্বতরাং রাজি হ'য়ে যায় । ভূষণবাবু যখন পিসীমাকে কষ্ট দিতে

চান না তখন সে কেন বাধা দেয়। পিসীমা আরও বলেন : তুমি শুনলাম
বিয়ে করবে না বলেছ। আর করবেই বা কি ক'রে? বুড়ো অন্ধ বাপকে
তাহ'লে দেখবে কে? ভাই টাই তো নেই—

নমিতা প্রতিবাদ করে : ভাই নেই কে বলে? এক বড় ভাই আছে
একটি ছোট ভাইও আছে।

: সে কি, ভূষণকে জিজ্ঞাসা করতে ও যে বলে—তোমার আর ভাই নেই
ব'লে—তুমি নাকি স্থির করেছ বিয়ে করবে না। বাপের সেবা করেই কাটিয়ে
দেবে জীবন?

: উনি ঠিক জানেন না। দাদা আছেন, বৌদি আছেন তাঁর একটি
ছেলেও আছে। ওঁরাও সবাই আসবেন বিয়েতে। এখানে আমাদের বাড়িতে
নেই বলে আপনারা ভুল খবর পেয়েছেন।

: তা হবে।

: আচ্ছা আজ তা হলে আসি পিসীমা।

: ওমা সে কি হয়? একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যাও। এমন শুভ সন্ধ্যা হ'ল
আজ।

: না পিসীমা, আজ থাক। আপনি বরং আমার মায়ের সঙ্গেই পাকা
কথা বলতে যাবেন। আমি আজ উঠি।

পিসীমা জোর করে বসিয়ে দেন ওকে : সে তো বলবই। কিন্তু সেদিনের
কথাতেই বুঝেছি তোমার বাবা মার অমত হ'বে না। আর কারও আপত্তি
শুনব নাকি আমি? আমি হলাম গিরে বরের ঘরের পিসী। আমার কথার
দাম আছে না? তোমাকে একটু মিষ্টিমুখ করে যেতেই হবে। পিসীমা ও
ঘর থেকে রেকাবি সাজিয়ে মিষ্টি আনতে যান। নমিতা তখন উঠে পড়তে
পারলে বাঁচে। ওর ইচ্ছা করছিল কোথাও পালিয়ে গিয়ে প্রাণ ভরে খানিক
কৈদে নিয়ে মনটা হালকা ক'রে নেয়। সে সুযোগটা সে কোথাও পাচ্ছে না।
আজ দুদিন ধরে কান্নাটা আটকে আছে বুকের মাঝখানে।

লাফাতে লাফাতে ঢোকে লতু মিঠুয়াকে কোলে নিয়ে। ওর চলার ঢঙই

ঐ রকম। আশপাশে তাকায় না। দিদিকে দেখতে পাই নি। চিংকার করতে থাকে : ও পিসী পিসী তোমার নাতনিকে নাও। ছুটুটা ঘুমিয়ে পড়েছে—

তারপর হঠাৎ ভূত দেখার মত দাঁড়িয়ে পড়ে। নমিতা ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কিছু বলে না।

মিষ্টির খালাট। নমিতার সামনে নামিয়ে দিয়ে পিসীমা এগিয়ে যান লতুর দিকে। ওর কোল থেকে ঘুমন্ত মিঠুয়াকে নিয়ে নমিতার দিকে ফিরে বলেন : তুমি বাপু অমন করে তাকিও না আমার বোমার দিকে। বাড়ি গিয়েও বকতে পারবে না।

নমিতা ধীরকণ্ঠে বলে : বকব কেন পিসীমা ? লতু বুঝি বলে আমি শুধু বকাবকিই করি সারাদিন ?

: না। তা অবশ্য বলে না। দিদিকে ও খুবই ভক্তি করে। নে লতু পেয়াম কর তোর দিদিকে। তোর বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে গেল যে আজ তোর দিদি।

লতু বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে শুধু ছতনের দিকে একবার তাকায়। তারপর হেঁট হ'য়ে প্রণাম করে দিদিকে।

নমিতা ক্রমশঃ বলে : ওকি লতু ? ওঁকেও প্রণাম কর।

লতু লজ্জিত চরণে ভুল শুধরে নেয়। পিসীমাকেও প্রণাম করে।

মিষ্টিগুলো নমিতার গলা দিয়ে নামতে চায় না। মনে হয় একটা ষড়যন্ত্র ক'রে তাকে বঞ্চনা করছে সবাই। শুধু ভূষণকে নয়, শুধু মিঠুয়াকে নয়, লতুকেও এরা কেড়ে নিল তার কাছ থেকে—পর করে দিল। আজ ভূষণের পিসীমা তাকে অনায়াসে বলতে পারলেন : তুমি বাপু অমনি ক'রে তাকিও না আমার বোমার দিকে !

বিয়ে না হ'তেই লতু আজ এঁদের বোমা হ'য়ে গেছে। দিদির বকাবকির কথা, অত্যাচারের কথাই বলেছে শুধু এ বাড়িতে এসে।

লতু ! যে লতুর বিয়ে দেবে বলে কত কল্পনা ছিল নমিতার। একমাত্র

বোন তার। কত আদরের লতু। নমিতা নিজের বিয়ে করবে না। বাপকে নিয়ে থাকবে সে আজীবন কুমারী। বাপের সেবাতেই কাটিয়ে দেবে জীবন। সংসার-স্বামী-পুত্র কিছু সে চায়নি। সে চেয়েছিল শুধু বাপের যষ্টি হ'য়ে জীবনটাকে বিকিয়ে দিতে। কিন্তু সত্যিই কি তাই চেয়েছিল সে অন্তর থেকে? তাহ'লে আজ একটু-ছোয়া-পাওয়া ভূষণকে ছেড়ে দিতে এত ব্যথা জাগছে কেন বুকে। যে জিনিসের স্বাদ পাইনি সেটাকে প্রত্যাখ্যান করা সহজ। মদ যে জীবনে খায়নি তার পক্ষে মাতাল না হওয়াটা কোনও কৃতিত্বের নয়; কিন্তু মাদক রসে ভরা ডুব দিয়ে হঠাৎ একদিন নিজেকে স্রারস থেকে বঞ্চিত করার সঙ্কল্প করা শক্ত। যে নমিতা পুরুষের সান্নিধ্য থেকে চিরকাল দূরে থাকবে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে নমিতা আজ কোথায়? সে কি জানত প্রেমাস্পদকে অপরের হাতে ভুলে দিতে যাওয়ার দুঃখটা এতখানি? কিন্তু সে যাই হোক, নিজের বিয়ের কথাটা সম্প্রতি ভাবতে শুরু করেছিল বটে তবু লতুর বিয়ের কথা সে ভেবেছে অনেক অনেক দিন আগে থেকে। বোনের বিয়ে দিতে হবে একটি ফুটফুটে লাজুক মুখচোরা ছেলের সঙ্গে। লতুর বর এসে থাকবে ওকে দিদি বলে। সম্বন্ধ ক'রে এসে লতুর সামনে ধরবে একখানা ফটো। বাইশ চব্বিশ বছরের একটি সুন্দর যুবকের ফটো। বড় বড় চোখ, উন্টানো চুল, চোখে সোনালী চশমা, গোঁফের দুকোণ সুরু ক'রে কাটা। বলবে: ছাথরে লতু, পছন্দ হয়?

দুহাতে মুখ ঢেকে লতু বলবে—‘খ্যাং’!

নমিতা ছোট বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর ক'রে বলবে: খ্যাং নয় রে। সত্যিই দেবদূতের মত চেহারা। কলেজে পড়ছে। বাপ বেশ বড়লোক। স্বেই থাকবি তুই। আশীর্বাদ করছি আমি—ওকে নিয়ে সুখী হবি নিশ্চয়ই। আজ আমি আর দাদা এই ছেলেটির সঙ্গে তোরা সম্বন্ধ ক'রে এলাম।

সলজ্জ লতু মাথা হেঁট ক'রে প্রণাম করবে দিদিকে। ছোট বোনকে ও বুকে টেনে নেবে। কপালে এঁকে দেবে চুষনচিহ্ন। বলবে: বর পেয়ে দিদিকে ভুলে যাবিনে তো রে?

দিদির বুকে মুখ গুঁজে লতু বলবে : কক্ষণও নয়। তুমি দেখে নিও।

এই ছিল নমিতার স্বপ্ন। লতুর বিয়ের পরিকল্পনা। আজকের নয়। অনেক দিনকার। সে সব কিছুই হ'ল না। ভালবেসে 'লভম্যারেজ' করল লতু। বাপ-মা, দাদা-দিদি কেউ জানতে পারল না—সে জ্বর ক'রে নিল একজনের হৃদয়। সে একজনও এমন একজন যাকে কেন্দ্র ক'রে নমিতার নিজের হৃদয়ের মধ্যেও গুঞ্জন চলছে আজ কয়েক সপ্তাহ! কী লজ্জা! নমিতা ধরে নিয়েছিল ভূষণের ভালবাসা সে পেয়েছে। বলিষ্ঠ গঠন ঐ লোকটি তার সঙ্গে যে ভাবে মিশেছে তাতে মনেও হয়নি সে এ ভাবে ধরা দিতে পারে একফোঁটা লতুর বাহুবন্ধনে। কী বিচিত্র এই সংসার! কোথা থেকে কি করে ব্যবস্থা হ'য়ে গেল লতুর বিবাহের। চেষ্টা করতে হয়নি নমিতাকে কিছুই। ওরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে রেখেছে। আজ পিসীমা তাকে দিলেন কিছু উপদেশ—'বাড়ি গিয়েও বকতে পারবে না কিন্তু'। আর দিলেন একখালা মিঠায়। ওর রাজি হওয়ার জন্য উৎকোচ। পারমিট-পাওয়া বাবুরা যেমন যাওয়ার সময় অফিসারের পিয়নকে দিয়ে যায় দু-চার আনা বকশিস, খুশী হ'য়েই।

চোখ ফেটে জল এল নমিতার। এ জল চোখেই শুকিয়ে মারতে হবে। শুভকার্য! লতুর বিয়ে। কান্দবে কেন নমিতা?

নিতাই কবিরাজের ডাক্তারখানায় বসেছে নতুন কমিটির প্রথম সভা। 'গণকল্যাণ সমিতি' নামই টিকে গেছে। প্রতি ব্লকে নির্বাচন করে প্রতিনিধি স্থির করা হয়েছে। প্রতি ব্লকে দুজন ক'রে মেম্বর। সবস্বচ্ছ দশজনের কমিটি। এতবড় বিরাট কমিটি নিয়ে কাজ করা যায় না। তাই তিনজনের একটা ওয়ার্কিং কমিটি করা হয়েছে। প্রমোদ পাল গালভারি নাম পছন্দ করে—সে এই কার্যকরী কমিটির নাম দিয়েছে 'স্টিয়ারিং কমিটি'। কানাই, যোগেন, জীবেন, নমিতা, ভূষণ প্রভৃতি সকলেই সভা নির্বাচিত হয়েছে। তিনজনের কার্যকরী কমিটিতে আছে আগেকার এ্যাডহক

কমিটিই। অর্থাৎ ভূষণ, নমিতা আর ঠাকুর্দা। আজ নির্বাচনের পর প্রথম সকলে মিলিত হ'য়েছেন বিস্তারিত আলোচনা ক'রে কর্মপন্থা স্থির করবেন ব'লে। পরিবেশটা ঠিক সভাকক্ষের মত নয়। নিতাই ঠাকুর্দার ডাক্তার-খানাতেই বাড়তি একখানা বেঞ্চি ঢোকানো হয়েছে। সভারা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন। নিতাই ঠাকুর্দা যথারীতি একটা বিড়ি ধরিয়ে উবু হয়ে বসে আছেন।

যোগেন নায়েক সি-ব্লকের নির্বাচিত সভ্য। বলে : এবার সভার কাজ শুরু হ'ক ঠাকুর্দা !

ঠাকুর্দা বলেন : সবাই এসেছে ? কই নমিতাকে দেখছি না ?

ও কোণ থেকে নমিতা সাড়া দেয় : আমিও এসেছি ঠাকুর্দা।

: বাস্ তবে তো শুরু করা যেতে পারে।

ঠাকুর্দা সকলকে নির্বাচিত হবার জন্ত মামুলী অভিনন্দন জানানেন। তারপর বুঝিয়ে বলতে শুরু করলেন—কী উদ্দেশ্য এই গণ-কল্যাণ-সমিতির। আর কিভাবেই বা তা কার্যে পরিণত করা যাবে। ঠাকুর্দা বলেন : সমস্তটা কি ? আমাদের প্রধান সমস্যা হ'চ্ছে কর্মসংস্থান। আমরা যখন এদেশে প্রথম এসেছিলাম তখন আমাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল রিসেপশন সেন্টারে, ট্রানসিট ক্যাম্পে অথবা পি. এল. ক্যাম্পে। সেখান থেকে আমরা, অর্থাৎ সুস্থ সবল মানুষেরা পুনর্বাসতি পেয়ে চলে এলাম এখানে। জমি পেলাম, বাড়ি করার ঋণ পেলাম। ভালো কথা। জমি হ'ল, বাড়ি হ'ল। তারপর ?

এসব কাহিনী ওরা জানে। এ ওদের মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা বিবরণ। দশ-বিশ হাজার লোক এক জায়গায় জমায়েত হ'লেই সেটা শহর হয়ে পড়ে না। হ'য়ে পড়তো যদি অন্তত কিছু লোকের হাতেও থাকতো কোনও উদ্বৃত্ত অর্থ। তা ছিল না। কোন শিল্প, বাণিজ্য, বস্ত্র গঠনমূলক কোনও প্রয়াসই হ'ল না। অনশন মৃত্যু শুরু হ'ল। মাঝে মাঝে টেবু রিলিফের কাজ হয়েছে। এই পর্যন্ত। সবাই বললে কাজ দাও, কাজ দাও।

কাজ নাও—এ কথা কেউ বললে না। না কোন স্থানীয় লোক, না এদের মধ্য
থেকে গড়ে ওঠা কোনও কোয়পারেটিভ, না স্বয়ং সরকার।

ঠাকুরদা বুঝিয়ে বলেন : কলে, কলোনী ছেড়ে পি. এল ক্যাম্পে ফিরে
যাবার জন্য দরখাস্ত আসতে লাগলো গাদা গাদা। ক্যামডোল, স্টারভেসান
ভোলের আবেদন-সংখ্যা বাড়লো। তাতে একদল লোকের সুবিধাই হ'ল।
এই সুবিধাবাদী লোকের দলটি ছিল আমাদের দ্বিতীয় সমস্তা। সে সমস্তা
আর নেই। আমাদের নতুন কমিটি কার্ভডার নিয়েছে। কিন্তু আমাদের
প্রাথমিক সমস্তা রয়েই গেছে তা সত্ত্বেও। সেই মূল সমস্তার সমাধান করতে
নাকি সরকার বিরাট পরিকল্পনা করছেন।

যোগেন বলে : আবার পরিকল্পনা ! সেই জরীপের লোক এসে বনবাদাড়
ভেঙ্গে চেন-টানাটানি করবে—আর ঘরে ঘরে গিয়ে পরিসংখ্যান না কি যেন
সংগ্রহ করে বেড়াবে।

কানাই যোগ দেয় : ঐ পরিকল্পনা কথাটা শুনেই আমাদের আতঙ্ক হয়
ঠাকুরদা।

ঠিক এইসময়ে দরজার সামনে এসে থামে একখানা জীপ। তার
থেকে নামেন দুজন ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্রমহিলা। ওরা সসম্মানে আমন্ত্রণ
জানান।

এ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাগচি, হেডমিস্ট্রেস্ সুরেখা দেবী আর একজন
অপরিচিত সুগঠিততরু যুবক। থাকি প্যান্ট আর বুশ কোট পরা। চোখে
সানশ্লাস, পায়ে গামবুট। বাগচি সাহেব বলেন : আমরা অনিমন্ত্রিতই
এসেছি। যদি আপনাদের অসুবিধা হয় তাহলে আর বসব না। একটা
কথা বলেই চলে যাব।

ওরা বলে : বিলক্ষণ ! আপনারাই তো এ মন্ত্রের হোতা। আশ্বন
আশ্বন।

বাগচি সাহেব জমাটি লোক। সকলের সাথেই মিশতে চান নিজে
থেকে। অফিসার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অদ্ভুত ব্যবধান ছিল সেটা

ভেঙ্গে ফেলতেই বোধকরি ঠুঁর এ প্রচেষ্টা। সুরেখা দেবীকে অবশ্য ওরা আপনার লোক বলেই ভাবে চিরদিন।

ঠাকুর্দা বলেন : আমরাই অস্তায় করেছি। এ দক্ষরাজার শিবহীন বস্তু হচ্ছিল। কিন্তু কিছু মনে করবেন না বাগচি সাহেব। দোষ শুধু এক তরফাই নয়। ইতিপূর্বে আমাদের এইসব ঘরোয়া মিটিঙে ডাকলেও আপনারা আসতেন না। আপনি নন—আপনার পূর্ববর্তীরা। কাজেই ভুলটা আমাদের হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক নয়।

সুরেখা দেবী বলেন : যাক, সৌজন্য তো হ'ল। এবার কাজের কথা হ'ক।

ঠাকুর্দা বলেন : হ্যাঁ, কাজের কথা। এঁরা বলছিলেন আমাদের উদয় নগর কলোনির লোকদের কর্মসংস্থানের যে পরিকল্পনা হ'য়েছে তার স্বরূপটা কি।

বাগচি বলেন : ভালো কথা। তবে আপনাদের এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। দেবেন আমার সঙ্গের এই ভদ্রলোক। এঁর নাম বীরেন্দ্র মৈত্র। ইনি এসেছেন ঐ সরকারী পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার উনি। সরকারী অফিসার, তার উপর শুনেছি উনি লেখকও। স্মরণ্য বংশ গুছিয়েই বলতে পারবেন উনি নিশ্চয়।

বীরেনবাবু উঠে দাঁড়ান। ফর্সা রঙ। উন্নত নাশা, বলিষ্ঠ গঠন। লম্বা চওড়া চেহারা। মাথার চুলগুলি উন্টে করে ফেরানো। কথা বলবার সময় হাত নেড়ে ঝাঁক দিয়ে কথা বলেন। একটু বক্তৃতার ঢঙ এসে পড়ে। উনি বুঝিয়ে দেন পরিকল্পনাটা।

উদয় নগরের পূর্বদিকে ডি-ব্লক থেকে শুরু ক'রে ই-ব্লক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মাঠটায় কোনও গাছ নেই। ফাঁকা মাঠ। গাছের ভাগ হয়নি ওটা। এখানে একটা কারখানা হবে। তাঁত কল, লেদ-মেশিন, কাঠ চেরাইয়ের কল, ট্যানারী সেক্সন, পটারী সেক্সন, বেতের কাজ, বাঁশের কাজ—নানান ব্যবস্থা থাকবে এখানে। প্রায় দশবারো বকমের ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া হবে। বছর দুই ধরে শিক্ষার্থীরা কাজ শিখবে এখানে। মাসে মাসে বিশটাকা ক'রে ভাতা পাবে। ওদের তৈরী

জিনিসপত্র বিক্রয় হ'লে লভ্যাংশও পাবে। এর নাম হ'বে উদয়-নগর-ট্রেনিং
কায়-প্রডাকশন-সেন্টার।

কানাই প্রশ্ন করে : কত ছেলে শিখবে এখানে ?

: ধরুন আড়াই শো।

: সে তো প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। এখানে বেকার সংখ্যা মাত্র
আড়াই শ' নয়।

: মানলাম। আমার বক্তব্য কিন্তু শেষ করিনি আমি।

: আচ্ছা বেশ বলুন।

বীরেনবাবু বলতে থাকেন পরিকল্পনার অন্তিম দিক। এই শিক্ষা কেন্দ্রের
আপাত উদ্দেশ্য হবে আড়াই শ' ছেলের কর্মসংস্থান করা—গভীরতর
উদ্দেশ্য হ'ল ওদের এবং ওদের উপর নির্ভরশীল পরিবারগুলির চিরকালের
ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তার ওপাশে অনেকটা জমি
এ্যাকোয়ার করা হ'চ্ছে। সেখানে একটা কাগজের মিল তৈরী করছেন
সরকার। এর অর্ধেকের কিছু মূলধন থাকবে সরকারের—বাকি অর্ধেকের
জম্ম শেয়ার বিক্রয় করা হবে। এ অঞ্চলে একরকম ঘাস জন্মায় যা থেকে
কাগজ তৈরী হ'তে পারে। বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন। কাগজের
কারখানা তৈরী হ'তেও বছর দেড়েক লাগবে। সেই সময়ের মধ্যে ব্যাপক-
ভাবে ঐ ঘাসের চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে অন্তত হাজার দুই
মেহনতি মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

পরিকল্পনার তৃতীয় দিক হ'ল—এর আভ্যন্তরীন উন্নয়ন। পাকা রাস্তা,
নলকূপ, প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়, বাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি।

যোগেন প্রশ্ন করে : এসব সত্যি সত্যি হবে স্তার ?

: নিশ্চয়ই। আমি এসেছি এগুলো আপনাদের দিয়ে করিয়ে নিতে।

ঠাকুরদা বলেন : আপনি যা বলেন সে তো খুবই আশার কথা—কিন্তু কিছু
মনে করবেন না আপনি। আমরা হচ্ছি ঘরপোড়া গোরু। দেখেছি তো
আপনাদের ব্যাপার! প্ল্যান তৈরী হয় তো এম্টিমেট হয় না, এম্টিমেট হয়

তো স্কাংসন নেই, স্কাংসন হল তো। এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ এ্যাফেয়ার হল না, সব যখন মিটল তখন দেখা গেল এ বছর এ্যালাটমেন্ট পাওয়া যায়নি বলে কাজ হ'ল না! এমনি অনেক সুন্দর শিশু পরিকল্পনাকে আপনারা অফিসে লালফিতের উদ্বেগনে ঝুলতে দেখেছি কিনা—

বাগচি হেসে বলেন : নিতাইবাবু, আপনার শিবহীন দক্ষযজ্ঞের উপমাটির অর্থ বুঝিনি তখন। এখন বুঝেছি। অনিয়ন্ত্রিত শিবানী পতিনিন্দায় দেহত্যাগ করেছিলেন। আমাকে অন্তত সভাত্যাগ করতে হয়।

নমিতা বলেন : সরকার কি আপনার স্বামী ?

: নিশ্চয়ই। সেই অন্নদাতার সেবাদাসীই তো আমি।

সবাই হেসে ওঠে।

কানাই বলে : কিন্তু ঠাকুর্দা যা বলেন তা কি সত্য নয় ? কেন স্বীকার করবেন না আপনি ?

: শিব ছাই যেখে থাকেন, ভাঙ খান, তাঁর গলায় সাপ, স্কাংটো তিনি— এগুলো কি মিথ্যা কথা ? কিন্তু তাই বলে শিবানী কি সেগুলো মেনে নিয়েছিলেন ?

বীরেনবাবু মিটিমিটি হাসছিলেন। বাগচি সাহেব কি রকম কোণে এড়িয়ে যাচ্ছেন তা দেখে একটা কোতুক বোধ করছিলেন তিনি।

ঠাকুর্দা বলেন : আচ্ছা তা যেন হ'ল। কিন্তু আপনার ফ্যাক্টোরি আর প্রডাকসন সেন্টার হ'তে তো বছর দুই লাগবে। ইতিমধ্যে লোকগুলো করবে কি ? খাবে কি ?

বীরেন বাবু বলেন : ফ্যাক্টোরি, রাস্তা, ড্রেন প্রভৃতি যা কিছু এখানে করা হবে তা আপনারাই করবেন। বাইরের কোনও ঠিকাদার আসবে না। এখানকার মিস্ত্রি, মজুরেরা সব কাজ করবে আমার তত্ত্বাবধানে। আপনারা ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হ'য়ে যাবেন। প্রতি গ্রুপে থাকবে দুজন মিস্ত্রি আর আট দশজন মেহনতি মানুষ। আমরা কাজ দেখে নেব।

যোগেন প্রশ্ন করে : মজুর, রাজ, ছুতার এদের রোজ কত ক'রে হবে ?

: রোজ কারও থাকবে না। এক একজন গ্রুপ-লীডার যেন একজন ঠিকাদার। মাপ হিসাবে যা পাওনা হবে তাই গ্রুপলীডারের মাধ্যমে পাবে সকলে। সব কাজ ফুরনে হবে। প্রতি আইটেমের রেট থাকবে। সপ্তাহান্তে গ্রুপ যে কাজ করেছে তাকে তার মূল্য দেওয়া হবে। মজুরেরা যত পাবে তার দেড়া পাবে রাজ ও ছুতার। গ্রুপ-লীডার পাবে ডবল। বেশী কাজ করলে বেশী পাবে—কম করলে কম পাবে। গ্রুপ-লীডারদের কিছু আগাম টাকা দেব আমরা প্রথম অবস্থায়—মালমশলাও কিনে দেবো।

পরিকল্পনার নানান দিক আলোচনা হ'তে লাগলো। খুঁটিনাটি সব। কি ভাবে গ্রুপলীডার বেছে নেওয়া হবে। তারা মূলধন পাবে কোথায়। যন্ত্রপাতি, মালমশলা যদি তারা নিজেরা কিনতে চায়? বীরেনবাবু একে একে সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে যান। সকলেই আলোচনায় যোগ দেয়। একমাত্র ভূষণ রায় ছাড়া। আজ এতবড় জরুরী মিটিঙে সে একবারও কথা বলেনি। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে শুধু লক্ষ্য করে যাচ্ছিল নমিতাকে। আশ্চর্য! মেয়েটার কোনও পরিবর্তন হয়নি!

সব আলোচনা শেষ ক'রে, সবার প্রশ্নের জবাব দিয়ে বীরেন মৈত্র বললেন: আশা করি সকলের সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছি আমি। আর কারও কোনও প্রশ্ন আছে?

নমিতা বলে: আমার একটি জিজ্ঞাসা আছে। কলোনীর কর্মহীনা মেয়েদের সম্বন্ধে আপনাদের পরিকল্পনা কি বলছে?

বীরেনবাবু তাড়াতাড়ি বলেন: ও ইয়েস্। ও কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম আমি।

হেডমিস্ট্রেস বলেন: সেইটেই তো আমাদের ডয় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। আমাদের দিকটা প্রায়ই ভুলে যান আপনারা। এ অভিযোগ আছে আমাদের—

বাগচি সাহেব পাদপূরণ করেন: চিরন্তনী নারীর পক্ষ থেকে শাস্ত পুরুষের বিরুদ্ধে!

আবার হেসে ওঠে সবাই ।

বীরেনবাবু বলেন : আমিই বলতে ভুলেছি । আমাদের পরিকল্পনাকার ভোলেন নি । মেয়েদের জন্তেও প্রডাকসন সেটারে কয়েকটি বিভাগ থাকবে । স্টুডেন্ট, আচার তৈরী করা, পুতুল বানানো প্রভৃতি ।

যোগেন বলে : এ পরিকল্পনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত । কিন্তু আমি প্র্যাকটিকাল মানুষ, ঠাকুরদার ভাষায় ঘরপোড়া গোক । পরিকল্পনাটা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া পর্যন্ত তাই আমি অভিনন্দনটা মূলতুবী রাখছি ।

বীরেন মৈত্র বলেন : ধন্যবাদ বা অভিনন্দন নিতে আমি আসিনি এখানে । কাজকে আমিও ভালবাসি কথার চেয়ে । স্বতরাং কাজের মাধ্যমে সক্রিয় সহযোগিতা পেলেই আমি বেশী খুশী হব ।

বাগচি বলেন : আমি কিন্তু ধন্যবাদটা মূলতুবী রাখব না । যে উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে আপনারা আজ আলোচনা করলেন তাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি । অতীত ক্রটি বিচ্যুতির রোমন্থন না করে আপনারা যে গোড়া থেকেই গঠনমূলক চিন্তা করছেন এজন্য আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি নতুন কমিটিকে । সভাপতি অনুমতি করলে এবার আমরা উঠতে পারি ।

ঠাকুরদা সবার শেষে বলেন : আমিও বাগচি সাহেবের সঙ্গে একমত । অভিনন্দনটা মূলতুবী রাখতে চাই না । তবে আমি মৈত্র সাহেবের মত প্র্যাকটিকাল মানুষও—তাই মৌখিক অভিনন্দন না জানিয়ে সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চাই । আপনারা কিছু মিষ্টিমুখ ক'রে যান ।

সবাই হেসে ওঠে আবার ।

ব্যবস্থা করাই ছিল । কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবক চা-খাবারের প্লেট নিয়ে ঢোকে ।

হেডমিস্ট্রেস সুরেখা দেবীও লোক পরম্পরায় শুনলেন কথাটা । প্রথমটা বিশ্বাস করেন নি । এতবড় ভুল হবে তাঁর ? তিনি যে স্পষ্ট দেখেছেন নমিতার মুখে প্রথম প্রেমে পড়া লাজুক চাহনি । ভূষণের বিষয়ে যে অনেক কথা হয়েছে নমিতার সঙ্গে তাঁর । সেই নমিতা নিজের ছোট বোনের সঙ্গে

ভূষণের বিয়ে দেবার জন্তে ব্যস্ত হয়েছে ? স্বয়ং গিয়ে ভূষণের মাসি না গিসীর সঙ্গে কথা বলে এসেছে ? খবরটা অবিশ্বাস্য। মানব চরিত্র সম্বন্ধে এতবড় ভুল হ'তে পারে তাঁর ?

তারপর হঠাৎ টেবিলের উপর ক্রমে বাধানো একটা ফটোর দিকে নজর পড়তেই রান হাসি হাসেন সুরেখা দেবী। মানব চরিত্র সম্বন্ধে তিনি কি অখরিটি ? প্রেমে পড়া লোক দেখলেই চিনতে পারার ক্ষমতা আর বারই থাক সুরেখা দেবীর নেই নিশ্চয়ই। এ বিষয়ে ভুল তো তাঁর আজকে প্রথম হচ্ছে না। আরও একবার বিরাট ভুল হ'য়ে গেছে তাঁর। সেবারও একজন লোককে দেখে মনে হয়েছিল লোকটা প্রথম-প্রেমের বস্ত্রায় ভেসে যাচ্ছে বুঝি। নিমজ্জমান লোকটাকে হাত ধরে ভুলতে গিয়েছিলেন। কি হ'ল ফলে ? দুদিনেই বুঝতে পারলেন তাঁর ভুল। ঈশপের গল্পটা মনে পড়ল তাঁর। তাঁকে ভর করে নিমজ্জমান লোকটি উঠে গেল কুপের উপরে। তিনি পড়ে রইলেন অন্ধকূপে। সেই ভুলেরই মাশুল দিয়ে চলেছেন তার পর থেকে।

মিটিঙে ভেঙ্গে গেলে ওরা বেরিয়ে আসে। যে যার বাসার দিকে পা বাড়ায়। জীপে ক'রে সরকারী অফিসার দুজন চলে যান। নমিতাও অগ্রসর হয় বাড়ির দিকে। মিটিঙে ভূষণ এসেছিল। নমিতা ওর দিকে একবারও তাকায় নি। সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে যেন তাকে। সেই ছেলেটিও এসেছিল। রাখাল। কামিনীর সঙ্গে সেদিন যে ছেলেটিকে সাক্ষ্য ভ্রমণে যেতে দেখেছিল। ভূষণের পাশেই বসে ছিল। নমিতা সেদিকে দেখেও নি মুখ তুলে। দ্রুতপদে সে বাড়ি ফিরছিল। সাক্ষ্য হয়ে গেছে। বিকালে একগশলা বৃষ্টি হয়েছে। এখন আকাশ পরিষ্কার। গুরুপক্ষের চাঁদ উঠেছে। বাদলী কি অরোদলী হবে। গোখুলির আলো মুছে যেতেই এক কলক চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। সন্ত ধোওয়া করোগেটেড টিনের ছাদে জ্যোৎস্না পড়ে চিক্চিক্ করছে। জল জমে আছে এখানে সেখানে। বড়রাস্তা ধরে ফিরছিল সে। বাক ঘুরতেই নজরে পড়ল বড় মাঠটা। লরিতে করে মাল আসতে স্বক

করেছে। ইট নামছে লরি থেকে। থাক দিয়ে রাখছে। এখন লোকজনের
ছুটি হয়ে গেছে অবশ্য। এখানেই তৈরী হবে কারখানাটা। কলোনিবাসীর
অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে এখানে। অন্তত সেই রকম কথাই শোনা গেল
আজ। নমিতা মনচক্রে দেখতে পেল মাঠ জুড়ে উঠেছে প্রডাকসান্ সেক্টারের
বাড়ি। লম্বা লম্বা শেড। সেখানে কাজ শিখছে আগামী দিনের কারিগরেরা।
কত ব্যবসা শিখছে তারা। উদযান্ত পরিশ্রম করছে। করবে না? তাদের
মুখ চেয়ে রয়েছে যে কত বাপ মা-দ্বী-পুত্র।

হঠাৎ পিছন থেকে কে ডাকে : শুনুন।

নমিতা দাঁড়িয়ে পড়ে। যে ডেকেছিল এগিয়ে আসে সে। ভূষণ।

: আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।

নমিতা নির্বিকার ভাবে বলে : বলুন।

: এখানে? অনেক কথা বলার ছিল। কোথাও বসলে হয় না?

চারিদিকে তাকিয়ে নমিতা দেখল বসবার মতো কোনও স্থান নেই। সন্ত
বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় সব জায়গাই ভিজ।

: আমাদের বাড়িতে গিয়ে বসবেন?

: না, আমি নিরিবিলি বলতে চাই। চলুন না—স্টেশনের বেঞ্চিতে গিয়ে
বসি?

: স্টেশন? সে যে অনেকখানি।

: আপনার তাড়া আছে?

: না তাড়া নেই কিছু। আচ্ছা চলুন।

পাশাপাশি ছুজন হেঁটে চলেছে। কোনও কথাবার্তা নেই। ভূষণ আজ
দিন পনের পর এসেছে। এতদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। পনের দিন অবশ্য
সময় বেশী কিছু নয় কিন্তু ছুজনেই যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

নমিতাই প্রথমে কথা বলে : এবার মনে হচ্ছে কলোনীতে উন্নয়নের কাজ
কিছু হবে।

ভূষণ অন্তমনের মতো বলে : হঁ।

: আপনার কি মনে হয় কলোনীতে সত্যিকারের কাজ কিছু হবে ?

: দেখা যাক ।

: আমার তো ভরসা হয় না । এঁদের ব্যাপার তো জানা আছে ।
আঠারো মাসে বছর ।

ভূষণ জবাব দেয় না । নমিতা ইচ্ছা করেই বেনী কথা বলে । সে যে
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আছে ; তার মনে যে ঝড়ের স্পর্শ লাগেনি এটা প্রতিপন্ন
করতে চায় সে ।

ভূষণ চুপ ক'রে থাকায় আবার বলে : আপনি জবাব দিলেন না যে ?

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ভূষণ : এখন এইসব কথা ভাবতে পারছেন
আপনি ?

: কেন এখন কি হয়েছে ?

: আমার মনে এখন এসব চিন্তা নেই ।

: ও ।

আবার দুজনে চলতে শুরু করে ।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে জনমানব নেই । ওরা দুজনে গিয়ে বসে একটা খালি
বেঞ্চিতে । মাথার উপরে দোচালা থাকায় ভেজেনি সেটা । বেঞ্চির
তলায় শুয়ে ছিল একটা কুকুর । উঠে যায় সেটা । ভূষণ একটা বিড়ি ধরায় ।
দুজনেই চুপচাপ ।

সমস্ত ধরান বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ভূষণ, বলে : দেখুন, যতই কেন না
ভাব দেখান যে আপনি আমার বক্তব্য বুঝতে পারছেন না—আমি জানি
আপনি আমার প্রশ্নের কথা জানেন । তাই প্রশ্নটা আমি করব না । আপনি
কি জবাব দেবেন ?

আঁচলের চাবির রিঙ থেকে একটা চাবি অকারণে খুলতে খুলতে নমিতা
বলে : বারে, প্রশ্নটা আপনি বলবেন না—উত্তর দেব আমি ?

: ই্যা দেবেন । কেন আপনি গিয়ে আমার পিসীমাকে ঐ অদ্ভুত প্রশ্নাবলী
ক'রে এসেছেন ?

: অদ্ভুত ? অদ্ভুত কেন ? ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করেছেন । ওর মনে অমুরাগ সঞ্চারিত করেছেন, আপনার পিসীমা থেকে স্বরূপ ক'রে পাড়াস্বরূপ সকলে ধারণা করেছে আপনাদের বিবাহে এ মেলামেশার স্বাভাবিক পরিণতি হবে—আর এখন আপনার কাছে এটা অদ্ভুত লাগছে ?

ভূষণ একটু কাছে সরে এসে বলে : দেখুন, আর কেউ একথা বলে আমাকে জবাবদিহি করতে হ'ত । কিন্তু আপনার কাছে তো সে জবাবদিহির প্রয়োজন নেই । লভুকে আমি কি চোখে দেখেছি—আর কেউ না জাহ্নক আপনার তো তা অজানা নেই ।

: আমি ? না, আমি তা জানব কোথেকে ? আমি তো সর্বজ্ঞ নই । আমি ছুপুয়ে পড়াতে যাই স্থলে । আপনি তখন লভুকে এসে কি চোখে দেখেন সে তো আমার জানার কথা নয় ভূষণবাবু । তাছাড়া আপনি নিজেই আসেন, না কোন ছোট ছেলেকে দিয়ে জামা কাপড়গুলো পাঠিয়ে দেন তাই কি জানা সম্ভব আমার পক্ষে ?

ভূষণ চুপ ক'রে থাকে । তারপর হঠাৎ বলে বসে : আপনাকে কয়েকটা কথা বুঝিয়ে বলার দরকার ।

নমিতা কক্ষস্থরে বলে : কিন্তু হয়তো শোনার প্রয়োজন নেই আমার । কি দরকার ? কেনই বা আমাকে দোজবরে ব'লে মিথ্যে পরিচয় দিলেন, কেনই বা লভুর সঙ্গে গোপনে দেখা ক'রে তাকে মিথ্যে বলতে শেখালেন—তা শুনে আমার কি লাভ ?

ছ'জনেই কিছুটা চুপচাপ । তারপর ভূষণ ধীরে ধীরে বলে : আশ্চর্য মানুষের মন । এ নিয়ে আপনি পর্যন্ত যে আমাকে ভুল বুঝবেন তা স্বপ্নেও ভাবিনি ।

: কিন্তু ভুল বোঝার তো কিছু নেই ভূষণবাবু ।

: জানিনা আপনি সত্যিই ভুল বুঝেছেন—না ভুল বোঝার অভিনয় ক'রে সবে যেতে চাইছেন । আমার মানসিক অবস্থা আপনি বুঝতে পারেন নি এ আমি কল্পনাও করতে পারি না ।

একটু থেমে আবার বলে : আপনি পরিষ্কার ভাষায় আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু কি জানি কেন আমার মনে হয়েছিল সেটা আপনার অন্তরের কথা নয়। তাই আমি বার বার আসতাম আপনাদের বাড়িতে। লুকিয়ে দেখতাম আপনাকে। সামনে আসতে সাহস হ'ত না। সঙ্কোচও হ'ত। তারপর ভাবলাম, কেন আপনি হঠাৎ আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন তার কারণটা জানতে হবে। তাই লতুর সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতাম। জানতে চেষ্টা করতাম আপনি কি করেন, কি বলেন। আমি গোপনে যে আপনাকে অঙ্গসমর্পণ করে চলেছি এটা আপনাকে জানতে দেব না বলেই লতুকে বারণ করতাম আপনাকে জানাতে—আমার আসা যাওয়ার কথা। আমার সঙ্গে লতুর বয়সের তফাত দেখেও অন্তত আপনার বোঝা উচিত ছিল ওকে আমি ছোটবোনের মতোই ভালবাসি। আপনি কি ক'রে এতবড় ভুলটা করলেন?

নমিতার জবাব দিতে দেরী হয়, বলে : কিন্তু আমিই তো ছনিয়ার একমাত্র লোক নই। সমাজ আছে, সংসার আছে। তারা যদি ভুল বোঝে—

ভ্রমণ প্রায় চিৎকার ক'রে ওঠে : আমি স্বীকার করি না। তুমি তো জানতে নমিতা সমাজ সংসার আমার কাছে বড় কথা ছিল না। আমার চোখে তুমিই ছিলে সেদিন সংসারের একমাত্র লোক। আজও আছে।

নমিতা বলে : কিন্তু আপনিই তো আমাকে বলেছিলেন আপনার অন্তে একটি পাত্রী দেখে দিতে।

: কী প্রসঙ্গে বলেছিলাম, কেন বলেছিলাম তা তো তোমার মনে থাকার কথা নমিতা। আমি চেয়েছিলাম তোমার দক্ষ হাতে আত্মসমর্পণ করতে। তোমার অঙ্ক বাপের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলাম আমি—বিনিময়ে দিতে চেয়েছিলাম আমার মা-মরা বোনঝিটাকে মাছুষ করার ভার। তুমি তা নিলে না। আমার ভালবাসাকে অবহেলা করলে তুমি; কিন্তু তা নিয়ে ব্যঙ্গও যে করতে পারো তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

নমিতা চুপ ক'রে থাকে। কী বলতে পারে সে? এখন যে সে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে। লতু কী ভাববে? পিসীমা, বাবা! না, এখন আর

সম্ভবপর নয়। যাক ভূষণ তাহলে জানতে পারেনি নমিতার মনেও জেগেছিল গভীর অমুরাগ। ভূষণ যতখানি উদগ্রীব ছিল নমিতাকে পাওয়ার জন্য ততখানি আগ্রহ নিয়েই যে নমিতা এতদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে এ খবরটা তাহ'লে ভূষণ জানে না। মনে মনে আশ্রু হয় সে। জানলে আরও লজ্জায় পড়তে হ'ত। ছোটবোনের সঙ্গে যার বিয়ে দিতে হবে সে যদি জানতে পারে তার প্রতি গোপন অমুরাগ আছে নমিতার তাহ'লে লজ্জা রাখার স্থান থাকবে না।

ভূষণ হঠাৎ বলে : আমার একটা কথার সত্যি জবাব দেবে ?

: বলুন।

: আমাকে সেই সন্ধ্যায় কেন প্রত্যাখ্যান করেছিলে তুমি ?

: এটা নেহাৎ ব্যক্তিগত কথা।

: হোক। তবু জানতে চাই আমি।

: কী আশ্চর্য। এ বিষয়েও জবাবদিহি করতে হবে ?

: জবাবদিহি ! আচ্ছা থাক তবে।

নমিতা বুঝতে পারে ভূষণকে যা হ'ক একটা কিছু বোঝানো দরকার। না হ'লে লতুকে সে পুরাপুরি গ্রহণ করতে পারবে না। আবার পরমুহূর্তেই মনে হয় লতু ছেলেমানুষ। ভূষণের প্রতি তার অমুরাগ থাকতে পারে না। ওটা তার নেহাৎই ছেলেমানুষি। নভেলি ভালবাসার ব্যর্থ অমুকরণ ! জলের দাগ মুছে যাবেই। লতুর সম্মুখে পড়ে আছে যৌবনের উজ্জ্বল দিনগুলি। কত ভ্রমর আসবে সে বসন্তের যৌবনে। নতুন ক'রে সত্যিকারের ভালবাসতে শিখবে সে। আর নমিতা ? যৌবনের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে কেউ তাকে এসে ডাকেনি। অনাহৃত, অনাদৃত কেটে গেছে শতাব্দীর চতুর্থাংশ। ভূষণ এসে ওর হাত ধরতে চাইছে। ওর অঙ্ক পঙ্ক বাপের দায়িত্ব নিতে চাইছে। এ সময়ে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও অধিকার নেই নমিতার। জীবনকে অস্বীকার করা পাপ। আজ যে ভালবাসাকে সে জোর করে অস্বীকার করেছে—সে প্রেম মরে যাবে না। শিশু মহীকহের মত মাথা

চাড়া দিয়ে উঠবেই একদিন। তখন সব জানাজানি হয়ে যাবে। হয়তো অনাদর করবে ভূষণ লতুকে ! সংসার ছারখার হয়ে যাবে।

: তুমি কি আমাকে তোমার যোগ্য মনে কর না ?

নমিতা মন স্থির করে ফেলে। মিথ্যা কথাই বলবে সে। লতুর দিকে ওর মনটা কিরিয়ে দিতে হবে। লতুর সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব নিজে ক'রে আসার পর আর তার পক্ষে সম্ভব নয় বধু বেশে ভূষণের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। তাছাড়া দাদা-বোদির কাছে কোনদিনই কিরে যাবেন না হরিপদ পণ্ডিত। অন্তত সেদিন যে দৃষ্ট সে দেখেছে তাতে সে আশঙ্কাই দৃঢ় হয়েছে তার। বাপের দায়িত্ব তাকেই তুলে নিতে হবে। ভূষণকে সে তুলতে পারবে না ? কেন পারবে না। ছুদিন আগে তো সে চিন্তা না তাকে। বলে : আমার সঙ্গে অন্য একজনের বিষে আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে।

ভূষণ চমকে ওঠে। বলে : অন্য একজন ? কে সে ? কবে থেকে ?

: আপনি চিনবেন না। ছেলেবেলা থেকে।

: মিথ্যাকথা।

: মিথ্যা কথা ?

ভূষণ জোর দিয়ে বলে : নিশ্চয়ই। যেদিন প্রথম তোমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম হাত—সেদিন তুমি আমার হাত ধরবার জন্তে উদ্‌গীর ছিলে। তোমার চোখের কম্পনে, তোমার মুখের সলজ্জ রক্তিমভাষ তুমি ধরা পড়ে গিয়েছিলে। অত সহজে এড়ানো যায় না নমিতা। আমি স্থির জানি সেদিন তুমি আমার বাহুবন্ধনে ধরা দেবার জন্তে উন্মুখ ছিলে। আজ কেন তা নেই তাই শুধু জানতে চেয়েছিলাম আমি।

নমিতার পক্ষে আর কথোপকথন চালান শক্ত হয়ে পড়ে। তবু ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। একবার ধরা পড়লেই আর ফেরা যাবে না। তাই মনে মনে শক্ত হবার চেষ্টা ক'রে বলে : আপনি ভুল বুঝেছিলেন। কোনদিনই আমি ওভাবে দেখিনি আপনাকে।

ভূষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে : কোনদিন নয় ? মুহূর্তের জন্তও নয় ? যখন

মিঠুয়াকে আমার মেয়ে ব'লে তুল ক'রে বুকে চেপে ধরে বলছিল 'আমাকে মা বল'—তখনও নয়! নমিতা, কী নিষ্ঠুর তুমি!

ছুহাতে মুখ ঢাকে নমিতা। বলে : ওগো ; আর নয়, চুপ কর তুমি।

কায়ায় ভেঙ্গে পড়ে সে। ভূষণ ওকে টেনে নেয় নিজের দিকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। নমিতার সমস্ত সংযম ভেঙ্গে পড়ে। আর প্রতিবাদ করা নিখুঁত একথা বোঝে সে।

অনেকক্ষণ পরে ভূষণ বলে : এই যদি তোমার মনের কথা তাহলে লতুর বিয়ের কথা কেন বলতে গেলে তুমি? কেন প্রত্যাখ্যান করলে আমাকে?

নমিতা বলে : এখন আর ফিরবার পথ নেই। লতু জানে তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। বাবা, পিসীমা সবাই বিয়ের আয়োজন করছেন। তোমার পিসীমা পরশু এসে মায়ের সঙ্গে পাকা কথাও বলে গেছেন। এখন আর অমত কর না তুমি।

ভূষণ বলে : সে অসম্ভব। লতু ছেলেমানুষ—সহজেই সংপাত্রে তার বিয়ে দিতে পারব আমরা। তুমি তো বুঝতে পার এ বিয়ে হ'লে তুমি আমি কেউই সুখী হতে পারব না। লতুও সুখী হ'তে পারে না—আমাকে পেয়ে।

: কিন্তু এখন আর উপায় কি বল। না না, ছি ছি, সে আমি কিছুতেই পারব না।

: তোমাকে পারতেই হবে। আমি পিসীমাকে বলব—তোমার বাবাকে বলব।

: আর লতু? না গো—সে হয় না! ওই কারা আসছে এদিকে। ওঠ, চল যাই।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজে। আটটা সতেরোর লোকাল আসছে। টিকিটঘর খোলা হ'ল। একে একে লোক জমছে স্টেশানে। গুৱা উঠে পড়ে। ধীরে ধীরে ছুজনে চলে যায় দুদিকে।

কাজে নেমে অবস্থার গুরুঘটা অসুধাবন করতে পারেন ইঞ্জিনিয়ার বীরেন

মৈত্র । বস্তুত এ জাতীয় পরীক্ষা কখনও কোথাও হয়েছে কিনা জানা নেই তাঁর । কলকাতায় চীফ-ইঞ্জিনিয়ার এবং উপদেষ্টার কাছে বখন কাগজে কলমে এই স্বীকৃতি দেখেন তখন উল্লসিত হয়েছিলেন তিনি । মনে হয়েছিল এভাবেই হয়তো গড়ে তোলা যাবে নতুন এক সমাজ । সরকারী কাজের ঠিকাদারী ক'রে মুষ্টিমেয় কতকগুলি ঠিকাদার ক্ষীণ হয় বছর বছর । যদি ঠিকাদার নিযুক্ত না ক'রে ডিপার্টমেন্ট থেকে সরাসরি এইসব উদ্যোগ মানুষদের কাজে লাগানো যায়—এবং ঠিকাদারের মোটা মুনাফা লভ্যাংশ হিসাবে তাদের মধ্যে বেঁটে দেওয়া যায় তা হ'লে ভালই কাজ করা যাবে এদের দিয়ে । কর্মহীন এই কলোনীর লোকগুলি শিখে নেবে নানান কাজ । ক্রমশঃ দক্ষ হ'য়ে কলোনীর বাইরে গিয়েও কাজ যোগাড় করতে পারবে ।

যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে কাজ চালু করলেন মৈত্র সাহেব । প্রথম কাজের সূচনা করতে এলেন কলকাতা থেকে কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী । সকলে জমায়েত হলেন ইস্কুলের মাঠটায় । ঐখান থেকেই রাত্তার কাজ শুরু হবে । সর্বপ্রথমেই চীফ ইঞ্জিনিয়ার সকলকে ডেকে বললেন

: আজকে আমরা যা এখানে চালু করছি তার একটা বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে । আপনাদের এবং আমাদের যৌথ প্রচেষ্টায়, সকলের সততার এবং আন্তরিকতায় তা অদ্ভুত সাফল্য লাভ করতে পারে—আবার আপনারা যদি ব্যক্তিগত স্বার্থটাই বড় ক'রে দেখেন তা হ'লে এ পরিকল্পনা অন্ধরেই শুকিয়ে যেতে পারে । স্থির হয়েছে—এ কলোনীতে যা কাজ হবে তা আপনারাই করবেন । বাইরের কোনও ঠিকাদার আসবে না । মিস্ত্রি, মজুর, ছুতোর সমস্ত লাগানো হবে কলোনী থেকেই । এ কাজে হয়তো সবাই অভ্যস্ত নন । তাই তাড়াতাড়ি ভালো কাজ আমি মোটেই আশা করছি না—আমি বরং আশা করছি সততার সঙ্গে আপনাদের ঐকান্তিক চেষ্টা । ধীরে ভালো কাজ শিখতে পারবেন তাঁদের এ কলোনীর বাইরে নিয়ে গিয়েও ছোটখাট কাজ দেব আমি । একটা কথা আপনারা স্মরণে রাখবেন, টেণ্ডার ডেকে বাইরের ঠিকাদার লাগালে এ কাজগুলি আরও সম্ভার করা যেত । আমরা সেটা করছি না শুধু আপনাদের

নানান কাজে শিথিলে তুলব ব'লে। এই স্বযোগে কাজগুলো শিখে নিন আপনারা। কাকি দিতে গেলে নিজেরাই কাকে পড়বেন। আপনাদের সন্তানেরাই ভবিষ্যতে বলবে—বাবা কাকারা দুটো পরসার লোভে সর্বনাশ করে গেছে আমাদের।

পুনর্বাসন বিভাগের আর একজন বড় অফিসর বলেন: আমাদের ইচ্ছা আছে এইখানে আপনাদের দিয়ে ইট পোড়াব—টালি বানাব। আজও আমাদের এ রাজ্যে ইট-প্রস্তুতি-শিল্পে বাইরে থেকে পাতেরা-মিস্ত্রি আনতে হয়। আপনাদের এ সব ব্যবসায় নেমে পড়ায় দেশটা উপকৃত হবে।

ঠাকুর্দা অভ্যাগতদের স্বাগত জানান।

মেয়েরা শাঁখ বাজায়।

চীফ-ইঞ্জিনিয়ার এগিয়ে আসেন উদ্বোধন করতে।

যতীশবাবু একটি ছোট রূপার কর্নিক এগিয়ে দেন তাঁর দিকে। এটি যোগাড় করে রাখা হয়েছিল আজকের জন্তে।

চীফ ঠুর হাতখানা সরিয়ে দেন। তারপর সামনের একজন শ্রমিকের হাত থেকে লোহার কোদালটা টেনে নিয়ে মাটিতে মারেন প্রথম কোপ।

দিন সাতেক কেটে গেছে তারপর।

এই সাত দিনেই বীরেন মৈত্র হাঁপিয়ে উঠেছেন। প্রথম সমস্তাই হ'ল গ্রুপলীডার নির্বাচন। বেছে নিতে হবে সেইসব লোক যারা বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের—যারা পরিচালিত করবে সাধারণ কর্মীদের। যাদের লভ্যাংশ হবে সাধারণ কর্মীদের প্রায় দ্বিগুণ।

প্রায় দু'শ আবেদনপত্র এল গ্রুপলীডার হবার। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব প্রমাদ গুনলেন। বাগচি বলেন: বেশ তো মশাই—আপনি বলুন না ক'জন গ্রুপলীডার চাই আপনার?

বীরেনবাবু বলেন: তার আগে আপনি বলুন কলোনীতে কাজ করতে নামবে কত লোক?

বাগচি বলেন: আপাতত ধরুন হাজার।

নিভাইনদ বলেন : আমার মনে হয় প্রথমে শ'তিনেকের বেশী লোক
পাবেন না। উদয়-নগর হচ্ছে মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের কলোনী। এরা
মেহনতী মানুষ নয়। একে অনভ্যাস তার চক্ষুলা। শ'তিনেক লোক পেতে
পারেন প্রথমে।

বাগচি বলেন : বেশ, প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা যাক তিনশো।

বীরেন বলেন : গ্রুপে পনের জন ক'রে লোক কাজ করলে গোটা কুড়ি
গ্রুপ হবে সর্বসম্মত।

যতীশবাবু বলেন : হুশ' আবেদনপত্র থেকে যাত্র কুড়িটি লোক বেছে নিলে
তো বিরাট দলাদলি মারামারি বেধে যাবে।

বাগচি দৃঢ়ভাবে বলেন : দলাদলি মারামারি যাতে না বাধে
তা আমাদের দেখতে হবে। আপনি কুড়ি জনকেই কাজ দিন।
নিভাইবাবু দরখাস্ত দেখে বলুন কোন কুড়ি জনকে প্রথম কাজ দেওয়া
যায়।

ওরা সকলে মিলে বেছে বেছে বার করলেন কুড়িটি আবেদনপত্র। সবচেয়ে
যারা দুঃস্থ তারাই পেল অগ্রাধিকার।

এদের নিয়েই কাজ শুরু হ'ল।

কাজে নেমে মৈত্রসাহেব অসুভব করলেন অসুবিধাটা। এসব বাধা
বিলম্বগুলি লক্ষ্য হয় নি এতদিন। নিঃস্ব বেকারের পক্ষেই গ্রুপলীডারশীপ
পাওয়ার অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল বটে কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল কিছু
মূলধন না থাকলে ঠিকাদারী করা চলে না। দিনের শেষে সাধারণ মেহনতী
মানুষ দৈনিক খোরাকি দাবী করে। কয়েকজন গ্রুপলীডার চড়া স্বে টাকা
ধার করল ;—জড়িয়ে পড়ল ঋণজালে। কয়েকজন গোপনে বিক্রি ক'রে দিল
গ্রুপলীডারশীপ—যেমন করে সিমেণ্ট আর টিনের পারমিট বিক্রি হয়।
বেনামিতে চলল সে গ্রুপের কাজ। কেউ বা নিজে থেকেই এসে শরণাপন্ন
হ'ল ~~আবেদনপত্র~~। দরকার নেই ঠিকাদারীতে। চাকরি যদি দিতে পারেন
কিছু তাই দিন।

বাগচি বলেন : কাজ চালাবার জন্যে গ্রুপমীটারদের কিছু আগাম দেওয়া যায় না ?

বীরেনবাবু হতাশ হ'য়ে মাথা নাড়েন। বিনা জামানতে আগাম দেওয়ার ব্যবস্থা নেই সরকারি আইনে।

: দৈনিক মাপ ওঠানো যায় কি ?

: সেও এক রকম অসম্ভব।

সারাদিন মৈত্র কাজ দেখেন ঘুরে ঘুরে। শুধু রাস্তার কিছু কাজ বিতরণ করেছেন। অন্ত্যস্ত বড় কাজগুলি শুরু হয়নি। একজন ওভারসিয়ারও জয়েন করেছে কাজে। ছোট একটি ঘর ভাড়া ক'রে অফিস খুলেছেন। চেয়ার বেঞ্চি খাতাপত্র কিছুই আসেনি এখনও। ধারে চলেছে কারবার। প্রায় শ' চারেক লোক কাজ শুরু করেছিল। দৈনিক খোরাকির টাকা না পেয়ে কিছু লোক কাজ বন্ধ রেখেছে। এখন শ'তুই লোক খাটছে বিভিন্ন রাস্তায়। কোথাও 'বরোপিট' থেকে মাটি কেটে এনে রাস্তা উচু করছে, কোথাও নয় ইঞ্চি গভীর 'বক্সকাটিং' চলছে। কোথাও সোলিং বিছান শুরু হয়ে গেছে। লক্ষ্য করলেন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব—যারা কাজ করছে তারা প্রায় সবাই ভদ্রনন্দান। ওপারে ছিলেন ক্ষুদ্র বাঁধসায়ী, চাকুরে, শিক্ষক অথবা জমিদারী সেরেস্তার বিভিন্ন কাজে লিপ্ত। ঘোষ, বোস, মল্লিক, নন্দী তো আছেই—তাছাড়া রায়, চাট্‌জ্জ, গাঙ্গুলী, ভট্টাচার্যিও আছে।

বাগচি উৎসাহিত হয়ে বলেন : এই সব ভদ্রলোকের ছেলে যে মাটি কাটার কাজে এগিয়ে আসবে তা কিন্তু ভাবাই যায় নি।

মৈত্র বলেন : আপনি এতে খুসী হয়েছেন ?

: নিশ্চয়ই। জানেন কাল রাত্রে কি হয়েছে ?

গল্পটা শোনান বাগচি সাহেব। গতকাল কলোনীর কাজ সেরে সন্ধ্যা সাতটার লোকালে জংসনে ফিরছিলেন উনি। কলোনীতে এখনও ঔর কোয়ার্টার্স হয়নি। তাই রোজ যাতায়াত করেন। হঠাৎ বাগচির নজরে

গড়ে রাস্তার মধ্যে লঠন জেলে জনা পাঁচ-ছয় লোক কি করছে। ইট চুরি করছে না তো? উনি এগিয়ে আসেন। লোকগুলি উঠে দাঁড়ান। জনা কয়েক পুরুষ। তিনটি রমণী। দুটি বধু একটি অনুচা যুবতী।

একজনকে বাগচি চিনতে পারেন—শোভনাদেবী। ফুলের একজন শিক্ষয়িত্রী।

: কি করছিলেন এখানে?

ওরা জবাব দেয় না।

যুবতী মেয়েটির দু হাতে দুখানি থান ইট।

: ইট নিয়ে যাচ্ছেন কোথায়?

শোভনাদি হেসে বলেন: চুরি করি নাই। আমরা ইট সাজাইতাছিলাম।

বসন্ত রাস্তায় সোলিং বিছিয়ে দিচ্ছিলেন ওরা। শোভনাদি, তাঁর ছোট বোন, মা আর বাবা। প্রকাশ দিবালোকে কাজ করা সম্ভব নয় বলে রাত্রে লঠন জেলে কাজটা এগিয়ে রাখছিলেন। শোভনাদির বাপ নগেনবাবু একজন গ্রুপলীডার!

বাগচি বলেন: বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? এ সন্ধ্যা আর ক'দিন? সকলেই যদি চকুলজ্জার ভয়ে রাত্রে লঠন জেলে কাজ করে তবে রাত্রেই সবার দেখা সাক্ষাৎ হবে। সকলেরই চকুলজ্জা ভাঙবে।

মৈত্র বলেন: তা না হয় মানলাম। কিন্তু ঐ ভদ্রপরিবারটিকে অমিক শ্রেণীভুক্ত করায় কেন এত আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন আপনি? ওদের পক্ষে সত্যিকারের মেহনতি মাহুষ হওয়া কি সম্ভব? আর সম্ভব হ'লেও কি সেটা বাইনীয়?

বাগচি বলেন: তাও ভালো মশাই তাও ভালো। বিশ্বাস না হয় ওদেরই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন। তত্ত্বলোক সেজে কি লাভ হয়েছে ওদের? কতকগুলো বাড়তি চকুলজ্জা ছাড়া কি দিয়েছে ওদের—সমাজ? জন্মের মর্যাদাটা বিকৃত করার নজির বোধহয় একমাত্র ভারতবর্ষেই আছে। আপনাদের তত্ত্বলোক-

ছোটলোকের বিচার নিয়ে আপনারা থাকুন। এরা গায়ে খেটে দু'পয়সা রোজগার করুক।

তারপর উনি বলতে থাকেন ঠাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা। এর আগে উনি কিছুদিন ছিলেন বকুলতলা পি. এল ক্যাম্পের চার্জ। সেখানকার ইতিহাস বলে যান উনি।

: জোয়ান মর্দগুলো মশাই বসে বসে ভোল খেত। নড়ে বসবে না। তার চেয়ে এই ভালো নয়? তাছাড়া ঐ শোভনাদেবী অথবা তাঁর বাবা—ঠাঁরা আজ এভাবে দু'পয়সা বাড়তি রোজগার করছেন বইতো নয়। আপনার এখানে আজ যারা কাজ করছে তাদের অনেকে দু'পয়সা জমিয়ে আবার ফিরে আসবে মধ্যবিত্ত সমাজে। শুরু করবে অন্য ব্যবসা।

: আর মধ্যবিত্ত সমাজ যদি তাদের অপাংক্তেয় করে?

: তাতে ব্যেই গেল। আপনাদের সো-কল্ড ভুল্ললোকের চেয়ে মেহনতী মানুষদের অবস্থা আজ বেশী খারাপ নাকি?

আর একটি সমস্তার দিকে নজর পড়েছিল মৈত্রসাহেবের। সেটাও আলোচনা করেন। ঠাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে গ্রুপলীডার বেছে নেবেন। তারা কাজ শিখে ভবিষ্যতে হবে ঠিকাদার। নিজে হাতে কাজ করা না শিখলেও চলবে—তাদের জানতে হ'ব ঠিকাদারি বিত্ত। হিসাব রাখা, মালপত্র জোগাড় করা, লোক খাটানোর কাজ। আর নিম্ন শ্রেণীর লোক শিখবে মিস্ত্রির কাজ, মজুরের কাজ প্রভৃতি। কার্যকালে কিন্তু দেখা গেল এ কলোনীতে প্লট হোল্ডার সকলেই মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর ভুল্ললোক। উচ্চ মধ্যবিত্ত থেকে নিম্ন মধ্যবিত্ত। মৈত্র তাই বাগচির দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করেন। বাগচি বলেন : আমরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকলকেই গ্রুপলীডার করব।

: তা তো সম্ভব নয়। যে গ্রুপলীডার হবে তাকে শিখতে হবে ঠিকাদারি বিত্ত। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকেই যদি ঐ বিত্তা শেখাতে বাই তা হ'লে আসলে কেউই কিছু শিখবে না। তাছাড়া কলোনীর সবকটি লোকই ভবিষ্যতে

ঠিকাদার হ'ক—এও নিশ্চয়ই চাই না আমরা। ওদিকে বারা পীথনির কাজ শিখবে, মজুরের কাজ শিখবে—তাদেরও লেগে থাকা চাই নিজ নিজ লাইনে।

: অর্থাৎ আবার সেই ব্রাহ্মণ-কৃত্রিম-বৈষ্ণব-শূত্রের সমাজ ব্যবস্থা? কৃত্রিম বেদপাঠ করতে পারবে না—মজুর গ্রুপলীডার হ'তে পারবে না? ক্লাসলেস-সোসাইটি থেকে যাবে স্বপ্ন কথা?

বীরেনবাবু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন : ক্লাসলেস সোসাইটি বলতে আপনি যদি মনে করেন যে প্রতিটি মানুষ রাস্তা ঝাঁট দেওয়া থেকে এ্যাসেম্ব্লির স্পীকার হওয়া পর্যন্ত সব কাজ একসঙ্গে করবে—তাহ'লে সেটা স্বপ্ন কথাই থাকবে বটে।

: আমি কিন্তু তা বলিনি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। আমি বলছি যে লোক আজ সত্যিই ঝাঁটা হাতে রাস্তা সাফা করছে কাল সে উপযুক্ত হ'লে কেন তাকে বসাবেন না এ্যাসেম্ব্লির স্পীকার ক'রে? আজ যে মজুর কাল সে ঠিকাদার হ'তে পারবে না কেন—বিশেষত সবাই যখন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক।

বীরেনবাবু উত্তেজিত হ'য়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বাগ্‌চি আবার বলেন : যাক্ কাজের এই প্রথম অবস্থাতেই অত কথা আমাদের না ভাবলেও চলবে।

মৈত্র দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়েন : না বাগ্‌চি সাহেব। এখানেও আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। ভাবতে হ'লে এখনই এসব কথা ভেবে নিন। এরপর আর ভাববার সময় পাবেন না। কাজের তাড়ায় এগিয়ে যাবো আমরা একমুখো। কাজ অনেকটা ক'রে যখন অগ্রগতি বিষয়ে আশ্চর্যজনক করতে বসব তখন হয়তো দেখা যাবে অগ্রগতি হ'য়েছে বটে তবে আমাদের মুখটা ছিল লক্ষ্যের বিপরীত দিকেই। একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে আমরা এখানে যে এক্সপেরিমেন্ট করছি সেটা আগে কোথাও পরখ করা হয়নি। এই লোকগুলোই শুধু নয়—এদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভাগ্যও নিরূপন করছি আমরা। আমাদের একটা ভুলে হয়তো ভুগতে হবে এদের তিনপুরুষ ধরে।

বাগচি সাহেব বীরেন মৈত্রের পিঠে একখানা হাত রেখে বলেন : জানি মিস্টার মৈত্র, জানি। কলোনীর এই লোকগুলোকে দিয়ে আমরা পত্তন করছি এক নতুন সমাজ। এখানে সৃষ্টি হ'চ্ছে এক ক্ষুদ্রে পৃথিবী। এরা সবাই এখন নরম কাদার তাল। শিব গড়া অথবা বাদর গড়া নির্ভর করছে আমার আপনার উপরেই।

বীরেন মৈত্র জবাব দেন না। দুজনে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেন অফিসের দিকে। পথের দুধারে কর্মব্যস্ত মানুষ। ইট আসছে লরী ক'রে। মাটি কাটছে উদ্বাস্তরা—সোলিং বসাচ্ছে রাস্তায়। খোয়া ফেলছে। রোলার এখনও এসে পৌঁছায়নি। রেল লাইনের ওপাশে ইটখোলার 'কিলন' কাটা হ'চ্ছে। সেখানেও মাটি কাটছে উদ্বাস্ত শ্রমিক। মাস্টার-রোল-লেবার। নীরবেই পথটা অতিক্রম করেন দুজনে। মৈত্রসাহেব ভাবছিলেন কি ক'রে এইসব পুঁজিহীন নিঃস্বদের দিয়ে এই বিরাট পরিকল্পনাকে রূপায়িত করা যায়।

মনে আছে ক'লকাতায় ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুরা হেসেছিল পরিকল্পনা শুনে। সরকারের ঠিকাদারী বিভাগ! যতসব বোগাস! সহপাঠী ঋতব্রত বলেছিল : মায়ের কাছে আর মাসীর গল্প ক'র না ভাই। আমার জানা আছে সব। সদাশয় সরকার বাহাদুরের এইসব পোক্তপুজেরা চেনে শুধু দুটি জিনিস 'লোন' আর 'ভোল'। খেটে খাওয়া! মাপ করন লাগবো!

সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠেছিল।

মৈত্র প্রতিবাদ করেন নি। উদ্বাস্তদের মধ্যে ইতিপূর্বে কাজ করেননি তিনি। এখন তাঁর মনে হ'চ্ছে বাঙলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তে তিনি যে পরীক্ষা ক'রে চলেছেন আজ, তার সংবাদ জানে না বৃহত্তর পৃথিবী, হয়তো জানবেও না কোনদিন যদি তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ না করে। যদি স্বার্থসন্ধানী উদ্বাস্ত দলনেতা আর উৎকোচ-লোভী সরকারী কর্মচারীদের ষড়যন্ত্রে এ পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়! কিছু কমতা অবশ্য দিতেই হবে স্থানীয় কর্মচারীদের। গ্রুপলীডারের সংখ্যা যত বাড়বে—অর্থনৈতিক বন্টন ব্যবস্থা

ততই সাধের রূপ নেবে। অথচ বেশী গ্রুপলীতার হ'লে উৎকোচলোভী কর্মচারীর অযোগ্য হবে বেড়ে। রামের মাপ শ্রামের খাতার উঠল কিনা তখন আর ধরা যাবে না। দ্বিতীয়ত যে কোন সাধারণ ক্রিয়াকর্মের বেটুকু কমতা আছে তাঁর তা নেই। একজন সং ওভারসিয়ারকে তিনি পাঁচ টাকা মাহিনা বাড়িয়ে দিতে পারেন না—অসং ছেনেও আর একজনের 'পে-বিল' আটক করতে পারেন না। যারা সততার সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে নিরলস পরিশ্রমে তাঁর 'কন্ট্রাক্ট ডিভিসনকে' লাভবান করবে তাদের কোন বোনাস—কোন পুরস্কার দেবার কমতা তার নেই ;—তু তাঁর কেন এমনকি চীফ ইঞ্জিনিয়ারের পর্যন্ত নেই। আবার আইনের ফাঁক দিয়ে হাতে-নাতে ধরা না পড়ে কেউ গুরুত্ব করলেও কিছু কর্তনীয় নেই—হাত কামড়ানো ছাড়া। তাহলে কি ক'রে ভালো কাজ করা যাবে ?

আচ্ছা, এদের সমস্তা নিয়ে একটা উপস্থাপনা লিখলে কেমন হয় ? পড়বে না কেউ সে বই ? বিশ্বাস করবে না পড়ে ? চিন্তা করবে না এর সমাধানের ? যারা পারে তাঁর সমস্তাকে সরল করতে তারা এগিয়ে আসবে না ? কে জানে ! নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে ইতিপূর্বে একটি কাহিনী রচনা করেছিলেন মনে আছে। আর এও মনে আছে একটি বিখ্যাত প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকার তাঁর পরিচয় হয়েছিল কলনাবিলাসী বলে। সমালোচনায় সমালোচক বলেছিলেন 'অমুক চরিত্রটা অবাস্তব !' হাসি পায়, যখন তাঁর মনে পড়ে চরিত্রটা তাঁর কলমের মুখে জন্মায় নি—সেটা তাঁর চোখে দেখা !

বাগ্গিও মনে মনে ভাবছিলেন প্রায় একই কথা। পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তাঁর। এর আগে তিনি ছিলেন একটা পি. এল. ক্যাম্পের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। সেই বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প-বাসীদের সঙ্গে এই কলোনীর লোকলোকে মনে মনে তুলনা করছিলেন তিনি। বাচবার জন্মে এদের কী অপরিসীম আগ্রহ। অনভ্যস্ত হাতে কাজ করছে—চড়া রৌদ্রে বাড়িয়ে। বাচবে, ওরা বাচবে, নিশ্চয়ই মাছুষ হয়ে উঠবে আবার। সমস্ত প্রতি-

বন্ধকতা সঙ্গেও আবার সামাজিক মাল্লব হয়ে উঠবে ওরা। বিরাট পরিবর্তন হ'য়ে যাচ্ছে ওদের মধ্যে সকলের চোখের আড়ালে। এ পরিকল্পনাকে সাফল্য-মণ্ডিত করতে হবেই। অনেক প্রতিকূলতা দেখা দেবে। যাদের স্বার্থে আঘাত লাগবে তারাই আসবে বাধা দিতে। বড় বড় ঠিকাদার এ ব্যবস্থাটা পছন্দ করবেনা; পছন্দ করবেনা যারা বড় ঠিকাদারের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে অভ্যস্ত। ক্যাস-ডোলের ব্যবস্থায় যাদের বে-আইনি সুবিধা হ'চ্ছিল তারাও আসবে বাধা দিতে। কিন্তু সব বাধা অতিক্রম করতে হবে। সব সরকারী কর্মচারীই কিছু অসং নয়—তারা নিশ্চয়ই প্রাণ দিয়ে সাহায্য করবে বাগচির আর মৈত্রের।

চোখের সামনে বাগচি ভাঙ্গাগড়ার নতুন ইতিহাস শুরু হ'তে দেখছেন। ওপারে ওদের সমাজ বিভক্ত ছিল জাতের ভিত্তিতে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈশ্য জল-অচল জাতের গণ্ডিতে। কর্মগত জাতিভেদও ছিল। ব্যবসায়ী, চাকুরে, ভূস্বভোগী, ভূমিহীন চাষী অথবা ভাগচাষী। এ পারে এসে সবাই দাঁড়িয়েছে এক সমতলে। সবাই বেকার—সবাই উদ্ভাস্ত! কর্মগত ভেদ হারিয়েছে তার সীমারেখা। এখন বরং জেলাগত গোষ্ঠি গড়ে উঠছে ওদের মধ্যে। যশোর, পাবনা, মৈমনসিং, কুষ্টিয়ার লোকেরা নিজেদের জেলার লোকের মধ্যে অলুভব করে একটা স্মৃতি আত্মীয়তাবোধ। এক গ্রুপে কাজ কবছে যারা তারা এক পাড়ার বা এক ব্লকের লোক নয়—এক-প্রাক্তন-জেলাবাসী। দু পাঁচ বছরে না হ'ক—কালে ওরা সকলেই হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গবাসী। চট্টলা নোয়াখালী, ঢাকা, খুলনা, রাজসাহী হারাবে তাদের ভাষাগত বৈসম্য। ভাবেন বাগচি,—দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিরের দেশে এক দেহে লীন হ'য়ে ওরা রচনা করবে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়!

পরিকল্পনার কাজ ক্ষুদ্র এগিয়ে চলেছে। নিতাই ঠাকুরদা, ভূষণ, যোগেনদের আর নাওয়া খাওয়ার বিরাম নেই। কুড়িজন গ্রুপলীডার বিশটা রাস্তায় কাজ করছে। নতুন গ্রুপ আর লাগানো হয়নি। সাতদিনের মাথায়

বিল দেওয়া হয়েছে। মাথা পিছু মেহনতী যাহ্নুয়েরা পেয়েছে দৈনিক আড়াই টাকা থেকে তিন টাকা। লীডাররা পেয়েছে পাঁচ থেকে ছয় টাকা। এটা একেবারে আশাতীত। গ্রুপলীডাররা বেশী পাচ্ছে। স্বতরাং সবাই গ্রুপ-লীডার হ'তে চায়! জীবনে বেনামিতে একজন গ্রুপলীডারের কাজ চালাচ্ছে। গোপনে কিনে নিয়েছে সে গ্রুপলীডারসীপট। কলে তার বিড়ি ক্যাকটরির কাজ বন্ধ হ'তে বসেছে। যারা বিড়ি বানাতো তারা এসে অহুযোগ করল ঠাকুরদার কাছে। এ জাতীয় অহুযোগ অভিযোগ লেগেই আছে।

এদিকে ক্যাকটরী তৈরী, প্রডাকসন সেন্টার তৈরী আর ইট-খোলা করার শ্রাংসন এসে গেছে। মৈত্র শবরটা গোপনে জানালেন বাগচি সাহেবকে। এ কাজ তিনটি বড় কাজ—প্রত্যেকটিই লাখটাকার কাছাকাছি। এর জন্য ভালো গ্রুপলীডার চাই। মানে শুধু সং হ'লেই হবে না—একেবারে অভ্যস্তব্যবহুগুন লীডারও চলবে না। কি ভাবে গ্রুপ-লীডার বেছে নেওয়া হ'বে সেটা জানবার জন্যে মৈত্র সাহেব নির্দেশ চেয়েছিলেন উপরওয়াল। ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। চীফ-ইঞ্জিনিয়ার রহস্য ক'রে ছাড়া কথা বলতে জানেন না। বলেছিলেন: তোমরা দুই বারেক্সেই সেটা ঠিক ক'র। আমাকে বাদ দিলেও যথেষ্ট ঘোলা হবে জল।

বাগচি সাহেব নিতাইপদকে মোখিক বলেছিলেন ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভেবে দেখতে। নিতাইপদ, সেরকম লোক খুঁজে পাননি। কলোনীতে যে কটি লোকের মূলধন আছে তারা বিশ্বাসযোগ্য নয় মোটেই। অথচ বেশী টাকার কাজ সাধারণ লোকের মধ্যে কাউকে দেওয়াও যায় না। ক'দিন আপন মনেই ব্যাপারটা ভেবেছেন নিতাইপদ। শেষে এক বুদ্ধি বার হ'য়েছে তাঁর মাথা থেকে। 'মালটি-পারপাস কোম্পানি' তৈরী করতে হবে একটা। তার শেয়ার হোষ্ঠার হবে কলোনীর যত ছঃছ বেকার লোক। দশটাকা বা একশ টাকার শেয়ার কিনবে সবাই। স্টোসাইটির কর্মীপরিষদে রাখতে হ'বে কয়েকজনকে—যাদের গঠনমূলক কাজের

অভিজ্ঞতা আছে। ভূষণ, যতীন, রাখাল প্রভৃতি কয়েকজনকে মনে মনে স্থির করলেন নিতাইগদ।

গোড়া বেঁধে কাজ করার অভ্যাস ঠাকুরদার। তিনি স্থির করলেন গোটা কলোনীর প্রত্যেকটি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা জানা থাকা উচিত তাঁর গণকল্যাণ সমিতির। এটা থেকে তিনি স্থির করবেন কে কে শেয়ার হোল্ডার হবে। সরকার থেকে যদি কোম্পানিগেট লোনের ব্যবস্থা করতে পারেন তবে তো সোণায় সোহাগা। কর্মীদের লাগিয়ে দিলেন তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে আনতে। কেন, কি বৃহত্তম, সেটা গোপন রাখলেন আপাতত। স্বৈচ্ছাসেবকগুলিও ওসব প্রশ্ন ক'রে না কখনও। অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে যায় তারা।

ঠাকুরদা বসে আছেন তাঁর বৈঠকখানার চেয়ারে। অনবরত লোকজন যাতায়াত করছে। এটাই এখন গণকল্যাণের অফিস। অফিসেই মাঝে মাঝে ঠাকুরদা কারও নাড়ি দেখে শুধু দেন। সেটাও গণকল্যাণের কাজ।

: বিহারি তোমার ব্লকের স্ট্যাটিসটিক্যাল রিপোর্টটা হয়ে গেছে?

: হ্যাঁ ঠাকুরদা এই নিন।

একগাদা কাগজ সে এগিয়ে দেয় ঠাকুরদার দিকে। পাতা উন্টে দেখতে দেখতে ঠাকুরদা বলেন: প্রত্যেক বাড়ি গিয়েছিলে?

: প্রত্যেক বাড়ি। ক'জন লোক, কত বয়স, কি করে, সব লিখে এনেছি। ছককাটা ঘরে লিখে দিয়েছি—যেমন চেয়েছিলেন।

রিপোর্টটা ঠাকুরদা এগিয়ে দেন নমিতার দিকে: নাও ধর। কতগুলি ব্লক হ'ল?

নমিতা বলে: চারটে হ'য়েছে। শুধু ভূষণবাবুর ব্লকের রিপোর্টটা আসেনি এখনও।

: শেষ পর্যন্ত ভূষণই লাস্ট? নাঃ, ভোবালে দেখছি ছেলেরা। ওতো এমন ছিল না। কি হ'য়েছে বলত আজকাল ওর? কই ভূষণ কই?

: ভূষণবাবু আজ আসেন নি।

: দেখ দিকিনি কাণ্ড। ভূষণের রিপোর্টটা এলেই আমি কম্পাইল করে ফেলতে পারতাম।

স্বপ্নেন কর বলে : কিন্তু এ মহাভারত রচনা করে কি হবে ঠাকুর্দা ?

ঠাকুর্দা হাসেন : সে কথা এখন বলব না।

নমিতা বলে : বা রে—আমরা খেটে মরব অথচ জানতে পারব না ?

তখন নিতাই ঠাকুর্দা আসল কথাটা ভেঙ্গে বলেন। ঠর ইচ্ছা আছে একটা মাল্টিপারপাস কোয়্যাপারেটিভ গড়ে তোলা। বড় বড় তিনটি কাজের স্টাংসন এসেছে ;—প্রডাকসন সেন্টার, ফ্যাক্টরী আর ইন্টখোলা। এ তিনটি কাজই নেবে এই কোয়্যাপারেটিভ।

রাখাল বলে : তার সঙ্গে এ স্ট্যাটিসটিস্টিকের কি সম্বন্ধ ?

: বুঝলি না ? কলোনীর প্রত্যেকটি পরিবারের নাড়ি-নক্ষত্র থেকে গেল আমাদের কাছে। কোন পরিবারে ক'জন লোক, কত আয়। কোয়্যাপারেটিভ হবে শুনলে সবাই চাইবে মেথার হ'তে। আমরা তখন বেছে নিতে পারব এই চার্ট দেখে।

নমিতা ঘোণ দেয় : আচ্ছা ঠাকুর্দা, রিসিক অফিস থেকেও তো গতবার ইকনমিক্যাল সার্ভে করানো হয়েছিল। সে সব কাগজ কোথায় ? ভূষণবাবুর ব্রকের খবর তো সেখান থেকেও সংগ্রহ করা যায়।

: তা তো যায়, কিন্তু মুশ্কিল হয়েছে কি বাগচি সাহেবের মায়ের অস্থখ। দিন দশেক ছুটি নিয়েছেন তিনি। যতীশবাবু অফিসিয়েট করছেন। তিনি বলছেন সে সব কাগজ কোথায় তা একমাত্র বাগচি সাহেবই বলতে পারেন।

: অসম্ভব। বাগচি সাহেব তো নতুন এসেছেন। পুরানো রেকর্ড কোথায় আছে তিনি ছাড়া অফিসে কেউ জানে না ? রেকর্ড কোথায় থাকে তা রেকর্ড ক্লার্ক জানবে না—জানবে অফিসর ?

ঠাকুর্দা বলেন : যতীশবাবুকে তো চিনি। আমাদের ছু চোখে দেখতে পারেন না। কী মতলব আঁটছেন তা তিনিই জানেন।

হস্তদণ্ড হ'য়ে ঘরে ঢোকে যোগেন নায়েক, বলে : ঠাকুর্দা, কী কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছেন ঘরে বসে। বাইরে আশুন। ওদিকে সর্বনাশ হ'তে বসেছে।

: কি, হয়েছে কি ?

উঠে পড়ে সবাই।

: ভূষণদা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন—আপনাদের ডেকে আনতে। ফ্যাকটারীর মাঠটায় একদল নতুন রিক্সা এসে উঠেছে। যে স্টোর গোড়াউনটা নতুন তৈরী হয়েছে—সেটা রিক্সাভিতে ভরে গেছে। মাঠেও এসে বসেছে অনেকে। মৈত্র সাহেবও এসেছেন। ওরা উঠবে না বলছে।

: নতুন রিক্সা ? কই চলতো দেখি।

কাঁকা মাঠটার কাছে এসেই ওরা দেখতে পেলেন ফ্যাকটারির জগ্রে যে বিস্তীর্ণ জমিটা নির্দিষ্ট হ'য়েছে সেখানে অনেক লোক জমায়েত হ'য়েছে। অস্তুত দুশ' পরিবার। কঙ্কালসার মানুষ। নরনারী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মৃতবৎসা নারী, সম্মান জোড়ে সন্ত জ্ঞাননী। এরা কাবা ? এল কি ক'রে ?

এরা নবীন অতিথি। এ দেশের লোক নয়—ভিন্দেলী মানুষ। নবীনতম প্রতিবেশী রাজ্যের প্রবীনতম অধিবাসী। যে দেশে এরা এতদিন ছিল সেটা সম্প্রতি স্বাধীন হয়েছে। ওদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের আমল থেকে এই পরাধীন দেশে বাস করে এসেছে ওরা। সম্প্রতি সেখানে ওরা আবিষ্কার ক'রে বসল যে হাটের বাজারে চাল নেই, চাকরির বাজারে স্থান নেই, পথে ঘাটে মর্যাদাটুকু পর্যন্ত নেই। তাই ওরা চলে এসেছে সে দেশ ছেড়ে এদেশে। পড়ে ছিল শেরালদ' স্টেশনে শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ। পাশপোর্ট, ভিসা মানে না। অন্তায় করে থাকি—জেলে দাও। বে-আইনি কাজ ক'রে থাকি—আইন-মাফিক শাস্তি দাও। জেলেও 'খাতি দেয়'।

ওদের ছেলে দেওয়া হয় নি। তাই সংখ্যায় বাড়ছিল ওরা শেরালুদ' স্টেশনে। বাক্স-তোরক-পোর্টলা সাজিয়ে ডেলি-প্যাসেঞ্জারের শ্রোত থেকে রক্ষা করত নিজেকে। দেশে থাকতে যেমন পদ্মার জলশ্রোতের দিকে সজাগ সশঙ্ক দৃষ্টি রাখত—এখানেও তেমনি দশটা-পাঁচটার জনশ্রোতের দিকে মেলে রাখে সতর্ক দৃষ্টি। ওদের ভীড় ঠেলে গেটে পৌছাতেই ডেলি প্যাসেঞ্জারদের লাগে পনের বিশ মিনিট। ওদের ভিজিয়ে মাড়িয়ে ছোটো তারা গেটের দিকে। দোষ দেওয়া যায় না তাদেরও। মনটা পড়ে থাকে এ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টারের দিকে। পাচ মিনিট পরেই সেটা চলে যাবে সেকসানাল বড় সাহেবের ঘরে। সেখানে গিয়ে সই করা মানে যে কি তা ধারা জানেন না তাঁদের বোঝান বৃথা চেষ্টা। আর ধারা জানেন তাঁদের তা বোঝাতে যাওয়া বাহুল্য। এই জোয়ারের জল আবার ফিরে আসে সাড়ে পাঁচটা ছটায়—ভাঁটার টানে। আবার ওরা মাহুরটাকে উচু ক'রে বসে বসে তাকিয়ে দেখে।

এরই মধ্যে উনান জালিয়ে ভাত ফোটায়, স্বান করে, খায়, ভিজে কাপড় নেড়ে নেড়ে শুকিয়ে নেয়। তারপর কি ক'রে সেখানে খবর রটে গেল উদয়নগর কলোনীতে কাজ করলে খেতে পাওয়া যায়। সরকার ব্যবস্থা করেছেন। কাজ কর, খাও নাও! এর চেয়ে সুখবর আর কি হ'তে পারে। এই তো চায় ওরা। শুঠাও মালপত্র।

: ই টেরেন কই যাবো গো? উদয়নগর ইস্টিশানে ধরব?

একবার যদি কেউ বলে বসে 'হ্যাঁ'। বাস্। আর দেখতে হবে না। পিল্ পিল্ ক'রে লোক ওঠে ট্রেনে। টিকিট লাগে না ওদের। বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠেছি? হাজতে দেবে? দাও। হাজতেও খেতে পাওয়া যায়। জাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। দলে দলে লোক নেমে পড়ে উদয়নগর স্টেশনে।

: কই গো কি কাজ করম কও। খাতি দাও।

ব্যাপার দেখে ঠাকুরদা বিচলিত হলেন। অন্তত দু'শ পরিবার এসে উপস্থিত হয়েছে। ছুঁকিপীড়িত ককালসার নরনারী। প্রভাকসন সেন্টারের সাইটে

যেসব বাঁশ টিন এসেছে সেগুলো খাড়া ক'রে মাথার উপর একটা আচ্ছাদন
ভুলতে চায়। নতুন গুলাম্বর বেটা তৈরী হয়েছিল—তার মধ্যে তিল ধারণের
স্থান নেই। বীরেন মৈত্র নিজে দাঁড়িয়ে আছেন। ভূষণও দাঁড়িয়েছিল
সেখানে।

নিতাইপদ মৈত্র সাহেবকে হাত ভুলে নমস্কার করলেন।

মৈত্র সাহেব বলেন : এ কী নতুন ফ্যাসাদ বলুন দেখি। ওরা এসে জোর
ক'রে উঠেছে এখানে।

নিতাইপদ বলেন—ওরা এল কখন ?

কে একজন বলে কাল রাত্রি থেকেই লোক আসছে। আজ সকালের
লোকালেই এসেছে অধিকাংশ লোক।

মৈত্র বলেন : কি করা যায় বলুন তো ? বার করে দিতেও পারছি না।
সত্যিই ওরা যাবে কোথায় ?

ঠাকুর্দা বলেন : তা তো বটেই।

আর সহ হয় না ভূষণের। বলে : ফিরতি ট্রেনে ওদের জোর ক'রে ভুলে
দেওয়া হ'ক। না হ'লে আপনার যে লরিতে মাল আসছে সেগুলো তো খালিই
ফিরছে—তাতে বসিয়ে দেওয়া হ'ক।

নিতাইপদ বলেন : ছি ভূষণ ; ওদের আজকে যে অবস্থা হয়েছে একদিন
তোমার আমারও ঐ অবস্থা হয়েছিল। সেটা ভুলে যেও না।

: তাই বলে, আমাদের কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবে ?

: বন্ধ হ'য়ে যাবে কেন ? যেসব ডেসার্টার্স প্লট খালি আছে সেগুলিতে
ওদের বন্দোবস্ত দিতে হবে।

ইঞ্জিনিয়ার বলেন : কিন্তু ঐ দু'তিন শ' পরিবারের পিছনে যে দু'তিন
হাজার পরিবার আসছে না—তাই বা আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন ?

ঠাকুর্দা চুপ করে রইলেন। কথাটা ভেবে দেখা দরকার।

ভূষণ মৈত্র সাহেবকে লক্ষ্য করেই বলে : প্রথম থেকেই যদি কঠিন না
হন স্মার—তা হ'লে কিছুতেই এদের ঠেকাতে পারবেন না। আর প্রথম

দলটিকেই যদি আমরা ছোর ক'রে ফেরত পাঠাতে পারি তাহ'লে আর কেউ আসবে না এখানে।

নিতাইপদ ধীর কণ্ঠে বলেন : যারা এসেছে আমাদের এখানে অতিথি হিসাবে—ঘাড়ে ধরে তাদের বার ক'রে দেওয়াটার আমার মত নেই।

যোগেন উত্তেজিত হয়েছে, বলে : বেশ তবে আপনার কি মত তা বলুন ? এরা না হয় থাকল—যারা আসছে তাদের ঠেকাবেন কি ক'রে ?

ভূষণ বলে : আর ঘাড়ে হাত দিয়ে তো সত্যিই ওদের তাড়ানো হবে না। আপনি অল্পমতি দিন, আমরা ওদের বুঝিয়ে—

: অতি সময়ে গাড়িতে তুলে দিই। ভূষণ, গণকল্যাণ সমিতি গঠনে তুমি ছিলে আমার তান হাত। তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি—আমি তোমার সঙ্গে একমত নই। যারা এসেছে তারা অতিথি, তারা নারায়ণ !

নিতাইপদ চলতে শুরু করেন।

ভূষণ বিরক্ত হয়ে পিছন থেকে বলে : তবে চলুক আপনার অতিথি সেবা। আমাদের পরিকল্পনা যাক বানচাল হয়ে। মরুক কলোনীর বাসিন্দা। নারায়ণ সেবা তো বন্ধ হ'তে পারে না !

নিতাইপদ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ান। এ আঘাতটা বোধ হয় অপ্রত্যাশিত। তিনি নিজে বোধ হয় জানতেন না—তার আদর্শ এরা মনে প্রাণে নিতে পারেনি। এরা বাধ্য হ'য়েই তাঁকে দলপতি ক'রে রেখেছে। নিজ সেনাপতিকেই এখন বিরুদ্ধাচরণ করতে দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠলেন। বলেন : ভূষণ ! এতটা সর্কার স্বার্থপর মন যখন তোমার—তখন তোমার উচিত হয়নি গণকল্যাণ সমিতির সভ্য হওয়া।

ভূষণ বলে : কিন্তু এতটা সেক্টিমেন্টাল হয়ে আপনারই কি উচিত হয়েছে সেই সমিতির কর্ণধার হওয়া !

: দলপতি আমি নিজে হইনি। এই সেক্টিমেন্টাল কূলকে তোমরাই দলপতি নির্বাচিত করেছিলে।

: আমিও সভ্য নিজে হইনি ঠাকুর্দা। এই সর্দীর্ণচেতা স্বার্থপরকে কলোনীর পাঁচজনেই নির্বাচিত করেছে।

নমিতা আর স্থির থাকতে পারে না, বলে : কার সঙ্গে তর্ক করছেন ভূষণবাবু।

: তোমাদের নারায়ণভক্ত দলপতির সঙ্গে নমিতা !

ভূষণ ফিরে চলে।

কে একজন বলে : ভাঙ্গন ধরল মনে হচ্ছে গণকল্যাণ সমিতিতে।

ইঞ্জিনিয়ার মৈত্র বলেন : আপনি উত্তেজিত হয়েছেন নিতাইপদবাবু। কিন্তু ভূষণ বাবু তো অস্ত্রায় কথা কিছু বলছেন না। ওদের না ফিরিয়ে দিলে দলে দলে উদ্ভাস আসতে শুরু করে দেবে। ফ্যাকটারির জমিটা ওরা এখনই দখল করেছে। কাল কাজ বন্ধ। আবার মরবে সবাই। সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যষ্টির ক্ষতি তো অস্ত্রায় নয়। এই তো মানব সভ্যতার ইতিহাস।

নিতাইপদ রান হাসেন। হাত দুটি জোর ক'রে বলেন : ওইটা পারব না মৈত্র সাহেব। দেশঘর, জমি-জায়গা, স্ত্রী-পুত্র সব খুইয়েছি একে একে—অবশিষ্ট আছে ঐ একটা জিনিসই। সেটি তো ছাড়তে পারব না আপনার অহুরোধে।

মৈত্রসাহেব জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকেন। ঠাকুর্দা বলেন : আদর্শ-বাদের কথা বলছিলাম আমি। আজীবন রাজনীতি ক'রে এসেছি ! আপনাদের আধুনিক সভ্যতার যাকে অর্থনৈতিক বলছে সেই নারায়ণ ভক্ত গুরুর কাছেই দীক্ষা নিয়েছিলাম একদিন যৌবনে। এত সহজে তো আমার মত বদলাবে না মৈত্র সাহেব।

ইঞ্জিনিয়ার বলেন : কিন্তু আমি বলছিলাম—

বাধা দিয়ে ঠাকুর্দা বলেন : আপনিই এখানে কর্তা। পরিকল্পনাকে সুই ভাবে চালিয়ে নিতে যা করা উচিত করবেন আপনি।

: আমি যদি এদের সরিয়ে ফেলতে চাই, তাহলে আপনি অথবা আপনার গণকল্যাণ সমিতি কি আপত্তি জানাবেন ? বাধা দেবেন ?

ঠাকুরদা বলেন : সমিতি কি কয়বে তা এখন বলতে পারছি না। সমিতির একজনের কথা তো বকর্পেই শুনলেন ; তবে আমি নিজে নৈতিক আপত্তি জানাব। নমিতা, যোগেন—তোমরাও তোমাদের মতামত জানাতে পার।

নমিতা বলে : আপনাকে যখন দলপতি হিসাবে যেনে নিয়েছি তখন আপনার নির্দেশই যেনে চলব আমি।

যোগেন বলে : আমিও ঐ কথা বলতে পারতাম যদি দেখতাম ঠাকুরদার কোনও গঠনমূলক প্রস্তাব আছে। ওদের এখানে রাখতে চান এটুকুই জানিয়েছেন উনি। আর যারা আসছে তাদের সবচেয়ে উনি কি মত পোষণ করেন তা জানি না। ঠিক যুক্তি অল্পসারে পাঁচ-সাত-দশ হাজার লোক যদি এখানে আমাকে চায়—তবে তারাও অতিথি নারায়ণ। দলপতির প্রতি আহুগতা রাখা যেমন প্রয়োজন—তেমনি যারা আমাদের নির্বাচন করে পাঠিয়েছে তাদের প্রতিও আমাদের একটা কর্তব্য আছে।

ঠাকুরদা বলেন : আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে হবে। সর্বপ্রথমেই ব্যবস্থা করা দরকার যাতে ওরা আর না আসে। আমি এখনই কলকাতা যাচ্ছি। এখনই গেলে লোকালটা ধরতে পারব। আমি চলাম। বীরেনবাবু, আমার অবর্তমানে নমিতাই গণকল্যাণ সমিতির প্রতিনিধি।

ঠাকুরদা সোজা স্টেশনের দিকে রওনা হন।

অনিমেষের বুকের ব্যাথাটা অনেকটা ভালো হ'য়ে এসেছে। গায়েও বল পাচ্ছে এক আধটু। জংসন হাসপাতালেই সে আছে। দু' তিন দিন অন্তর অন্তর আসে কামিনী। প্রথম প্রথম স্বেচ্ছাসেবকেরা নিয়ে আসত। আজকাল একাই আসতে পারে। পারলে রোজই আসত ; কিন্তু যাতায়াত ট্রেন ভাড়া পড়ে সাড়ে ছয় আনা। এটা তো রোজ খরচ করা চলে না। আজ কামিনী একাই এসেছিল। আঁচলে বেঁধে এনেছে দুটো কল। ডাক্তারে অনিমেষকে কল খেতে বলেছে।

হাসপাতালের বারান্দাতেই দেখা হ'ল সেই নাস'টির সঙ্গে। ওকে দেখে বলল : কী? আজ যে খুব খুশী খুশী ডাব! কর্তাকে বাড়ি নিয়ে বাবার সময় হ'য়ে এল নাকি?

কামিনী প্রথম প্রথম সঙ্কোচ বোধ করত। আজকাল বেশ সহজ ভাবেই কথা বলতে পারে। এইসব সাদা পোষাক পরা মাথায় সাদা ঘোমটার উপর লাল কিতে বাঁধা মেয়েগুলি যে বাংলাতেই কথা বলতে পারে প্রথমটা সে বুঝতেই পারেনি। বলল : আপনারা ছেড়ে দিলেই নিয়ে যাই। আপনারাই যে ছেড়ে দিচ্ছেন না হাসপাতাল থেকে।

এ কথায় হাসির কি আছে? মেয়েটি হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ে। ও পাশের আর একজন নাস'কে ডেকে বলে : ও মতিদি, দেখুন কামিনী কি বলছে। বলছে ওর স্বামীকে ভালোমানুষ পেয়ে আমরা নাকি ভুলিয়ে ভালিয়ে আটকে রেখেছি, যার ধন তাকে ফিরে নিয়ে যেতে দিচ্ছি না।

মতিদি নাস'দের মধ্যে একটু আমুদে। এসে চোখ পাকিয়ে দাঁড়ান তিনি : আপনি এই কথা বলেছেন! আপনার কর্তাটি কি ভেড়া যে আমরা খুঁটিতে বেঁধে রাখব?

কি কথা থেকে কি কথা! কামিনী ঘাবড়ে যায়। এরকম ব্যাপার বুঝলে সে ও কথা বলতই না। ওসব কিছু ভেবে বলেনি মোটেই। আমতা আমতা ক'রে বলে : মানে আমি বলেছিলাম হাসপাতালের কর্তারা ছেড়ে দিলেই নিয়ে যেতে পারি। মানে, নাস'দের কেন দোষ দিতে যাবো আমি? আপনারা এত সেবা যত্ন করেন আমার স্বামীকে।

মতিদি আবার গর্জে ওঠেন : কী বলেন? আমরা আপনার স্বামী-সেবার অস্তরায়? আপনাকে স্বামী-সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে আমরা নিজেরাই তার সেবা যত্ন করছি?

কামিনী একেবারে হতভম্ব!

প্রথম নাস' বলে : তাছাড়া আপনি কথা কেঁরাচ্ছেন। প্রথমে আপনি হাসপাতালের কর্তাদের কথা মোটেই বলেন নি। বলেছিলেন 'আপনারা ছেড়ে

দিলেই নিয়ে বাই! সেখানে আপনারা মানে—আমরা। নাস'রা।
হাসপাতালের কর্তারা নয়।

কামিনী আমতা আমতা করে।

মতিদি ধমক দেয় : ঠিক করে বলুন হাসপাতালের কর্তারা না গিন্নিরা ?
আমরা হলাম হাসপাতালের গিন্নি। আর যেটুকু ঐ প্যাঁকাটি হ'চ্ছে হেডগিন্নি
মানে মুণ্ডগিন্নি। দেখছেন না খ্যাংরা কাঠির উপর আলুর দমের মত মুণ্ডটাই
তুধু আছে ওর।

বলেই হো হো ক'রে হেসে ওঠে দুজন !

তাহ'লে সবটাই রসিকতা! কামিনী হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে :
আপনারা এমন ভয় লাগিয়ে দেন।

: আবার ভয় কি ভাই ? ভয়ের রাজ্য তো পাব হ'য়ে এসেছো। আর
কিছুদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে অনিমেঘবাবুকে। বাড়ি নিয়ে যাওয়ার দিন
আমাদের খাইয়ে দিতে হবে কিন্তু।

: নিশ্চয়ই। কী থাকেন বলুন ? রসগোল্লা না সন্দেশ ?—কামিনী
খুশীতে উচ্ছল।

: না, এমন কিছু যা রেখে থাকে যায়। আচার, কাণ্ডলি, আমসব
কিছু বড়ি। কিন্তু আপনার নিজের হাতের তৈরী হওয়া চাই। আমাদের
মেসের ঠাকুরটার রান্না একেবারে অখাদ্য। খেয়ে খেয়ে মুখ মরে গেছে।
রসগোল্লা, সন্দেশ তো দোকানে গেলেই পাওয়া যায়।

কামিনী অবাক হয়ে যায়। এই সুসজ্জিত মেয়েগুলির পাটভাঙ্গা পোষাকের
তলায় আছে নাকি ঘরোয়া বাঙালী মেয়ে ? আচারের নামে যার জিবে জল
আসে, কাণ্ডলি দিয়ে শাক মেখে খেতে যে ভালোবাসে, বড়িভাঙ্গা যার
প্রিয় খাদ্য ?

সিঁড়ি দিয়ে গটগট ক'রে উঠে আসেন একজন ডাক্তার। কামিনী স'রে
দাঁড়ায়। ডাক্তার ডাকেন : নাস'!

: স্তার ?

: জমাদারকে মর্গ খুলতে বল। ডেডবল্ডি এসেছে।

: ইয়েস স্যার।

নাস ছ'জন তাড়াতাড়ি চলে যায় নিজের নিজের কাজে। কামিনীও অনিমেষের বিছানার দিকে এগিয়ে যায়। অনিমেষ আজ উঠে বসেছে। পিঠের দিকে একটা বালিশ দেওয়া। বলে: অত কি গল্প করছিলে ওদের সঙ্গে? দেখলাম জানাল দিয়ে।

: জিজ্ঞাসা করছিলাম কবে ছেড়ে দেবে। ওমা জানো কি অসভ্য? আমার কথার উল্টো মানে ক'রে আমাকে দিয়ে বলাতে চায় যে তোমাকে নাকি ওরাই আটকে রেখেছে।

অর্থগ্রহণ হয় না অনিমেষের। বলে: তার মানে?

: মানে মশ্‌করা আর কি!

: তা ভালো। গোরাকে আনলে না যে আজ?

: গোরা তার রাখালদার সাথে ফুটবল খেলা দেখতে গেল।

ঘরোয়া গল্প শুরু হয়ে যায়। কামিনী বলতে থাকে কলোনীর কথা। নিতাই ঠাকুরদার দলের লোকেরা কেমন যত্ন করছে তাকে। এবার থেকে সত্যিকারের হুঃস্থ লোকেরাই শুধু সাহায্য পাবে। কোনও পক্ষপাতিত্ব চলবে না। চালাক দেখি কে পারে? ঠাকুরদার কাছে চালাকি চলবে না। ও দিকে কি যেন একটা বিরাট কারখানা হবে। তার যন্ত্রপাতি সব আসতে শুরু করেছে। বিরাট পাঁচিল গাঁথা শুরু হয়ে গেছে। রাস্তা ঘাটের কাজ আরম্ভ হয়েছে। ইট আসছে ট্রাক বোঝাই। নতুন টিউব-ওয়েলও বসবে অনেকগুলি। অনিমেষ আগ্রহের সঙ্গে সবকথা শোনে।

আবার অনিমেষ বলে এ দিকের গল্প। কালরাত্রে নিমুনিয়া রোগীটি মারা গেছে। ও ধারের বিষ খাওয়া লোকটা কাল খালাস পেয়েছে। তার বিছানায়? এসেছে নতুন একজন। ওর পেটে নাকি পাথর আছে।

কামিনী বলে: পাথর? খেয়ে ফেলেছে বুঝি ভুল ক'রে?

: না গো। তাত ভালই খেয়েছে—পেটে গিয়ে শুধু পাথর হয়েছে।

: ও মা সে কি, তাই আবার হয় না কি ?

: তাই তো বলে নাসরি। শুধু ভাত ডাল খায় আর পেটে পাথর জমে। অনেক রোগী আসে নাকি এ রোগের।

কামিনী ভাবে—কই অল্প সকলেও তো ভাত-ডাল খায়—পেটে পাথর তো জমে না। তারপর নিজের মনকে নিজেই প্রবোধ দেয়—তবে আর ভবিষ্যৎ বলেছে কেন ?

অনিমেষ অনেক কথা বলতে থাকে। এবার কলোনীতে ফিরে গিয়ে আর সে রিক্সা চালাবে না। এবার সে একটা ঠিকাদারি কাজ জোগাড় করবে। বাড়ি ঘর তৈরী করা শিখবে। রাস্তা বানাবে, নলকূপ বসাবে। নিজে হাতে অবস্তু করবে না। মিস্ত্রি মজুরদের খাটাবে।

কামিনী অন্তমনস্ক হয়ে পড়ে। সে শুনছিল বারান্দায় দুটি ওয়ার্ড এ্যাটেণ্টার কথোপকথন।

: কেটে গেছে ? একেবারে দু আধখানা ?

: না তো বলছি কি ? পেট বরাবর চলে গেছে চাক।

: আহা ষাট ষাট,—কার বাছা গো। মা-বাপ বোধহয় জানেও না এতক্ষণ। কত বড় হবে গো ?

: দুধের বাছা। না তো বলছি কি !

কামিনীর মাতৃহৃদয় ছলে ওঠে। অনিমেষকে বলে : ব'স শুনে আসি। বাইরে এসে জানতে পায়—মর্গে যে মড়াটা এসেছে তার সম্বন্ধেই কথা বলছে ওরা। কামিনী প্রশ্ন করে : কতটুকু ছেলে গো ? কাটা পড়ল কি ক'রে ?

: দুধের বাছা গো, দুধের বাছা। ট্রেনে কাটা পড়েছে। একেবারে দু-আধখানা।

কামিনী বলে : তবু কত বয়স হবে ?

: বছর দশ বারো। উদ্ভাস গা। তলার আধখানার একটা খাঁকি হাফ প্যান্ট রক্তে ভেসে গেছে। ট্রেনে নাকি চানচুর ফিরি করত। কলোনীর ছেলে।

ট্রেনে চানাচুর ফিরি করত ? কলোনীর ছেলে !

মাথার মধ্যে হুলে ওঠে কামিনীর। হাসপাতালটা হুলতে থাকে।
পড়ে যায় সে।

: ও মা, এ আবার কি হল গো !

: ভিঁমি গেছে—দেখছ না ?

একটু পরেই জ্ঞান হয় কামিনীর। মতিদি বলে : হঠাৎ কি হল বলুন তো ?

কামিনী ধীরে ধীরে বলে : যে ছেলেটি কাটা গেছে তার নাম কি ?

মতিদি বলে : নাম তো পাওয়া যায়নি। এখনও বেওয়ারিস। পুলিশে
খবর দেওয়া হয়েছে। কেন বলুন তো ?

ডুগরে কঁদে ওঠে কামিনী।

লোক জমে যায়।

নাস ধমক দেয় : কী ছেলেমানুষী করছেন ! আপনার ছেলেকে আমি
চিনি। সে তো চার পাঁচ বছরের। এ অস্তুত বারো চোদ্দ বছরের ছেলে।
ট্রেনে চানাচুর ফিরি করত। হঠাৎ পা ফস্কে পড়ে যায়। আপনার কেউ নয়।

কামিনী কাদতেই থাকে : আমারই ! ও আর কেউ নয়। ও বাবলু !
আমার দেওর।

নাস ওকে জোর ক'রে উঠিয়ে নিয়ে যায় নিজের ঘরে। মুখে চোখে
জল দেয়। নিজের টুলের উপর বসিয়ে পাখাটা পুরা দমে খুলে দেয়।

: আপনি এ কী শুরু করলেন বলুন তো। কাকে কান নিয়ে গেছে
ওনেই কারা। কে বললে আপনার দেওর ?

: সেও যে চানাচুর বিক্রি করে ট্রেনে। বছর এগারো বয়স।

একটু থমকে যায় মতিদি। বলে : ডেডবন্ডি দেখবেন ?

কামিনী প্রবলভাবে মাথা নাড়ে : না না, কাটা ছেলে আমি দেখতে
পারব না। আমার বাবলুরে ! মতিদি এবার ভাবিত হ'য়ে পড়ে। হ'তেও
পারে ওর সন্দেহটা ঠিক। বলে : এখানে চুপ করে বসে থাকুন, আসছি।

মতিদি উঠে যায় ডাক্তারকে খবর দিতে। ব্যাপারটা এখন কর্তৃপক্ষকে

জানান উচিত। নিজের দায়িত্বে আর রাখা ঠিক না। ডাক্তার সমস্ত স্তনে নাস'কে সজ্জা করে আসেন এ ঘরে। সেখানে কেউ নেই। পাখাটা পুরো দমে ঘুরছে। কামিনী উঠে চলে গেছে। অনিমেষের কাছে যায়নি। হাসপাতালের আশেপাশেও খুঁজে পাওয়া গেল না তাকে। ডাক্তার নাস'কেই ধমক দিলেন : শুকে এ রকম একলা রেখে যাওয়া ঠিক হয়নি আপনার। অতবড় শক পেয়েছেন—কোথায় গেল মেয়েটি কে জানে! আবার না নতুন কোনও ক্যাসাদ বাধে।

মতিদিও নিজের ভুল বোঝে! একলা রেখে যাওয়া কোনক্রমেই উচিত হয়নি।

এ দু-তিনদিন ভ্রমণ কোনও কাজে মন দিতে পারছিল না। কলকাতার দোকান থেকে খবর এসেছে—সেখানেও যাওয়া দরকার। ধারে কারবার করতে হয় ভ্রমণকে। তার তাগাদা পত্র আছে। এদিকে কলোনীতে জনপ্রবাহ আসতে শুরু হওয়ায় পরিবহণের কাজও ব্যাহত হয়েছে। ঠাকুর্দা কলকাতায় গেছেন—করেন নি এখনও। বাগচি সাহেবও অস্থগ্নস্থিত। এখানেও ভ্রমণের অনেক কিছু করণীয় ছিল। ঠাকুর্দার অস্থগ্নস্থিতিতে বস্তুত সেই নির্দেশ দিয়ে এসেছে এতদিন গণকল্যাণ সমিতির। এবার কিন্তু সে নিজে থেকে যেতে পারল না। ঠাকুর্দা নাকি যাওয়ার সময় নমিতাকেই তাঁর প্রতিনিধি মনোনীত ক'রে গেছেন। নমিতা তাকে ডেকে পাঠায় নি। যোগেন নায়েক এসে খবরটা জানিয়ে গেছে। নমিতা ভ্রমণের তাহ'লে করেনি। কেন করবে? ঠাকুর্দার পরিত্যক্ত আসনে উন্নীত হয়ে নমিতা নিশ্চয়ই এখন ধরাকে সরা জান করছে। শুধু দারা-সুজা-ঔরঙ্গজেব আর মুরাদই নয় তাহ'লে স্বয়ং জাহানারাও সিংহাসনের একজন দাবিদার? যোগেন বলে একদল স্তাবক জুটেছে নাকি নমিতার। মক্ষিরাণী হয়েছেন তিনি!

একবার মনে হয়েছিল কুংকারে নমিতাকে সরিয়ে দেয়। এ কী ছেলে-মানুষী! এতবড় একটা কলোনীর এত হাজার লোকের ভাগ্য কি খেলার

জিনিস ? ঠাকুরদা নিজেরই রাজনীতির কিছু বোঝেন না—তিনি আবার দিবে গেলেন শাসনদণ্ড এমন একটি মেয়ের হাতে যাস্থানেক আগে যে ছিল তাঁড়ারঘরের চতুঃসীমার মধ্যে বন্দিনী নারী। তাও আবার এমন একটি সময়ে দিবে গেলেন যখন সমূহ লকট চলছে কলোনীর ভাগ্যাকাশে। ভূষণ জানতো নমিতা চক্ৰিশ ঘণ্টাও এ দায়িত্ব বহঁতে পারবে না—তাকে ডেকে পাঠাবে। এ বিপদে ভূষণ ছাড়া আর কাকে ডাকতে পারে সে ?

নমিতা কিন্তু তাকে ডাকতে পাঠালো না।

নিজের ঘরেই উস্খুস্ করে ভূষণ। এদিকে পিসীমাকেও লতুর ব্যাপারটা জানানো হয়নি। তিনি যথারীতি বিবাহের আয়োজন ক'রে চলেছেন।

পিসীমা এসে বলেন : তুই যে সকাল থেকে বিছানা ছেড়ে উঠলি না ? ব্যাপার কি ?

ভূষণ মনগড়া একটা জবাব দেয় : শরীরটা ভালো নেই।

পিসীমা এসে ওর ললাট স্পর্শ করেন। না, বেশ ঠাণ্ডা। বোধহয় ছেলে লজ্জা পেয়েছে। বয়স হয়েছে তো। বন্ধুবান্ধবেরাও হয়তো পিছনে লাগছে। তাই বাড়ি থেকে বার হয়নি আজ। পিসীর কিন্তু আজ একটু গরজ ছিল, তাই বলেন : শরীর বাপু তোমার ভালোই আছে। আজ একবার বাজারে যেতে হবে। একটু ভালো মাছ আর মিষ্টি আনতে হবে !

: কেন আজ কি ?

: না কিছু নয়, আজ লতুকে আর নমুকে ছপুয়ে এখানে খেতে বলেছি।

ভূষণ খুশী হয়। এ ভালোই হয়েছে। এই সূত্রে নমিতার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে। নমিতা ঠাকুরদাপন্থী—ভূষণ উগ্রপন্থী। সে যাই হোক এ বিপদের দিনে সে স'রে থাকতে চায় না। নমিতার সমস্ত দায় সে নিজ কব্ধে তুলে নিতে চায়,—নিজে যেচে গিয়ে সেটা বলা ভালো দেখায় না। কিন্তু আজ বাদে কাল থাকে ঘরের বধু ক'রে আনবে এই বিপদের দিনে তার পাশটিতে না দাঁড়ানোও অসম্ভব। এই স্বযোগে পিসীমাকেও বলে দেওয়া দরকার যে বিয়ে করতে সে পশ্চাৎপদ হবে না, জু—

ভূষণ ইতস্তত করে। কি ভাবে কথাটা পাতবে বুঝতে পারে না!

পিসীমা সেটা লক্ষ্য ক'রে বলেন : আমার কিছু বলবি ভূষণ?

: ই্যা পিসীমা। তুমি আমাকে কমা কর। এ বিষে আমি করতে পারব না।

পিসীমা বেন আকাশ থেকে পড়েন!

: বলিস কি রে? তুই তো এমন অস্থিরমতি ছিলি না।

: তুমি আমাকে না জানিয়ে ঠাণ্ডের কথা দিলে কেন?

: তোকে না জানিয়ে? মানে? তুইই তো নিজে থেকে প্রস্তাব করেছিলি নমিতার কাছে।

ভূষণ উত্তেজিত হয়ে বলে : কে বলে?

: কে আবার বলবে? নমিতা বলেছে। লতুও শুনেছে।

: কিন্তু—

: ভাখ ভূষণ! আমাকে আর পাগল ক'রে তুলিস না। এতদূর এগিয়ে আসার পর তুই যদি এখন বেকে দাঁড়াস—তাহ'লে সত্যি বলছি গলায় দড়ি দেব আমি—তারপর তোর যা ইচ্ছে হয় করিস তুই—

হন্থন্থ করে পিসীমা বেরিয়ে যান।

ভূষণ শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল ভাবতে থাকে। নমিতা নাকি আজ আসবে এ বাড়ি। ওর অবত'মানেও নাকি একদিন এসেছিল। আজই সমস্ত ব্যাপারটার চূড়ান্ত মিমাংসা ক'রে ফেলতে হবে। কিন্তু লতুটা যে উপস্থিত থাকবে। ওর সামনে কি ক'রে ব্যাপারটা মেটানো যায় এটা বুঝে উঠতে পারে না।

মিঠু এসে বলে : লতু মাঝিমা আজ আমাদের বাড়িতে আসবে না মাঝা? ভূষণ বিরক্ত হ'য়ে বলে : লতু মাঝিমা কি? লতুকে তুমি দিদি বলবে।

: না দিদি বলেছে—ও মাঝিমা হয়।

: না লতুদি।

: বা রে। আমি লতুমামিকে লতুদি বলব কেন? ওতো আমার মামি হয়।

ভূষণ হঠাৎ ঠাস্ ক'রে এক চড় মেয়ে বসে।

আদরের মিঠুয়া মামার হাতে কখনও মার খায় না। কেঁদে ওঠে সে। ভূষণ স্থির করে আর অগ্রসর হ'তে দেওয়া নয়। এখনই রান্নাঘরে গিয়ে পিসীমাকে বলে আসা দরকার যে সে লতুকে বিয়ে করতে পারবে না। কিছুতেই নয়। রাজি হ'লে সে নমিতাকেই গ্রহণ করবে। না হ'লে যেমন চলছিল সংসার তেমনই চলুক।

রান্নাঘরের সামনে এসে দেখে পিসীমা নেই। টিউবওয়েল থেকে জল আনতে গেছেন। লতু বসে তরকারি কুটছে। কাজের বাড়ি,—পিসী একা মানুষ—তাই বোধহয় এই সাত সকালেই নমিতা পাঠিয়ে দিয়েছে বোনকে। একখানা খয়েরি রঙের লালপাড় তাঁতের শাড়ি পরেছে লতু। সজ্জা স্নান করেছে। চুলের নিচে একটা গিঁঠ বেঁধে পিঠের উপর ফেলে রেখেছে ভিজা চুল। একটা প্রসাধন করেছে—বেশ বোঝা যায়। কপালে একটা খয়েরের টিপ। সরু করে কাজলপরা চোখ দুটি তুলে ভূষণের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ নিচু ক'রে একাগ্রমনে তরকারি কুটতে লাগল।

ভূষণ বলে : পিসীমা কই?

: জল আনতে গেছেন।

: ও।

ভূষণ বাজারের থলিটা তুলে নেয়। একবার ভাবে কথাটা লতুকে বললেই বা কেমন হয়? দুদিন আগে হ'লে ভূষণ হয়তো এ অবস্থায় বলত—‘নেমন্তয়ের গন্ধে বুড়ি ঠানদি এই সাত সকালেই এসে জুটেছ? কি নোনা বাপু!’ লতুও তৎক্ষণাৎ হয়তো জবাব দিত ‘ভাত না ছড়াতেই আজ ভূষণী-কাক রান্নাঘরের কাছে এই সাত সকালেই ঘুরঘুর করছে কেন? হ্যাংলা একেই বলে।’

আজ এ জাতীয় কথোপকথন বেন নিতাস্তই অসম্ভব।

মিঠুয়া কাদতে কাদতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। লতুকে জড়িয়ে ধরে বলে : মামিমা—মামা মেরেছে।

লতু বাঁটিটা কাত ক'রে রেখে মিঠুয়াকে কোলে তুলে নেয়।

ভূষণ এক পা এগিয়ে আসে। বলে : তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

লতুর মুখে কে যেন একমুঠি আবার ছুঁড়ে মারে। লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠা ঐ পনের বছরের মেয়েটি কি বুঝলে তা সেই জানে। নীচু স্বরে বললে : পাগলামো ক'র না। পিসীমা এখনই ফিরে আসবেন। মিঠুও জেগে রয়েছে ! বলেই দ্রুতপদে উঠে গেল ঘরে।

ভূষণ অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর ধীরে ধীরে চলে যায় বাজারের দিকে।

ভূষণের উপস্থিতিতে আজ নমিতা প্রথম আসবে ওদের বাড়ি। ঘুরে ঘুরে বাজার থেকে ভালো ভালো জিনিস কেনে ভূষণ। পিসীমার যেমন কাণ্ড। কাল বললে জংসনের বাজার থেকে ভাল জিনিস নিয়ে আসতে পারত। নমিতার সঙ্গে ব্যবহারে ভূষণ তাকে বুঝিয়ে দেবে যে গণকল্যাণ সমিতির দলাদলির জন্তে তার মনে কোনও রেখাপাত করেনি। হাতে পারে সেখানে নমিতা আর ভূষণ ভিন্ন মতাবলম্বী। ভূষণ, যোগেন এরা হ'ল নব্যপন্থী। কত ধানে কত চাল তারা বোঝে। ঠাকুরদা গত শতাব্দীর রাজনীতি আঁকড়ে পড়ে আছেন। গত শতাব্দীই বা কেন ও তো হ'চ্ছে ঐচ্ছিকতার খিয়োরি। মেরেছ কলসি কানা! নমিতা ভাগ্যচক্রে ঠাকুরদার অবর্তমানে উঠে বসেছে তাঁর শূন্য গদিতে। ভূষণ কথাবার্তায় বুঝিয়ে দেবে যে রাজনীতি আর জীবন-নীতি দুটো পৃথক জিনিস। গণকল্যাণ সমিতির কার্যকরী মিটিংএ সে নমিতার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করবে ;—কিন্তু সমিতির বাইরে এই বিস্তৃত জীবনের ক্ষেত্রে সেজন্য কোনও ক্ষোভ নেই ভূষণের। সেখানে সে চায় নমিতার হাত ধরে চলতে। নমিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে। একথাটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। তাছাড়া তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে রাজনীতির সঙ্গে সমাজনীতি আর ধর্মকে জড়িয়ে ফেলা মারাত্মক ভুল। সরলতা যদি ধর্মের

তিতি হয় তবে শঠতা হবে রাজনীতির মেরুদণ্ড। চাণক্য থেকে চার্লিস সব বিখ্যাত রাজনীতিবিদই একথা প্রমাণ ক'রে গেছেন। গান্ধী? তিনি ঐ বুদ্ধ চৈতন্যের দলে—রাজনীতিক তিনি ছিলেন না।

বাজারে বেশ উদ্বেজনা। ফ্যাক্টোরির মরদানে না কি গণ্ডগোল হয়েছে। পুলিশ ভ্যান এসেছে। শুনে ভূষণ একটু বিচলিত হয়। পুলিশ এসেছে? কেন?

বি. ব্রকের হারাণ দেবনাথের ভাইপো নয়ান দেবনাথ বলে : ভ্যানে কর্যা ঐ রিফুজিডিকে লয়া যাবে গা।

হেয়েন নন্দীমজুমদার বলে : ও! চাইলার হাতের মোয়া নয় হে! পুলিশ কইলেই উয়ারা উঠব গাড়ি?

: এমনিতে না উঠে ঠেলার নামে উঠব।

ভূষণ রীতিমত বিচলিত হয়। নমিতা হয়তো ওখানেই আছে। বাগচি নাই, ঠাকুর্দা নাই, ভূষণ, যোগেন সবাই স'রে দাঁড়িয়েছে। একলা মেয়েটি কি করতে পারে এখন? এ সময়ে স'রে দাঁড়ানো অসম্ভব। হ'তে পারে তার সঙ্গে ওর মতের মিল নেই—তবু এ সময়ে যদি ওর পাশে গিয়ে না দাঁড়ায় তবে সে কেমন সহযোগী। শুধু উৎসবের দিনে বন্ধুর আয়োজন নয়। দুঃখ রাজেই তার আয়োজন বেশী। আর আদর্শের ছুতা ক'রে বিপদ থেকে স'রে দাঁড়ানো কাপুরুষতা। নমিতা ভাবতে পারে বিপদ দেখে ছুতা ক'রে ওরা সরে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া ঠাকুর্দার ঐ নারায়ণ-সেবা-মার্কা ভাবানুভাব নমিতাকে ভেসে যেতেই বা দেবে কেন ভূষণ? এটা গণতন্ত্রের দেশ। নিজের বিশ্বাস অপরকে বুঝিয়ে নিজের দলে টেনে আনার অধিকার এখানে প্রত্যেকেরই আছে। নমিতা, যে তার জীবনসঙ্গিনী হবে তাকে সে বুঝিয়ে-সুজিয়ে সম্মতে আনতে পারবে না? এত বুদ্ধিমতী নমিতা,—সে বুঝবে না যে ঠাকুর্দার অতিথি-নারায়ণের আদর্শবাদ কালোনির জন্ত নয়—ওর উচিত বেলুড়ঘাটে গিয়ে রাজনীতি করা? হঠাৎ দেখা হয়ে গেল নবীন পতিভণ্ডার সঙ্গে।

: এই যে ভূষণবাবু। আপনি কোন দলে ?

: কোন দলে ?

: বিতারণ পক্ষে না আয়ত্ব পক্ষে ?

: মানে ?

: শোনেন নি ? আপনাদের দলেই যে ভাঙ্গন ধরে গেছে। আপনাদের ঠাকুর্দা নারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করছেন। তাতে পরিকল্পনা ভেঙে যায় বাক আর যোগেন, কানাই, তাছাড়া আমরা সবাই চাই যেমন করে হ'ক কাজ চালিয়ে যেতে। নমিতাই এখন আপনাদের রাজরানী হ'য়েছেন। কয়েকজন চ্যাঙড়া স্তাবক তাকে চামর ঢোলাচ্ছে এখন।

কে একজন বলে : আরে নবীনদা আপনি যে মায়ের কাছে মাসির গল্প শুন করলেন। বিতারণ পক্ষের কাণ্ডারী হ'চ্ছেন ভূষণবাবু !

এ আলোচনা ভালো লাগছিল না ভূষণের। ক্ষতপদে সে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

পিসীমার রান্না সারা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বেলা একটা বাজে। ভূষণ নিজের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছিল। ক্যাকটারির মাঠে তার যাওয়া হয়নি। সে ভেবেছিল নমিতা এলে খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে একসঙ্গেই যাবে সেখানে। নমিতাকে আগে বোঝাতে হবে পরিস্থিতিটা। না বুঝতে পারার মত জটিল নয় সমস্যাটা। মিঠু খেয়ে দেয়ে মামার পাশে চুপটি ক'রে শুয়ে পড়েছে। কর্মব্যস্ত লতু মাঝে মাঝে ঘরবার করছে। ছ একবার চোখাচোখিও হ'য়েছে ভূষণের সঙ্গে। কথাবার্তা হয়নি আর কিছু। নমিতা এতবেলাতেও আসেনি।

পিসীমা এসে ডাকেন : তুই এবার খেয়ে নে ভূষণ।

: সে কি ? আর তোমরা ? নমিতা দেবী তো এলেনই না এখনও।

: নমিতা শবর পাঠিয়েছে সে আসতে পারবে না।

: ও ! গরীবের বাড়ির নিয়ন্ত্রণ রাখা বুঝি সম্ভবপর হ'ল না।

পিসীমা খমক দেন : তোর যেমন কথা। ওর এখন কত কাজ।

: তা তো বটেই। উনি হ'চ্ছেন গণকল্যাণ সমিতির কর্ণধার, আর আমরা সামান্য কাটা কাপড়ের কারবারী।

গামছাটা কাঁধে ফেলে টিউব-ওয়েলের দিকে পা বাড়ায় ভূষণ।

হরিপদ পণ্ডিত একা বসেছিলেন দাওয়ায়। মনটা ভালো নেই তাঁর। লতু সকালে উঠেই গেছে ভূষণদের বাড়ি। নিমন্ত্রণ আছে তার। নমিতাও বেরিয়ে গেছে সাত সকালে। স্কুলে যায়নি। গেছে গণকল্যাণ সমিতির কাজে। দুপুরেও ফিরবে না—তারও নিমন্ত্রণ আছে ভূষণদের ওখানে। বিদ্যুৎবাগিনী ছুজনের জন্তু ভাতে ভাত রাঁধতে বসেছেন রান্নাঘরে। সংসারটা যেন ক্রমশই নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। নমিতাকে এতটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। হাজার হ'ক মেয়েমানুষ। কাল রাতে ফিরেছে রীতিমত রাতে। আজও ভোরবেলা উঠে গেছে।

ঝাপসা চোখের দৃষ্টিতে মনে হ'ল কে যেন বাগানের গেট খুলে ভিতরে আসছে। সচকিত হন বৃদ্ধ। কে এল? লোকটি এগিয়ে এসে বসে পড়ে তাঁর পায়ের কাছে।

: কে?

উত্তর দেয় না কেউ। পায়ের ধুলা নেয়।

বৃদ্ধ হাতটা ধরেন।

: কে লতু? নমু?

জবাব পাওয়া যায় না। তারপর অশ্রুঝর কণ্ঠে লোকটা বলে ওঠে : বাবা!

: কে বোমা! বোমা তুমি! এস এস মা—অম্ম কেমন আছে?

অভিमानে, আশঙ্কায় কামিনী ধরধর ক'রে কাঁপতে থাকে! জবাব দিতে পারে না। কি ক'রে যে সে হাসপাতাল থেকে পথ চিনে এতটা এসেছে তা শুধু সেই জানে। হাসপাতাল থেকে প্রথমে পাগলের মতোই ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। একবারও পিছন ফিরে তাকায়নি। প্রতিমুহূর্তে মনে হয় পিছন পিছন ছুটে আসছে মতিদি। কোলে তার দলিত পিঠে এক খণ্ডিত বালকের

উদ্বিগ্ন। যত্নিদি যেন কেবলই পিছন থেকে প্রসন্ন ক'রে চলেছে : দেখুন তো।
এই কি আপনার দেওর ?

কামিনী ছুটতে থাকে।

কোথায় যাবে সে ? হাসপাতাল থেকে শুধু স্টেশনের পথটাই সে চেনে।
নিজের অজ্ঞাতসারে অবচেতন মনের নির্দেশে এসে পৌঁছায় স্টেশানে। উত্তর-
মুখী একটা ট্রেন ছাড়ছে। কলোনীর দিকেই যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ সে মনস্থির
ক'রে ফেলে। সে যাবে তার খন্তরের কাছে—যেখানে থাকে বাবলু। হয়তো
গিয়ে দেখবে বাবলু বাড়ির সামনে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ড্যাংগুলি খেলছে—
অথবা বেলায় ঘুমিয়ে রয়েছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। মনটা হ হ ক'রে ওঠে
তার। ভগবান, বাবলুকে যেন সে দেখতে পায় ও বাড়ি। আর কিছু সে
চায় না !

একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে যায় অন্ধের। চিৎকার ক'রে
ওঠেন তিনি : কী হয়েছে ? কথা বলছ না কেন তুমি ?

কামিনীর ঠোট ছুটি নড়ে ওঠে। কিছু বলতে পারে না।

কামিনীর হাতের উপর দ্রুত হাত বুলাতে বুলাতে বৃদ্ধ বলেন : আঃ !
কথা বলছ না কেন তুমি ? বোমা ! এটা কি শাখা, না প্ল্যাস্টিক ?

কামিনী রুদ্ধ কণ্ঠে বলে : উনি ভালো আছেন।

: ভালো আছে ! আঃ, বাঁচালে তুমি। অনিমেষ ভালো হয়ে গেছে ?
ওগো শুনছ ?

ও পাশ থেকে বেরিয়ে আসেন বিন্দুবাসিনী। তাঁর দু'হাত হরিদ্রারঞ্জিত।
কামিনীকে দেখে ক্রকুণ্ডিত হয় তাঁর। সেদিনকার সন্ধ্যা বেলায় দৃষ্টটা মনে
পড়ে যায়। স্বামীর কাছেও গোপন রেখেছিলেন তিনি সে কথাটা।

: এই দেখ বোমা এসেছেন। অল্প ভালো হ'য়ে গেছে। আমাদের
ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন।

কামিনী বিন্দুবাসিনীকে প্রণাম করে। উবুড় হ'য়ে পড়ে পায়ের উপর।
বাবলুর কথাটা প্রথমেই প্রসন্ন করতে মন সরে না। বলে : ঠাকুরকি কোথায় ?

: নমু? সে বেরিয়ে গেছে। ক্যাকটারির মাঠে নাকি গুৰিণ এসেছে।
সেখানে গেছে।

: আর লতু?

: ভূষণদের বাড়ি গেছে নেমস্তন খেতে।

: আর, আর বাবলু?

: বাবলু?

: আমার বাবলু কোথায়?

: সে তো তুমিই জানো। সে তো তোমার ওখানে থাকে।

: আমার কাছে থাকে? কতদিন এ বাড়ি আসে নি সে?

: কোনদিনই আসেনি। বাবলু তো এখানে নেই।

নেই! বাবলু নেই! আৰ্তনাদ ক'রে কেদে ওঠে কামিনী! পা
ছ'খানা জড়িয়ে ধরে বিন্দুবাসিনীর। কি হ'ল? সবাই ছুটে আসে। প্রতি-
বেশীরাও। কামিনীকে তুলতে গিয়ে দেখে—সে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে।

সমস্ত শুনে শুরু হ'য়ে বসে ছিলেন হরিপদ মাস্টার। ঘরে এসে জমায়েত
হ'য়েছে প্রতিবেশীরা। নানা রকম যন্তব্য।

: খোঁড়ার পাই খানার পড়ে গো। আহা অন্ধ মানুষের কোলের ছেলেরা।

: ছুধের বাছারে ক্যান পাঠান বাপু চানাচুর বিক্রি করনের লগে?

হরিপদ পণ্ডিত শূন্ডের দিকে চেয়ে থাকেন। তাঁর চোয়ালসর্বস্ব গাল বেয়ে
ঝ'রে অঝোর ধারায় অশ্রু। বলেন: বাবলুকে তুমি পাঠাতে চানাচুর ফিরি
করতে? আমাদের বলনি কেন?

কামিনী মাথাটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বলে: আমি, আমিই মেরে
ফেলেছি বাবলুকে।

কে একজন তাড়াতাড়ি ওকে ধরে তুলতে যায়।

বিন্দুবাসিনী এসে ঝাঁপিয়ে পড়েন। উন্মাদিনীর মত চেহারা হয়েছে তাঁর।
কামিনীর কাঁধ ছুটো ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে বলেন: ভয়েছে? তোর অন্তর

পেট ভরেছে? রাকসি! তোর ছায়া ছেড়ে পালিয়ে এলাহ—তবু কেড়ে নিলি আমার ছেলেকে?

একজন এসে ছাড়িয়ে দেয় ওদের। কামিনী নির্দ্বীষের মতো পড়ে থাকে। প্রতিবাদ করে না। সেই যে মেরে ফেলেছে বাবলুকে!

আর একজন বলে: আরে চানাচুর বিক্রি করে তো কত ছেলে। এ যে আপনাদের বাবলুই তা আগে থেকে ধরে নিচ্ছেন কেন?

হরিপদ বলেন: আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাবা। এ বাবলুই। আর কেউ নয়। এ আমার পাপেই হয়েছে। আমার সতী লক্ষী মাকে আমি মিথ্যা মন্দেহ করেছিলাম। সেই পাপেই আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। ওঃ ভগবান!

ছেলেটি তবু বলে: ও সব বাজে কথা ছেড়ে দিন। চলুন আমার সঙ্গে হাসপাতালে। সেখানে নিজে দেখে যা হয় করুন।

পণ্ডিত বলেন: চলো, শেষকৃত্য তো আমাকেই করতে হবে।

কামিনী ওঠে: আমিও আসব বাবা?

: এস।

বিন্দুবাসিনী এতক্ষণে শয্যা নিয়েছেন। প্রতিবেশিনীরা তাঁর শুশ্রূষায় লেগেছেন। একজন খবর দিতে যায় নমিতাকে ফ্যাক্টোরির মাঠে। আর একজন যায় ভূষণদের বাড়ি থেকে লডুকে ডেকে আনতে। ছেলেটি বলে: এই রিক্সায় উঠুন। স্টেশনে দিয়ে আসবে।

হরিপদ বলেন: রিক্সা লাগবে না বাবা। আমরা হেঁটেই যাবো। ঐ তো স্টেশন। এটুকুর জন্ত আর রিক্সা চাই না।

রিক্সা-ওয়ালার ধমক দেয়: আরে চূপ করেন বুড়া কর্তা। ভাড়া ছাওন লাগব না আপনার। ওঠেন বোমারে লম্বা।

হরিপদ তবুও ইতস্তত করেন।

রিক্সা-ওয়ালার বলে: আরে পাগল হইছেন নাকি আপনে বুড়াকর্তা? অনিমেব রিক্সাআলার ভাই—আমি কি ভাড়া লইবার পারি?

হরিপদ পণ্ডিত কামিনীকে নিরে রিক্সার ওঠেন, প্রণ করেন : অনিষেধকে তুমি চেন বুঝি ।

: চিনি না, তব্ব সব রিক্সাখানাই তো সন্সার ভাই । মানেন তো সে কথা । আমার ঘরেও তো ভাই-বুইন আছে ।

রিক্সা চলল রাস্তা দিয়ে । এ রাস্তায় রিক্সা চালানো এখন কঠিন হয়ে উঠেছে । দশফুট চওড়া ক'রে এক বিঘৎ পরিমান মাটি কাটা হয়েছে । 'বক্স-কাটিং' না কি যেন বলে ওরা । কোথাও আবার তার উপর ইট বিছিয়েছে । সবচেয়ে মারাত্মক যেখানে সেই বিছান ইটের উপর ছড়িয়ে রেখেছে খোয়ার টুকরা । হু হু করে কাজ করছে লোকগুলো । সরল রাস্তাকে—রিক্সায়ালায় মতে—দুর্গম করে তুলছে প্রতিমুহূর্তে ।

কামিনী কাঁদছিল । নীরব অশ্রুপাত ।

পণ্ডিত ওর মাথায় ডান হাতখানা রাখেন । সে স্নেহস্পর্শে থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে কামিনী ।

: কেঁদে মনটা হাল্কা ক'রে নিচ্ছ বোমা ? কাঁদ । আমি তো জানি বাবলুকে শুধু গর্ভেই ধরেছিলেন তোমার শাস্ত্রী । ওঃ ! এভাবে আমাদের ফাঁকি দিয়ে গেল !

রিক্সায়ালা আবার ধমক দেয় : ওই, ওই, আবার ঐ কথা কইতে আছেন ?

: এই কথাই যে বলব বাবা সারাজীবন । এ আমারই পাপের ফল । সংসারের আয় নেই—অথচ বোমা বাজারের টাকা দিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই । সে অন্ন আমার গলা দিয়ে নামতো না । তারপর, তারপর সে রাতে—

কামিনী বলে : থাক বাবা ।

হরিপদও বলেন : থাক মা থাক । সে রাতের ভুল বোঝাবুঝির কথা আর বলব না আমি । কিন্তু তুমি কেন বললে না আমাকে ডেকে যে বাবলুর রোজগারে খাচ্ছিলাম আমরা ?

কামিনী চুপ করে থাকে ।

হরিপদ মাস্টার মাথা নেড়ে বলেন : না, আমারই ভুল হচ্ছে । তুমি বলতে চেয়েছিলে । আমিই ভুলতে চাইনি । না বোমা ?

কামিনী আঁতকপে বলে : ও কথা থাক বাবা ।

: থামতে তো আমিও চাইনি । কিন্তু পারছি কই ? আমার যে প্রতি-মূর্ত্তাই মনে হচ্ছে আমার সতীলক্ষ্মী মাকে মিথ্যা সন্দেহ ক'রে বাবলুকে মেরে ফেলেছি আমি । আমি সন্তান হত্যা করেছি !

কামিনী ব্যথাবিধুর কণ্ঠে বলে : না বাবা, আপনি নয় । ছরস্তু অভিমানে আমিই দূরে সরে গিয়েছিলাম । পাপ আমারই—

কথাটা শেষ হয় না, ডুগরে কেঁদে ওঠে আবার ।

রিক্সাআলা রিক্সা থামিয়ে নেমে পড়ে । বলে : করেন, আপনারা বিচার ক'রে রায় স্থান্ তারপর ফির চালাইবাম ।

হরিপদ বলেন : কি হল ?

: যে ছেলে মরে নাই—সে কার পাপে মরল স্থির করেন তারপর যাইবাম্ ।

হরিপদ বলেন : আচ্ছা বাবা আর কোনও কথা বলব না আমরা ।

আপন মনে গজগজ করতে করতে রিক্সাআলা প্যাঙলে বসে ।

থাওয়া নাওয়া সেরে ভূষণ এসে আবার শুয়ে পড়ে নিজের বিছানায় । 'ডি'রকের দিক থেকে একটা মিলিত কোলাহল ভেসে আসছে । গণ্ডগোল বেশী হচ্ছে মনে হয় । অনাহতই যাবে নাকি একবার ভূষণ ? সেও তো সমিতির একজন কার্যকরী সভ্য ? তারও তো একটা দায়িত্ব আছে । ঠাকুর্দা নেই, বাগচি সাহেব ছুটিতে । এত বড় দায়িত্বে নমিতার পাশে গিয়ে তার দাঁড়ানো উচিত । নাই বা ডাকলো নমিতা । বিপদের দিনে না ডাকতে যে পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সেই তো বন্ধু । এটা অভিমান করার সময় নয় । বিপদ কেটে গেলে যখন সকলে নমিতাকে অভিনন্দন জানাবে তখন অভিমান ক'রে সরে থাকার তবু মানে হয় ।

আবার ভাবে ভ্রূষণ—কিন্তু বিপদটা কি স্বখাত-সলিল নয়? নমিতা কেন যাচ্ছে ঐ গুপ্তগোলের মধ্যে মাথা গলাতে? যোগেন, কানাই অথবা সে যা বলেছে সেটাই তো ঠিক কথা। এ সোজা কথাটা বুঝছে না কেন নমিতা? ওদের জোর ক'রে উঠিয়ে না দিলে পরিকল্পনা কিছুতেই সার্থক হ'তে পারে না। কলোনীর যদি আর্থিক উন্নতি হ'তে থাকে, কলোনীবাসির এই উইটিপি-গুলিকে যদি এবারকার মত বাঁচানো যায় দুর্দৈবের আক্রমণ থেকে—তখন আরও লোককে আমরা স্থান দিতে পারব। বর্তমান বেকারদের যদি কর্ম-সংস্থান হয় তা হ'লে কলোনীর উন্নতি হবে। ফাঁকা প্রটোকলোয় আমরা ডেকে আনতে পারব ওদের। আর ওরা যদি সেই সূদিনের অপেক্ষা না ক'রে, আজই এখনই এসে আমাদের জীবনধারার পথ রোধ করে দাঁড়ায় তাহ'লে অতিথি নারায়ণদের কঠিনভাবে ফিরিয়ে দিতে হবে। এটা স্বার্থের কথা নয়, মুক্তির কথা। গোটা দেহটাকে বাঁচাতে যেমন পচনশীল একটা অঙ্গকে কেটে বাদ দেন সার্জন এ তেমনই। দেশের মুক্তি, জাতির মুক্তির জন্যে আপাত-নিষ্ঠুর আদেশ দেন সেনাপতি। রণাঙ্গনে একদল প্রাণ দিতে ছোট্টে,—আর একদল তার ফলভোগ করে উত্তরকালে। যুদ্ধ থেমে যায়, গৃহাগত সৈনিকদের তখন আবার ঠাই হয় গ্রামে নগরে। নেতাকে হ'তে হবে দূরদর্শী। তিনি শুধু বর্তমানের কথাই ভাববেন না। সেটিমেন্টের উর্ধ্ব উঠবেন তিনি। তাঁকে হ'তে হবে ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য জাহ্নবীর ভগীরথ! তাঁর দায়িত্ব অনেক। ঠাকুরদা সেটিমেন্টাল হ'তে পারেন. নমিতা তাঁর অন্ধ অহুসারী হ'তে পারে—তবু সমগ্র কলোনীর লোকে যা চাইছে তাই মঙ্গলের পথ। ভ্রূষণ যদি এখন গিয়ে দাঁড়ায়ও নমিতার পাশে সে কেমন ক'রে সাহায্য করবে তাকে? নৈতিক সমর্থন তো সে দিতে পারবে না।

এবং সেটা জানে বলেই তাকে নমিতা ডাকেনি—ভাবে ভ্রূষণ। ঐ মেরেটি ভালোভাবেই জানে যে ভ্রূষণ প্র্যাকটিকাল মানুষ। ছুভিকপীড়িত নিরুপায় নিরস্ত্র নবাগত লোকগুলোর প্রতি যতই সহানুভূতি থাক ভ্রূষণের—সমগ্র কলোনীর বৃহত্তর উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ওরা এখন বাধারূপে উপস্থিত। সমূলে ওদের

উৎপাটিত করতে ভূষণ কুণ্ঠিত হবে না। এখানে সে বিচারকে মতই অনগ্র,
বজ্রস্বকটিন। তার এ পরিচয় অস্বত নমিতা জানে। তাই সে ডাকে নি
ওকে।

হঠাৎ পায়ের কাছে একটা সুরসুরি লাগায় ভূষণ উঠে বসে। লক্ষ্য করে
লতু এসে ওর পায়ের কাছে নিবেদন করছে একটা সলজ্জ প্রণাম।

: একি? হঠাৎ কি হ'ল?

ওকে হাত ধরে তুলতে গিয়ে ভূষণ লক্ষ্য করল একটি জিনিস!

লতুর ছ'হাতে ছুটো মকর-মুখো বালা।

এটা চিনতে কষ্ট হয় না। এ বালা শৈশবে দেখেছে সে মায়ের হাতে।
এ বংশের মাদলিক অলঙ্কার!

: আমাকে আশীর্বাদ করলে না?

: আশীর্বাদ! ও, হ্যাঁ করলাম বই কি!

মিঠু একটু বেকায়দায় শুয়ে ছিল। লতু তাকে সরিয়ে ঠিক ক'রে শুইয়ে
দিল। মাথার নিচে বালিশটা টেনে দেয়। তারপর পানের বাটাটা এগিয়ে
দিল ভূষণের দিকে। লতুরও খাওয়া হ'য়ে গেছে। নিজে এক খিলি পান
তুলে নিল মুখে। একবার কৌতুকদীপ্ত চোখে ভূষণের দিকে তাকিয়ে বলে:
কী গোপন কথা বলবে বলছিলে তখন?

প্রশ্নটা করে মাটির দিকে তাকিয়েই।

ভূষণ জবাব দিতে পারে না।

হঠাৎ হেসে ফেলে লতু। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে: তুমি কী গো?
বিয়ে না হ'তেই গোপন কথা শোনাবে?

বলেই ছোটো দরজার দিকে।

ভূষণ ডাকে—লতু শোন।

তুলটা এখনই ভেঙ্গে দিতে চায়। এ কী অত্যাচার। এ মেয়েটা কেন
ধরে নিয়েছে যে ঐ এককোটা লতিকাসুন্দরীর জন্তে ভূষণের প্রেম একেবারে
উৎলে উঠেছে!

ঝারের কাছ থেকে লতু বলে : ঈস্। আমি তোমার বিয়ে করা
বৌ নাকি ? দুপুর বেলায় বন্ধ ঘরে ডাকছে যে আমার ? শুনব না আমি।

পিসীমা হঠাৎ বাইরে থেকে ডাকেন : ভূষণ !

: কি পিসী ?

: বন্ধুকের আওয়াজ না ?

তাই তো ! ছু ছুবার ফায়ার হ'ল ! পর পর। তারপর একটা মিলিত
কোলাহল ভেসে আসছে 'ডি'-রকের দিক থেকেই।

এক লাফে উঠে পড়ে ভূষণ ! পাঞ্জাবীটা তুলে নেয় আলনা থেকে। লতু
ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ওকে : না, আমি যেতে দেব না। ওখানে গুলি
চলছে।

: কী ছেলেমানুষী করছ লতু ? তোমার দিদি রয়েছে ওখানে।

: না নেই। তুমি যেও না। দিদি নিশ্চয়ই পালিয়ে আসবে।

: তোমার দিদি পালিয়ে যাবার মেয়ে নয় লতু। তোমার চেয়ে তাকে
বেশী চিনি আমি। ভয়টা আমার সে জ্ঞেই। ছাড় আমাকে।

জোর ক'রে লতুর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে ছুটে বেরিয়ে যায়।
পিসীমা পিছন থেকে ডাকেন : ভূষণ, শোন, বাস্‌নে !

: এখনই ফিরে আসছি আমি।

আগ্রাণ প্রচেষ্টাতেও দুর্দৈবকে নমিতা ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।
ঠাকুর্দা নেই, বাগচি সাহেব ছুটিতে,—যোগেন, কানাই প্রভৃতি প্রকাশে
বিরুদ্ধাচরণ করছে। ভূষণবাবু বিরোধী পক্ষের পাণ্ডা। সমস্ত কলোনিবাসী
চাইছে এই লোকগুলোকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে। এই ব্যাপারে, আশ্চর্য,
ভূষণবাবুর দল হাত মিলিয়েছে বিষ্টপদ গোকুল নবীনের সঙ্গেও। কলোনীর
কর্তৃপক্ষও ওদের সরিয়ে দেওয়াই মনস্থ করেছেন। বাগচি সাহেবের
অল্পপস্থিতিতে যতীশবাবু অকস্মিৎ করছেন। তিনি খবর পাঠিয়ে পুলিশ
ভ্যান আনিয়েছেন। মারামারি গণ্ডগোল হ'লে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করবে

ভারা। বিটুপদ নবীন বোগেন কানাই গোকুল হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। বেসরকারী লরি জোগাড় হয়েছে খান কয়েক। বিতরণপর্ব চলেছে নির্বিবাদে।

মুষ্টিমেয় অস্থচর নিরে ঠাকুরদার বৈঠকখানায় নমিতা গুম্বরে বসছিল আপন মনে। এদের স্থানান্তরিত করা উচিত কি অস্থচিত এটা সে ভেবে দেখেনি। সে যে নিতাই ঠাকুরদার আদেশ অস্থযায়ী কাজ করতে পারছে না এটাই তার ক্ষোভ। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ঠাকুরদার একটা গঠনমূলক পরিকল্পনা নিশ্চয়ই আছে। এ লোকগুলোকে তিনি কলোনীতে রাখতে চান। তার মানে এ নয় যে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাক। উন্নয়ন পরিকল্পনা যদি ব্যর্থতার পর্যবসিত হয় তবে সেটা নিতাই ঠাকুরদাকেই যে সবচেয়ে আঘাত করবে—এ বিষয়ে নমিতার তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু একা সে কি করতে পারে?

ঠিক এই সময়ে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন হেডমিস্ট্রেস সুরেশা দেবী।

: ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না নমিতা। আমাদের বাধা দিতে হবে। ঠাকুরদা যতক্ষণ না ফিরে আসছেন ততক্ষণ যাতে একটি লোকও স্থানত্যাগ না করে তা আমাদের দেখতে হবে। সরকার হয় আমরা পিকেটিং করব।

: আপনিও? কিন্তু আপনি যে সরকারী চাকুরে—

: বাজে তর্ক কর না। এস আমার সঙ্গে—

ওরা দুজনে গিয়ে দেখা করে ইঞ্জিনিয়ার বীরেন মৈত্রের সঙ্গে।

মৈত্রসাহেব বলেন: আপনারা দুজনে আর কি বাধা দেখেন? বাধা হ'লে দারোগা আপনাদের এ্যারেস্ট করবে। জনসাধারণ তো দূরের কথা গণকল্যান সমিতিও যখন আপনাদের পিছনে নেই, তখন, কিছু মনে করবেন না আপনারা—এটা নেহাৎই ছেলেমানুষি হবে।

ওরা দুজনে ফিরে আসে। কথাটা মিথ্যা নয়। তবু নমিতার ইচ্ছা নৈতিক আপত্তি জানাতেও ওদের দুজনের বাওয়া উচিত। যে লোকগুলি এখানে এসেছিল, যাদের জোর ক'রে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তারা

আজক, তারা বৃদ্ধক যে কলোনীতে অন্তত দুজন লোকও ছিল যারা চেয়েছিল তাদের স্থান দিতে।

হঠাৎ ছুটে আসে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক। ওদের সঙ্গে রয়েছে কানাই বাচ্চু, রাখাল। প্রমোদ বলে : নমিতাদি খবর শুনেছেন ?

: কি ?

: রিকুজিদের সরাবার জন্তে যে লরিগুলি এসেছে সেগুলো জংসন থেকে ভাড়া ক'রে এনেছে বিটুপদ আর গোকুল। একলরি লোক পাঠান হ'য়ে গেছে। ওরা দাঁড়িয়ে থেকে লোক বোঝাই করাচ্ছে।

সুরেখা দেবী বলেন : এ খবরে তো আপনাদের উল্লসিত হওয়ার কথা প্রমোদবাবু। আপনারাই তো চাইছিলেন ওদের পত্রপাঠ বিদায় করতে।

রাখাল বলে : কিন্তু ভেতরে যে এই ষড়যন্ত্র চলছে তা জানব কি ক'রে ?

: ষড়যন্ত্র ?

কানাই বলে : আসল কথাটা খুলে বল। ওঁরা বোধ হয় এখনও কিছু জানেন না।

প্রমোদ পাল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে।

রাস্তার কাজে জনা কুড়িক গ্রুপ কাজ করছিল এতদিন। এবার বড় তিনটে কাজের স্কাংসান এসে যাওয়ায় মৈত্রসাহেব নতুন গ্রুপলীডারের নাম চেয়ে পাঠান বাগচি সাহেবের অফিসে। অর্থাৎ যে কাজ কোয়্যাপারেটিভের মাধ্যমে করাতে চেয়েছিলেন নিতাইপদ। ইতিমধ্যে বাগচি সাহেব ছুটিতে যাওয়ায় যতীশবাবু পত্রের উত্তর দেন মৈত্রকে। তিনি তিনটি কাজের জন্য তিনটি নাম পাঠিয়েছেন। তাদের আর্থিক সঙ্গতির উল্লেখও করেছেন। মৈত্র উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী ক্যাম্প অফিসের নির্বাচিত গ্রুপলীডার তিনজনকে তিনটি কাজ দিতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রডাকসন সেন্টার বানাবেন শ্রীবিটুপদ মজুমদার, ক্যাকটারিটা তৈরী করবেন শ্রীগোকুলদাস ;—আর ইটগোলার কন্ট্রাক্ট শ্রীনবীন পতিভূগির !

আপাদমস্তক জলে গুঠে নমিতার। সে আবার ফিরে যায় বীরেনবাবুর

অকিসে। তাঁকে বুঝিয়ে বলতে চায় সব কথা। বীরেনবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন : একজন কাজ পেলেই অন্য একজন বলে অন্তায় করা হয়েছে। আপনারা যদি কেউ পেতেন—ওরাও এসে বলত অন্তায় হয়েছে। আমি ইঞ্জিনিয়ার, কাজ করতে এসেছি। আপনাদের দলাদলির মধ্যে আমি নেই।

নমিতা বলে : কিন্তু ঐ বিষ্টপদ, নবীন আর গোকুলবাবু কি বেকার ? না অস্বাভাব্যে ওদের পরিবার না খেতে পেয়ে মরছে ?

মৈত্র বলে : আপনি খামকা রাগ করছেন মিস্ চক্রবর্তী। আমি রিলিফ ডিপার্টমেন্টের লোক নই। আমার কাছে নবীন প্রাচীন, কেউ-বিষ্ট সব সমান। কে অর্থবান আর কে বেকার তার আমি কি জানি ?

: তা হ'লে কিছু না জেনে কাজ ডিস্ট্রিবিউট করলেন কেন ? আপনি জানেন না, কিন্তু আমরা তো জানি। আপনার উচিত ছিল আমাদের জিজ্ঞাসা করা।

: আমার কি উচিত ছিল তা আপনার সঙ্গে আলোচনা না করলেও চলবে। গণকল্যাণ আর গণনাশন সমিতিতে আমার চেনার কথা নয়। আমি এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অফিস থেকে নাম পেয়ে কাজ দিয়েছি।

: আমি কি তাহ'লে ধরে নেব—এ বড়যন্ত্রে আপনিও লিপ্ত আছেন ?

বীরেন মৈত্র পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে একবার তাকিয়ে বলেন : বড়যন্ত্রটা আপনি কোথায় দেখলেন জানি না ; কিন্তু সে যাই হ'ক, কোনও কাজের কথা যদি আপনাদের বলার না থাকে তাহ'লে আসতে পারেন। আমার ইন্ট্রিটি সম্বন্ধে আমারই ভিজিটাস চেয়ারে বসে একটি মহিলার সঙ্গে আমি আলোচনা করব—এটা আপনি একটু বেশী আশা করছেন মিস্ চক্রবর্তী।

: বেশ আমরা চলে যাচ্ছি। কিন্তু এর কল ভাল হবে না মিস্টার মৈত্র।

বীরেনবাবু একটু হাসলেন : কলোনির কাজে দলাদলি থাকবেই। এটা জেনেই আমি কাজে নেমেছি। দলাদলি করুন—ওটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ কিন্তু একটা জিনিস আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন আপনারা ? যারা কাজ পেয়েছে হ'তে পারে তারা আপনাদের বিপক্ষ শিবিরের লোক ; কিন্তু ওরাও এমন কিছু বড়লোক নয়। ওরাও কলোনিবাসী। ওরা কাজ

ক'রে যদি পেয়েমেন্ট পার তবে সে-টাকা কলোনীতেই থাকবে। এত আপত্তিই বা কিসের ?

: কেন আপত্তি শুনবেন ? দুদিন পরে আমরা বলতে আসব পাঁচজন কাজ করছে আর পঁচিশজনের হিসাব দেওয়া হচ্ছে। কলোনীর বাইরে থেকে অল্পমজুরীর মিস্ত্রি মজুর এনে কাজ করানো হচ্ছে অথচ হিসাবে দেখানো হচ্ছে কলোনীর লোকের নাম। ভুল হিসাব দাখিল করে, সেই জাল করে ওরা তিনজনে টাকা আত্মসাৎ করছেন। আপনারা তদন্ত করতে আসবেন। আমরা পাঁচজন সাক্ষী হাজির করলে ওঁরা দশজন ভাড়া করা সাক্ষী হাজির করবেন। আমাদের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে। আপনারা ফলাও ক'রে খবরের কাগজে ছাপবেন—উদয়নগর কলোনীতে এত লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে, এত হাজার লোক কর্মসংস্থান করেছে—অথচ কলোনীর সত্যিকারের অর্থহীনেরা অনশনে মরতেই থাকবে। বেকার আত্মহত্যা করবে। ক্ষীণ হবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। এ আমরা আগেও হ'তে দেখেছি—এবারও দেখব !

বীরেনবাবু বলেন : বেশ তো, সে রকম অন্তায় যদি হ'তে দেখেন তাহ'লে অভিযোগ জানাবেন। বিচারের গ্রহসন হবে এটাই বা ধরে নিচ্ছেন কেন ?

: এই তো অভিযোগ করছি। যতীশবাবু যে তিনজন লোকের নাম আপনার কাছে দিয়েছেন ওঁরা ছিলেন আগেকার কমিটির লোক—নানান অভিযোগ আছে আমাদের—ওঁদের বিরুদ্ধে। আপনি নতুন লোক তাই আমাদের এতকথা কিছুই জানেন না।

: অর্থাৎ আপনার মতে—একমাত্র গণকল্যাণ সমিতিই সততার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন। রিলিফ অফিস আর ইঞ্জিনিয়ারের অফিসের সবাই চোর—তার সৎ লোকের বিরুদ্ধে শুধু ষড়যন্ত্রই করছে,—কেমন ? কিন্তু বলতে পারেন এতে আমাদের স্বার্থটা কি ?

: খুব পারি। যতীশবাবুরা চায় না যে আমরা নিজেদের পারে দাঁড়াতে শিখি। ক্যাস্-ডোল আর স্টারভেসন্ ডোলের ডামাডোলে তাদের স্বযোগ-

স্ববিধা বেশী। উদ্ভাসদের সত্যিকারের পুনর্বসতি হ'লে তাঁদের চাকরিই থাকবে না—চোরাই কারবার চালানো তো দূরের কথা। আর আপনারা? আপনারা পরস-ওয়ারা বড় লোক ঠিকাদার দিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত। তাতে আপনাদের কি কি স্ববিধা হয় সে কথা একান্তে না বলাই ভালো—তবে কারণটা আপনি জানেন আমাদেরও বুঝতে কিছু বাকি নেই মিটার মৈত্র!

মৈত্র সাহেব কি একটা জবাব দিতে যান, কিন্তু তার আগেই হঠাৎ কানাই ঘরে ঢুকে বলে : নমিতাদি শীগ্গির আসুন। ওখানে বোধহয় গুণগোল বেধেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।

পর পর ছবার।

ওরা ছুটে বেরিয়ে এল। কে একজন বলে : নমিতাদি আপনি এখনই বাড়ি চলে যান। আপনার মা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। বাড়িতে ডাকছে।

নমিতা একটু থেমে পড়ে। বিশ্বাস করতে পারে না কথাটা। খামোখা বিন্দুবাসিনীর অজ্ঞান হয়ে পড়ার কোনও কারণ নেই। এখানে গুলি চলছে বলে বোধহয় ওকে বাড়ি ফিরিয়ে নেবার কৌশল করেছেন।

ছেলেটিকে বলে : তুমি বাড়ি যাও ভাই। মাকে একটু দেখ। আমি এখনই আসছি।

কানাই এগিয়ে গিয়েছিল, বলে : কি হ'ল নমিতাদি? বাড়িয়ে পড়লেন কেন? আসুন শীগ্গির।

: এই যে আসছি।

হু'ব্যাচ লোককে জোর ক'রে লরিতে চাপিয়ে পাঠানো হয়েছে পি. এল. ক্যাম্পের উদ্দেশে। লোকগুলো প্রতিবাদ করবার ভরসা পায়নি। সুনির্ভর পরা বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে স্বয়ং দারোগা সাহেব উপস্থিত। তাছাড়া এই কলোনীর একজন লোকও চায় না ওদের এখানে রাখতে। কি আর করা যায়? ওরা বিনা প্রতিবাদে গাড়িতে ওঠে। বাবে, পি. এল.

ক্যাম্পেই যাবে ওরা। তৃতীয় ট্রিপ লোক বোঝাই দেবার সময় বাধলো গুপ্তগোল।

ইতিমধ্যে খবর রটে গিয়েছিল কাজ পেয়েছে বিটুপদ, গোকুল আর পতিভূক্তির দল। তাই ওদের এত উৎসাহ। সে জন্যেই এ লোকগুলিকে কুকুর বেড়ালের মত গাড়ি বোঝাই ক'রে পাঠান হচ্ছে তাড়াতাড়ি। না হ'লে কাজ শুরু করতে পারছে না ওরা।

মুখে মুখে রটে গেল কথাটা। গণকল্যাণ সমিতির চেলেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করেছে। বেকার যুবকেরা নাম লিখিয়েছে। আশা করেছিল স্বাভাবিক ভাবে কাজ শুরু হ'লে তাদের ডাক পড়বে। নিতাই ঠাকুরদার দলের অধীনে কাজ করলে আর যাই হোক সুবিচার পাবে। মজুদী করে হাজিরাও পাবে। হঠাৎ এ খবরটার ওদের সে আশা যেন নিমূল হ'ল। এ কী অত্যাচার! যে লোকগুলো চুরি জুয়াচুরি ক'রে এতদিন সর্বনাশ ক'রে এসেছে কলোনীর তারাই আবার কাজ পাবে?

: দেব না ওদের কাজ করতে।

: বন্ধ থাক কাজ। যতদিন না ঠাকুরদা ফেরে, বাগচিসাহেব জয়েন করে।

একদল উৎসাহী যুবক গিয়ে চড়াও হ'ল এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অফিসে। ঘেরাও করল অফিস। উত্তেজিত জনতা মারমুখী হয়ে উঠেছে।

: কই মশাই গ্রুপ-লীডার রেকয়েণ্ড করনেওয়াল—একটু বেরিয়ে আসুন তো।

যতীশবাবু জানাল দিয়ে একবার উকি মেবেই ব্যাপারটা অনুধাবন ক'রে নেন। চট ক'রে বাধকমে ঢুকে পড়েন এবং ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দেন।

: যতীশবাবুকে ডেকে দেন না মশাই। ঘরের বাইরে আসুন উনি। আমরা দেখা করতে চাই।

যতীশবাবু ততক্ষণে বাধকমের ওদিককার দার খুলে বেরিয়ে গেছেন। মৃণাল আর মিহির বেরিয়ে আসে।

: কেন আমেলা করছেন অফিসের সামনে? কি চাই আপনাদের?

: সতীশবাবুকে চাই।

সতীশবাবুকে পাওয়া গেল না অফিসে।

একদল গেল তাঁর বাড়ির দিকে। একদল গেল স্টেশনে।

মৃণাল মিহিরকে বলে : ঘেঁষা ধরে গেল ভাই। বিষে যদি না করতাম—
তোমায় বলছি মিহির, চাকরির মাথায় লাথি মেরে বাড়ি চলে যেতাম।

মিহির বলে—সেটা তো কঠিন নয়। এর ভেতর থেকে যদি সততার সঙ্গে
কাজ করতে পার, তবেই না ক্ষমতা। কর্তাতো ভেগেছেন। একবার যাবে
নাকি ক্যাকটারির মাঠে ?

মৃণাল ইতস্তত করছিল। হঠাৎ ঐ দিক থেকে বন্দুকের আগ্নেয় ভেসে
আসায় উঠে পড়ে। দুজনে বেরিয়ে আসে অফিস থেকে।

জনতা চলেছে ক্যাকটারির মাঠে। অর্ধদণ্ড আগে যারা বলছিল—‘হাঠাও
বধেড়া, তাড়াও ঐ নতুন লোকগুলোকে’, তারাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তাঁটার
টানের মুখে হঠাৎ এসে পড়েছে কোর্টালের বান।

একদল উৎসাহী বেকার যুবক এসে সমবেত হ’ল ময়দানে। সেখানে
পূর্বেই উপস্থিত ছিল যোগেন তার কয়েকটি অমুচর নিয়ে। নিরঙ্ক আক্রোশে
ফুলছিল যোগেন। ঠাকুর্দা নেই। ভূষণ বিপদের সময় সরে দাঁড়ালো !
কলোনীকে নেতৃত্ব দেবার একটা লোক নেই এই অসময়ে। দলটা এসে
যোগেনের কাছেই স্থবিচার দাবী করল। এ অত্যাচার হ’তে দেব না !
যোগেন মুহূর্তে এগিয়ে এল নেতৃত্ব দিতে। সে নিজেই ভুলে দলপতির ঝাণ্ডা !
সতীশের চাবের দোকান থেকে একখানা টিনের চেয়ার টেনে এনে তার উপর
দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিল—

: বন্ধুগণ—

মিনিট কয়েক পরে ওদের দলটা এসে পৌছালো যেখানে মানুষগুলোকে
লরিতে বোঝাই দেওয়া হচ্ছে সেখানে। ইতিমধ্যে লোকসংখ্যা আরও বেড়েছে
ওদের দলে। বেড়েছে উদ্দীপনা আর অসন্তোষ। মানব না এ অত্যাচার !

ওরা বাধা দিল।

দারোগাবাবু এসে ওদের সতর্ক করে দিলেন। সরকারী কাজে বাধা দিলে তিনি বাধা হয়ে এ্যারেস্ট করবেন এদের।

যোগেন জবাবে শুধু বললে ‘—ইনক্লাব—!’

পাদপুরণটা জানা আছে সকলের। ধনিত হ’ল সেটা।

ওরা ঘিরে দাঁড়ালো লরিখানাকে

: দেব না ওদের সরিয়ে নিতে।

দারোগা জনতাকে বে-আইনি ঘোষণা করলেন। চলে যেতে বললেন।

ওরা জবাবে একই কথা বলে আবার ‘—ইনক্লাব!’

দারোগা মশস্ত্র পুলিশদের কি ঘেন ছকুম দিলেন।

বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। পর পর ছুবার।

বন্দুকের মুখ উষ্ম আকাশের দিকে! আঘাত করা ইচ্ছা নয়। এ বোধহয় একটা চরমতম সাবধান বাণী। অর্থাৎ প্রয়োজন হ’লে বন্দুকও চালান হ’বে।

বিষ্টপদ দারোগাবাবুর কানের কাছে এসে বলে: লাঠি চার্জ করেন ছার। আর ঐ হাল জগারে এ্যারেস্ট করেন।

দারোগা একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন: আপনি কে মশাই? বেশী বাজে কথা বলবেন না—চালান দেব আপনাকেই।

বিষ্টপদ ঘাবড়ে যায়। এ বেটা তাঁকে চেনে না নাকি।

লোকগুলো ফাঁকা আওয়াজে ভয় পায় না।

নিরুপায় উদ্বাস্তগুলোও সাহস পেয়ে ফিরে দাঁড়ায়। যাদের ওঠানো হয়েছিল গাড়িতে তাদের কয়েকজন ফের ঝুপঝাপ করে নেমে পড়ে। বিষ্টপদের দলের কয়েকজন ছুটে গিয়ে পাকড়াও করে ওদের।

যোগেনদের দলের কয়েকজন গিয়ে বাধা দেয়। ফলে হাতা হাতি স্ক্রু হয়ে যায়।

নমিতারা পৌছে গেল ঠিক সেই মুহূর্তেই।

দারোগা ছইসিল বাজালেন। সব কটি পুলিশ একত্র হল নিমেষে।

বিষ্টপদ, গোকুল জানত এ জাতীয় ব্যাপার ঘটতে পারে। সব রকম

বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিল ওরা। বেশ কয়েকঝুড়ি ঝামা খোয়া গাদা ক'রে রেখেছিল এক কোণে। ঠিকাদারী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকলেও আদলা-ঝামা-ব্যাটের এ উপকারিতাটা অজ্ঞাত ছিল না।

এক ঝাঁক টিল এসে পড়ল কোথা থেকে।

কানাই আহত হ'ল, দারোগা সাহেবের কপালে এসে লাগলো একটা। বাঁ হাত দিয়ে কতহান চেপে ধরে বসে পড়লেন তিনি।

একজন সাব ইন্সপেক্টর এসে তাঁকে ধরতেই পুনরায় উঠে দাঁড়ালেন। কতহান দিয়ে রক্ত পড়ছে থাকি সার্টের উপর।

লাঠি চার্জ করবার হুকুম দিলেন তিনি। বে-আইনি জন সমাবেশ ভেঙ্গে দিতে বলেন।

ওদিকে যষ্টিবর্ষণ তার আগেই শুরু হয়ে গেছে। বিষ্টপদর ভাড়াটে গুণ্ডার দল এলোপাতাড়ি মারতে শুরু ক'রে দিয়েছে যোগেন নায়েকের দলটাকে। এরা নিরস্ত্র এসেছিল বস্ত্রত মার খেয়ে পেছুতে লাগলো।

পুলিশের এক ঝাঁক লাঠি পড়ল।

ছুটে পালাচ্ছে সবাই। কঙ্কালসার উদ্বাস্তগুলো এর জন্তে প্রস্তুত ছিল না মোটেই। বুড়োবাচ্ছা সামলে দাপাদাপি করছে সারা মাঠ ময়। যোগেনের কাঁধে লাগলো একটা লাঠি! পড়লো সে ঘুরে।

পুলিশের লাঠি নয়। বিষ্টপদর ভাড়া করা একটা লোক।

আবার উঠল লাঠি। সামনে একজন বৃদ্ধা উদ্বাস্ত!

ছু হাত উর্ধ্বে উৎক্লিষ্ট ক'রে চীৎকার করে উঠল সে ভয়ে। গগন বিদীর্ণ-করা সে আর্তনাদে নমিতা আত্মহারা হয়ে পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই যষ্টিবর্ষণের মধ্যে। ঠেলে কেলে দিল বৃদ্ধাকে সবলে। বেঁচে গেল বুড়িটা।

লাঠিখানা সজোরে নামলো নমিতার মাথায়! খোঁপা সমেত মাথার পিছন দিকটা নেমে এল।

নমিতা পড়লো মাটিতে।

যোগেনের পাশেই!

হরিপদমাস্টার মশাই যখন গিয়ে পৌঁছলেন জংসনের হাসপাতালে তখন মৃতদেহকে দাহ করবার জন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কলোনীর রিকসাখানা কিন্তু সঙ্গে এসেছে। একা ছেড়ে দেয়নি অঙ্ককে পুত্রবধূর সঙ্গে। শুধু কোতূহল নয়—কর্তব্য বলেই মনে করেছে সঙ্গে আসাটা। রিকসাখানা রেখে এসেছে উদয়নগর স্টেশনে একজন জানা লোকের জিহ্বায়। মৃত ছেলেটিকে সনাক্ত করা হয়েছে। তার তিনকূলে কেউ নেই। আছে এক বুড়ো কাকা। এসেছেন তিনি। উদয়নগর কলোনীরই একজন বাসিন্দা। মৃতদেহকে বয়ে নিয়ে আসছে মর্টন, হাতকাটাতেল, তানসেনগুলি প্রভৃতি। বাবলুও এসেছে। বৌদিকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল না। সজল চোখ দুটি তুলে বললে : মশলামুড়ি কাটা পড়েছে বৌদি।

কামিনী ওকে টেনে নেয় নিজের কোলে। হরিপদ মাস্টার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন একটা। বাবলুর সর্বাঙ্গে ধুলো, বালি ময়লা। চিম্টি দিলে ময়লা উঠে আসে। খালি গা। প্যান্টটা এককালে থাকি ছিল এখন চেনা যায় না এতো কালো। কক্ষ চুল, শুকনো মুখ।

কামিনী বলে : তুই আজকাল চানাচুর বিক্রি করিস না ?

: না, কে ভেজে দেবে ?

: তবে কি করিস আজকাল ? বাড়িতে থাকিস না যে ?

: কয়লা বাছি।

উন্মোগী সিংহশাবক বাবলু। ‘বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী’ মন্ত্র তার। যে বয়সে ওর বাপ দাদারা অঙ্ক ইংরাজি শিখেছে—সে বয়সেই ওকে শিখতে হয়েছে উপার্জন। বিনা মূলধনের ব্যবসায় এ বাজারে প্রায় অসম্ভব ; কিন্তু অসম্ভবকে জয় করতেই ওর তারুণ্যের অভিধান। খুঁজে খুঁজে তেমনি একটা ব্যবসা বার করেছে সে। জংসন স্টেশনের ইয়ার্ডে গিয়ে ইঞ্জিনের রাবিস্ থেকে বেছে বেছে পোড়া কয়লা উদ্ধার করে। পোড়া ছাইয়ের স্তুপ থেকে

কমলার টুকরা খুঁজে বার করা আর হীরকখনিতে কমলার
 স্তূপ থেকে হীরকখণ্ড বেছে বার করার মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। অস্তুত
 পরিভ্রমের দিক থেকে, ধৈর্যের যাপনকাঠিতে, অধ্যবসায়ের নিক্তিতে। তারপর
 বুড়ি ক'রে বেচে দিয়ে আসে বাজারের দোকানে। বৌদি যদি চানাচুর নাই
 ভেজে দেয়—তাই বলে কি হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে হবে? বাবা
 মাকে মাফুস করার দায়িত্ব আছে না? দাদার অস্থখ সারিয়ে তুলতে হবে
 না? ওর বলবার ভঙ্গি দেখে এত দুঃখেও হাসে কামিনী। বলে : থাকিস
 কোথায়? খাস্ কি?

: থাকি ঐ ইয়ার্ডেই। খাই বা পাই। কত টাকা জমেছে জানো?
 আঠারো টাকা! পঞ্চাশ টাকা জমলেই আমি ফিরে যাবো কলোনীতে।
 তখন আর আলাদা থাকতে হবে না বাবা মাকে। সেখানে দোকান খুলব
 আমি।

হরিপদ মাস্টার হঠাৎ টেনে নেন বাবলুকে! ধূলাবালি মাখা ছেলেটাকে
 বুকের ভিতর টেনে নিয়ে শিরশ্চূষন করেন পণ্ডিত। বাবলুর সম্বন্ধে অনেক
 ভুল ধারণা ছিল তাঁর। তিরস্কার করেছেন, মেরেছেন, শাসন করেছেন এই
 ঘরপালানো ছেলেটিকে। সংসারের কোনও কাজ করে না, পড়াশুনায় মন নেই
 এ জন্ত মনে মনে ক্রোধের অস্ত ছিল না। কিন্তু আজ একলব্যের মতো একক
 সাধনরত শিশুটির অস্ত এক রূপ ফুটে উঠেছে অন্ধের দৃষ্টি-সম্মুখে।
 কমলার গুড়ায় মলিন তার সর্বাঙ্গ কিন্তু তার সাধনা, তার তপস্বী একনিষ্ঠ,
 অমলিন!

মর্টনদা ওকে ডাকে : বাবলু যাবি না?

বাবলু বলে : বাই বৌদি, বাই বাবা? মশলারুড়িকে দাহ ক'রে
 আসি?

কামিনী বলে : এস বাই। কিন্তু ওখান থেকে সোজা বাড়ি যাবে।
 বাড়িতে থেকেই ব্যবসা করতে হবে তোমাকে।

বাবলু ঘাড়-নেড়ে চলে যায়।

ওরা এগিয়ে যায় ওদের এক প্রিয় বন্ধুর শেখরত্যা করতে। কিশোর বন্ধুটির সঙ্গে ওরা ফেরি করতে। নানান সওদা ভেলি প্যাসেঞ্জার ভর্তি রেলের কামরায়। বাঁ বাঁ রোদ্দুরে যাতায়াত করত এ ঘর থেকে ওঘরে—রক্ত ধরে ধরে। একসঙ্গে খেত বিড়ি—গাইত সস্তা গিনেয়া সঙ্গীত। সমব্যবসায়ীই শুধু নয়—জীবনের যাত্রাপথে ওরা সহযাত্রী, ঐ মশলামুড়ি হাতকাটাতেল মটন আর বাবলু। জীবন যুদ্ধের রণাঙ্গনে সংগ্রামরত বালসেনা! কমরেডস্!

হরিপদ মাস্টার তখন অল্প কথা ভাবছেন। হারানো ছোট ছেলেটিকে পেয়েই মন গিয়েছে বড়ছেলেটির দিকে। একবার দেখা হয় না? ঐ তো ঐ ওয়ার্ডে আছে অনিমেব। যাকে বাঁচিয়ে তুলছে তাঁর বোমা ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। সীমন্তিনীর একনিষ্ঠ সেবায় ফিরিয়ে এনেছে মৃতকল্প স্বামীকে—মৃত্যুর ঘার থেকে।

ক্যাম্পের রিকসায়াল ভেবেছিল বুড়াকর্ত। যদি ছেলে ফিরে পায়—তবে সে একটা দাবী জানাবে। না ভাড়া নয়—একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দেবার দাবী। সে কথা কিন্তু সে বলতে পারল না। ঐ এককোঁটা ছেলেটার বিখণ্ডিত দেহ, ঐ হরিশ্বনি, এ সবে তার মনটাও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। বাবলুকে সে চেনে না—তবু বাবলু বেঁচে থাক এটাই সে মনে মনে প্রার্থনা করতে করতে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে বাবলু বেঁচেছে বটে, কিন্তু মশলামুড়ি মারা গেছে। না, মশলামুড়িকেও সে চেনে না। মশলামুড়ির বংশে কেউ রিকসায়াল আছে বলেও জানা নেই তার। তবু রিফুজি তো? সব রিফুজিই তো সন্সার ভাই, না কি কও? যুক্তিটা ওর এই জাতীয়। বলে: আয়েন বুড়াকর্তা, লয়্যা যাই।

ফেরা কিন্তু হয় না তাঁদের।

এ্যাঙ্কুলেসখানা এসে পৌছায়! পিছন পিছন একখানা জীপ। জীপ থেকে নামেন ঠাকুরদা আর কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার। এ্যাঙ্কুলেস থেকে নামানো হ'ল নমিতা আর যোগেনকে। এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হ'ল ওদের।

ঠাকুর্দা এসে হরিপদ পণ্ডিতের হাতখানা চেপে ধরেন।

তিনি এসে পৌঁচেছেন ক'লকাতা থেকে। সোজা জীপে করে এসেছেন। সঙ্গে এসেছেন ক'লকাতা থেকে কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার। বাগচি সাহেবও ছুটি সঙ্গেও থবর পেয়ে এসেছেন।

মারামারি গুণগোল সব খেমে গেছে।

নতুন উদ্যোগ। যাতে আর উদয়-নগরে না আসতে পারে সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে, শেয়ালদা স্টেশন থেকে ওদের অন্তত সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যারা এসে পড়েছে ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে বেছে বেছে কৰ্মঠ লোকের পুনর্বসতি দেওয়া হবে এখানেই। বাকি লোক ফিরে যাবে ক্যাম্পে। সবই স্থল ভাবে মিটে গেছে। পরিকল্পনার কাজ কাল থেকে পূর্ণোন্মমে চালু হবে। নিতাইপদ লীডার বাছাই করা বিষয়ে কোয়পারেটিভ গড়ার প্রস্তাবটাও দাখিল করেছিলেন। বাগচি সাহেবও পূর্ণ সম্পত্তি জানান এ ব্যবস্থায়। বস্তত কোয়পারেটিভ ক'রে কাজ বিতরণ না করলে কিছুতেই স্থল ব্যবস্থা হ'তে পারে না। বেকার নিঃস্বকে গ্রুপ লীডার করলে তারা কাজ করতে পারে না অর্থাভাবে। গোপনে তারা মহাজনের পক্ষপুটে আশ্রয় খোজে। এদিকে বিনা জামানতে, কাজ করার আগে দাদন দেওয়াও সম্ভব নয় সরকারী আইনে। যতীশবাবু চেয়েছিলেন এমন কিছু গ্রুপ-লীডার বেছে নিতে যারা প্রথম পর্যায়ে অর্থ বিনিয়োগ করবার ক্ষমতা রাখে। তাই তিনি বিটুপদ, গোকুল আর পতিভূণ্ডির নাম রেকমণ্ড করেছিলেন। বাগচি সাহেব তাতে রাজী নন। ক'লকাতা থেকে যে কজন অফিসার এসেছিলেন তাঁরাও চান না তেলমাখার তেল ঢালতে। সুতরাং নিতাইপদের প্রস্তাবই গ্রহণ করেছেন সকলে। কাজ দেওয়া হবে কোয়পারেটিভকে—ব্যক্তিগত মুনাকার অবলুপ্তি ঘটল! সমষ্টির লাভ লোকসান বুঝে নেবে শেয়ার হোল্ডাররা। কোয়পারেটিভ ডিপার্টমেন্টের একজন উচ্চপদস্থ মাস্তাজী অফিসারও এসেছিলেন ওদের সঙ্গে। অবিলম্বে কি ক'রে একটা সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় তা তিনি সরজমিনে দেখতে এসেছেন।

বিষ্টপদ-গোকুল-নবীন পতিভূক্তির শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। তাঁদের বড় মুক্কা স্বয়ং যতীশ বাবুই এখন হালে পানি পাচ্ছেন না! তখন তাঁদের আর আশা কোথায়? স্তূতরাং ওঁরা সরে দাঁড়ালেন। খিড়কির দরজা দিয়ে পুনঃপ্রবেশেরও আর পথ রইল না। ওঁদের হিতাকাঙ্ক্ষী যতীশবাবুই এখন সে পথ দিয়ে প্রস্থান করতে পারলে বাঁচেন। বদলি হ'লেই খুশী হন তিনি, কিন্তু ভাবে মনে হয় টিনের হিসাবটা না মিটানো পর্যন্ত বদলির কোনও আশা নেই।

সবই মিটে গেছে, —সবই স্ঠু ভাবে মিটিয়ে এনেছেন নিতাইপদ। এবার এই ছন্নছাড়া জীবন্তলোকে নিয়ে নতুন পৃথিবী সৃজন করবেন ওঁরা। বঙ্গীকধর্মী মানুষগুলো শুধু বাড়ি করেই কাস্ত হবে না—ওরা গড়ে তুলবে নতুন সমাজ ব্যবস্থা। পশ্চিম বাংলার আর পাঁচটা জরাজীর্ণ গ্রামে যা সম্ভব হয়নি—হবে না, তাই সফল করে তুলবে ওরা। ওদের কলোনীতে নেই প'ড়ো ভাঙ্গা মন্দির আর মজা পানাপুকুর। সমাজপতির অর্কফলার আন্দোলনকে ওরা ভয় করে না। কালো স্নেটে নতুন ক'রে পড়বে ওদের লেখা—নতুন পরিবেশে—মাঠের মাঝে গড়ে ওটা এই গ্রাম নগরীতে। গ্রাম্যসমাজ জীবনের দোষ জুটি সম্বন্ধে ওরা সচেতন—সেগুলি প্রথম থেকেই পরিহার করে চলবে। নিতাইপদ নবীন উৎসাহ নিয়ে তাই ফিরে এসেছেন বাগচি সাহেবকে সঙ্গে ক'রে ক'লকাতা থেকে।

কিন্তু যদি কয়েকঘণ্টা আগেও এসে পৌছাতে পারতেন—তাহ'লে এ শুভকাজের সূচনায় রক্তপাতটা নিবারণ করা যেত।

পরের দিন প্রভাত।

জংসন হাসপাতালের সামনে একটা বিরাট জনতা।

মর্গ থেকে জনা চারেক লোক বার ক'রে আনল নমিতাকে।

হাসপাতালের প্রাঙ্গণটা ভরে গেছে লোকে। তিল ধারণের স্থান নেই। রাত্রি থাকতেই লোক আসছে। ফার্স্ট লোকালেই এসেছে অসংখ্য লোক।

কলোনীর বাসিন্দা। সমস্ত উদয়-নগর কলোনী বুঝি সমবেত হয়েছে ওদের একটি মেয়েকে শেষ সম্মান জানাতে। এসেছে প্রমোদ, কানাই, রাধান, ব্যাণ্ডেজ বাধা যোগেন। দাঁড়িয়ে আছে বাবলু। সন্ত ফিরেছে সে শ্মশান থেকে। প্রিয়বন্ধুর শেষকৃত্য ক'রে ফিরে এসেই শুনেছে এই দুঃসংবাদ। মর্টন আর হাতকাটা তেল ধরে আছে ওর দু হাত। চোখ দুটো জ্বাকুলের মতো লাল। শ্মশান বৈরাগ্য তার ছোট্ট দেহখানিতে মাখা। কাঁদছে না আর। অশ্রুর উৎস তার শুকিয়ে গেছে। গাঙ্গনের ক্ষুদে সন্ন্যাসী যেন একটা। জনতা নির্বাক!

নমিতাকে নামানো হ'ল হাসপাতালের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসেন নিতাই কবিরাজ। তাঁর ডানহাতখানিতে ধরা আছে অন্ধ হরিপদ মাস্টারের একখানা হাত। আর একখানা হাত ধরা আছে অনিমেষের মূঠিতে। জরাগ্রস্ত পক্ষু অন্ধ হরিপদ পণ্ডিত। বৃদ্ধ হাতড়ে হাতড়ে মুখখানার নাগাল পেলেন। সারা মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাধা। তার মধ্যে অপরাঙ্কিতা ফুলের মত ফুটে রয়েছে পঁচিশ বছরের কুমারী কালো মেয়েটির মুখখানি।

অন্ধ কোটরগত দু চোখ দিয়ে নেমেছে দুটি ধারা। ব্যাণ্ডেজ বাধা মাথাটায় বার কয়েক হাত বুলিয়ে দিলেন। মাথাটা নিচু করে অক্ষুটে যত্নোচ্চারণের মতো কি যেন বল্লেন তিনি।

আঘাতে আঘাতে পাষণ পণ্ডিত আজ যদি আকাশ-বিদীর্ণ-করা আর্তনাদ ক'রে উঠতেন তাহ'লেও বুঝি এর চেয়ে আশ্রয় হত লোকগুলো।

নিতাইপদ বলেন : এবার ওদের নিয়ে যেতে দিন।

হরিপদ পণ্ডিত আপত্তি করেন না। উঠে দাঁড়ান। অক্ষুটে বলেন : আচ্ছা আর মা!

স্বরেখা দেবী বিরাট দুটো ফুলের তোড়া এনে রাখলেন মুখখানির দু'পাশে। আচলে চোখটা মুছলেন।

নমিতা আজ শহীদ!

—বলহরি, হরিবোল!

আর্তনাদ ক'রে নমিতার পায়ের উপর উবুড় হ'য়ে পড়ল মতু। ফুলে ফুলে কাঁদছিল সে। ভূষণ ওর হাত দুটি ধরে তোলে। ফুলে ঢাকা মেয়েটি ওঠে জনতার কাঁধে।

জীবনের প্রথম কুলশয্যা।

শেষও!

বাগচি সাহেব ছুটে এসে বলেন : নামাও, নামাও।

নামানো হ'ল নমিতাকে।

বাগচি বলেন : প্রেস ফটোগ্রাফাররা এসেছেন। নমিতার ফটো নেবেন। একখানা এনলার্জ ক'রে রাখতে হবে আমার অফিসেও।

ইঞ্জিনিয়ার মৈত্র সাহেব একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন মেয়েটির দিকে। গতকালও ছিল এই মেয়েটির কত আশা আকাঙ্ক্ষা। সমস্ত কলোনীর ভালো মন্দ নিয়ে তর্ক করে গেছে তাঁর সঙ্গে। কত কটু কথা বলে গেছে তাঁকে!

ওরা এখান থেকে যাবে কলোনীতে—নমিতার বাসায়। বিন্দুবাসিনী আছেন সেখানে। কামিনীও আছে তাঁর কাছে। সেখান থেকে ওকে নিয়ে যাওয়া হবে গণকল্যাণ-সমিতির অফিসে—অর্থাৎ নিতাই ঠাকুরদার সেই এককামরার ঘরে। সেখান থেকে হাতিপোতার বিলে। উদয়নগর কলোনীর অন্তিম মণিকর্ণিকায়। ওখানে ওদের অনেকেই গিয়েছে এতদিন দলে দলে, যাবে ভবিষ্যতেও—কিন্তু এমন সমারোহ ক'রে শোকযাত্রা হয়নি কখনও হাতিপোতায়!

অন্ধ হরিপদ পণ্ডিতকে হাত ধরে নিতাই ঠাকুরদা নিয়ে এসে বসালেন একটা রিক্সায়। পণ্ডিত তখনও নির্বাক। নিশ্চিন্তে আত্মসমর্পণ করেছেন নিতাইপদের হাতে। নিতাইপদ ভাবছিলেন তাঁর ডান হাতখানাই ভেঙ্গে গেল। তাঁড়ার ঘরের আগল খুলে বেরিয়ে এসেছিল যে ঘরোয়া মেয়েটি—তাকে গড়ে তুলেছিলেন তিনি আপন হাতে। মুখচোরা লাভুক মেয়েটির মধ্যেই ছিল স্তম্ভ বহুশিখা। জাগিয়ে তুলছিলেন তাকে তিনি।

সংগ্রামের শুরুতেই বিদায় নিল সেই দক্ষ সেনাপতি। কিন্তু কলোনীর জীবন-উপস্থাসের এতো শেষ পরিচ্ছেদ নয়—এই যে শুরু। অন্ধ হরিপদ যেন এই উদয়নগর কলোনীর একটা রূপক। নমিতাকে হারিয়ে বুকটা ফেটে গেলেও আত্মনাদ করার সময় নেই। এর পরেও আছে আগামী দিনের সমস্তা। কুটি চাই, অন্ন চাই। হরিপদ যেন সমগ্র কলোনীর প্রতীকরূপে নিতাইপদের হাতে করেছেন অন্ধ আত্মসমর্পণ।

কাজ ! কত কাজ !

সে কাজ আরও কঠিন হয়ে উঠেছে নবাগতদের জন্য। দলে দলে লোক আসছে আরও। সার বেঁধে আসছে ও রাজ্য থেকে এ রাজ্যে। যেমন ক'রে খাইবার পাস দিয়ে এসেছিল এদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের উদ্দেশ্যে তখন পূর্বপুরুষ, যেমন ক'রে নিতাইপদ এসেছেন কয়েক বছর আগে—তেমনি ক'রেই আসছে ওরা। আশুক ওরাও আশুক ! নিতাইপদ কিছুতেই ওদের ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। এখানে জমি নাই, এখানকার পরিকল্পনা বার্থ হয়ে যাচ্ছে বারে বারে, তবু ঠাকুর্দা ওদের বরণ করে নেবারই পক্ষপাতী। অতিথি সব অবস্থাতেই নারায়ণ !

গঙ্গার জল পবিত্র। ভাদ্রের ভরা গঙ্গায় যখন বান ডাকে তখন দুপারের গ্রাম ভেসে যায় প্রাবনে। বন্যাবিক্রম গৃহহীনেরা সে জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে দেখতে পায় মৃত্যুর ছায়া। সে জলকে আমন্ত্রণ জানায় না কেউ। তবু সে ঘোলাজলও পুত গঙ্গোদক। তার মধ্যেও থাকে উবর পলিমাটির স্বর্ণরেণু। আজ যে জন-জাহ্নবীর প্রাবনে ভেসে যেতে বসেছে নিতাইপদের দেশ—সেও পুত গঙ্গোদকই। মনুর পবিত্র বংশধর এই গণ-গঙ্গার প্রতিটি তরঙ্গ। সবার উপরে ওদের স্থান। অমৃতের পুত্র—ককালাবশেষ মনুষ্যাকৃতি জীবগুলো।

হৃদতো ওদের ভাগ দিতে গিয়ে ভরপেট খাবার মিলবে না সকলের। তবু এদের সাথে অন্নপান ভাগ করে খেতে হবে। সে কষ্টটুকু স্বীকার ক'রে নিতে হবে হাসিমুখেই।

সেই হাসিরই একটু টুকরো লেগে আছে ঐ তাঁর ফুলে ঢাকা নাতনিটির
অধরপ্রান্তে ।

অপরাজিতার হাসি ।

শ্মশান যাত্রীরা মোড় ফেরে বায়ে ।

বিরিচি শোকযাত্রা ।

সকলের পিছনে পিছনে আসছিল ভূষণ । হাত ধরে নিয়ে চলেছে লতুকে ।
পাশে পাশে চলেছে লতু । কাঁদছে সে । ভূষণের দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ । কি
ভাবছে সে—তা সেই জানে । অন্ধকার কেটে গিয়ে সূর্য উঠছে । ভূষণের
চোখালের হাড় দুটো চেপে বসেছে । আশপাশের সবকিছু সে মোটেই সচেতন
নয় । চলেছে সামনের দিকে দৃঢ়মুষ্টিতে লতুর ডানহাতখানা চেপে ধরে ।

খেয়াল নেই ওর হাতের তালুতে ফুটেছে কাঁটা—ওর মায়ের হাতেব
মকরমুখো বালার সোনার কাঁটা !



না রা য় ৭ সা ন্যা ল

বল্মীক

